ফুলজানি।

উপন্যাস।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার
প্রণীত।

কলিকাতা।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
১২ নং রামকৃষ্ণ দাসের লেন, সাহিত্য যন্ত্রে,
শ্রীযজ্ঞেশ্বর ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০০ সাল।

বয়সেই তাহার একটু পাকা রকমের বুদ্ধি জন্মিয়াছিল। সইকে সুধাইল—"সই-মাকে কথাটা বলে একটা পূজা দেওয়া ভাল কি না?" ফুল তাতে রাজি নহে। মাকে কোন মতে এ কথা বলা হবে না—মা বকবে! আর ছি, বিয়ের কথা কি বলা যায়! কালী কিছুতে এ বিষয়ে সইয়ের মন ফিরাইতে পারিল না। শেষে নিরুপায় হইয়া বলিল,—"তা কি করতে হবে—তুই-ই বল্?"

ফুল নতমুখে কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "বিয়েতে কাজ নেই সই—যাতে বিয়ে না হয়, তাই কর্।"

বড় দুঃখেও কালী হাসিল—বলিল, "নে ক্ষেপামী রাখ্—তুই আমি বিয়ের কর্ত্তা আর কি! এক মাসের পরে বিয়ে, আজ বলে কি না বিয়েতে কাজ নেই! ভাল, আমার কি সাধ্যি?"

ফুল সইয়ের হাত ধরিল। চক্ষু হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িয়া দুখানি হাত ভিজিয়া যাইতেছিল। কালী কাতর এবং বিব্রত হইয়া বলিল, "তা কি করতে হবে বল্—তাই করি!"

ফুল দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া অস্ফুট স্বরে এ দিক ওদিক চাহিয়া বলিল—"তুই কেন তাকে বুঝিয়ে এক বার বল্ না? সে যদি বিয়ে কর্ত্তে না চায় ত বিয়ে হবে না।"

কালী বুঝিয়া বিজ্ঞ গৃহিণীর মত ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "ওঃ তুই পুরো দাদার কথা বল্‌চিস্? তা ভাই কেমন করে বলি দাদাকে বিয়ের কথা,—বড় লজ্জা করে!"

এমন সময় পাঠশালার ছুটী পাইয়া পুরন্দর ছুটিয়া আসিতেছিল—তাহার বাড়ী যাইবার সেই পথ। দূর হইতে দেখিয়া দুই সইয়ে ভারি ব্যতিব্যস্ত হইল,—ফুল চোকের জল মুছিতে বেহাত হইয়া ফুলের ডালা ফেলিয়া দিল, এবং তাড়াতাড়ি ফুল কুড়াইতে লাগিল। কালীর কালো কালো মুখ খানিতে হাসি ধরে না! পুরন্দর কাছে আসিয়া, একটু অপ্রতিভ হইল—কালীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"মর্ ছুঁড়ীরে, তোরা এখানে কেন?" কালী হাসিয়া কুটি কুটি হইল—সে অবস্থাতেও একটু তামাসার লোভ সে সামলাইতে পারিল না। বলিল—"তুমি এলে কেন দাদা! সইকে দেখ্‌তে বুঝি?"

পুরন্দর কালীকে মারিতে আসিল, হাতে আর কিছু না পাইয়া, তাহার ডালার ছুটো ফুল লইয়া তাহার মাথায় গুঁজিয়া দিল। কালী ওষ্ঠাধরে হাসি চাপিয়া রাখিয়া দুষ্টু দুষ্টু মুখে বলিল—"ওকি দাদা—কি দিলে মাথায়?"

পুর। (অতর্কিত ভাবে) কেন ফুল!

কালী। ওহো সব্বাইকে বলে দেব, কনের নাম কর্‌লে পুরো দাদা!

পুর। তা বেশ করেচি ছুঁড়ি—ফুল, ফুল, ফুল—হলো?

হটাৎ কালী গম্ভীর হইয়া পুরন্দরকে ধীরে ধীরে বলিল—"পুরো দাদা, তোমায় একটা কথা বল্‌ব! ভারি একটা কথা। সই বলেচে বল্‌তে, তোমায় শুনতেই হবে।"

ফুলকুমারী তখন পুষ্প চয়ন ছাড়িয়া, ছোট ছোট হাত দুখানিতে বড় বড় চোক দুটি ঢাকিয়া লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিলেন। পুরন্দর তাহার দিকে এক বার চাহিয়া আবার ছুটিয়া চলিল। কালীকে বলিয়া গেল, "আচ্ছা বোনটি তোরা দুপুরবেলায় তালপুকুরে যাস্ কাপড় কাচ্‌তে, সেইখেনে শুন্‌বো কথা!"

সেই পরামর্শই ঠিক হইল। ফুলের তাতে ভারি লজ্জা—কিন্তু কি করে—নহিলে নয়!—তখন দুই সইয়ে বাড়ী ফিরিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ফুলকুমারীর মার ইহজীবনে আর সব সুখ সাধের সামগ্রী ভাসিয়া গিয়াছিল, বাকী এখন কেবল এই মেয়েটি। সন্তান হইল না হইল না করিয়া, অধিক বয়সে এক পুত্র সন্তান লাভ হইয়াছিল, কিন্তু বছর ফিরিতে না ফিরিতে সে অসময়ের অমূল্যনিধি মাতৃ অঙ্ক শূন্য করিয়া গেল। তার পর ফুলকুমারীর জন্ম, কাজেই ফুল বাপ মার বড় আদরের ধন। বিশেষ, ফুল যে বছর জন্ম গ্রহণ করিল, সেই বছর পিতা কেদারনাথ প্রথম মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে একটি চাকরী পান। তখনকার দিনে—এখনই কি নয়?—বৈষয়িক লাভ লোকসান দিয়া লোকে কন্যা ও পুত্রবধূর গৃহাধিষ্ঠানের শুভাশুভ স্থির করিত, কাজেই কেদারনাথ কন্যারত্নকে "মালক্ষ্মী" বলিয়া আদর করিতেন।

অন্তিম শয্যায় কেদারনাথ যখন পত্নী ও কন্যার পরিণাম ভাবিয়া অধীর হইতেছিলেন, তখন তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনা এই ছিল যে, এ সংসারের প্রধান বল যে অর্থ, তাহার অভাবে তাহারা কখন ক্লেশ পাইবে না। তখনকার দিনে

চাকরী করিয়া—বিশেষ নবাব সরকারে—লোকে বড় মানুষ হইত, কিন্তু বড় মানুষী দেখাইতে গিয়া অনেকে বিপদগ্রস্ত হইতেন। সে কথা বুঝিতেন বলিয়া, কেদারনাথ মুর্শিদাবাদের কাছাকাছি বাস করিয়া জমীদারী খরিদ করিতে কখন সাহস করেন নাই, কিছু জোৎজমা দিয়াই সে সাধ পূর্ণ করেন। তাঁহার সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশ তখনকার প্রথা মত হর্ম্ম্যতলে প্রোথিত থাকিত,—কিছু সুদে খাটিত। স্বামীর স্বর্গারোহণের পর, নিস্তারিণী আগেকার চাল বজায় রাখিয়া চলিলেন; লোকে জানিত, সামান্য মহাজনী ও চাষমাত্র অনাথিনী বিধবার জীবনোপায়। দুই এক জন প্রতিবেশী একটু বেশী বুঝিতেন—তার মধ্যে পুরন্দরের পিতা মহেশ্বর ঘোষ এক জন। অতএব মহেশ্বর আগ্রহ করিয়া ফুলকুমারীকে পুত্রবধূ করার প্রস্তাব আপনা হইতেই উপস্থিত করিলেন—কন্যার কুল সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নয় বলিয়া, গৃহিণী এবং বান্ধবেরা আপত্তি করিলে, তাহাতে বড় কান দিলেন না। মনের মত কথাটা হইলে, এখনকার চেয়ে সংস্কৃত শ্লোকের আদর তখনকার দিনে অনেক বেশী ছিল, কাজেই মহেশ্বর যখন তখন বলিতেন,—"স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।" ইহাতে আর সবারই মুখ বন্ধ হইল বটে, কিন্তু সহধর্ম্মিণীর নথ নাড়াটা কমিল না। ঘোষ মহাশয়ের সংস্কৃত ভাষার জ্ঞানভাণ্ডারে আর একটি শ্লোকরত্ন নিহিত ছিল। তিনি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতেন, "বিশ্বাসো নহি কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।" অতএব, গৃহিণীকে আসল মতলবটা কোন মতে বলিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু ইঙ্গিতে কিছু না বলিয়াও থাকিতে পারিলেন না। কাজেই শ্রীমতী জগদ্ধাত্রী দাসী, স্বামীর বুদ্ধির মনে মনে অনেক প্রশংসা করিয়া আহ্লাদে আট খানা হইয়া বিবাহের উদ্যোগে ব্রতী হইলেন, এবং ইচ্ছা ও স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও, মনের কথাটা সর্ব্বদা তেমন গোপন রাখিতে পারিতেন না।

নিস্তারিণী অত কথা বুঝিলেন না, বুঝিলেও তাঁহার তাতে আপত্তি ছিল না। মহেশ্বর ঘোষ কিছু অসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন না; বিশেষ, তিনি মহা কুলীন। পুরন্দরও দিব্য ছেলে। সকলের উপর নিস্তারিণী ভাবিলেন, এ বিবাহ ঘটিলে ফুল ত তাঁর চক্ষের আড়াল হইবে না। অতএব তিনি মহেশ্বরের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। স্বামীর কাষ্ঠপাদুকা দুখানি তিনি ইহজীবনে সার করিয়াছিলেন, প্রতিদিন তাহাই পূজা করিতেন, সেই পাদোদক গ্রহণ না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। ফুলের বিবাহের প্রস্তাব উঠিলে, নিস্তারিণী দ্বার রুদ্ধ করিয়া, সেই স্বামীপাদুকা সম্মুখে লুটাইতে লাগিলেন, তার পর চক্ষের জল

মুছিয়া মনঃস্থির করিলেন। সাংসারিক অধিকাংশ ব্যাপারে ইহাই তাঁহার রীতি ছিল। আর কাহার কাছে কখন পরামর্শ গ্রহণ করিতেন না—কাহার সঙ্গে বেশী কথা কহিতেন না। ফুলও কখন মার চক্ষের জল দেখিতে পাইত না। গাম্ভীর্য্য তাঁহার চরিত্রের প্রধান মূর্ত্তি, এবং সে গাম্ভীর্য্য কতকটা আজীবন শোক দুঃখের ফল। কাজেই নিস্তারিণী পাড়া প্রতিবেশিনীদের বিশেষ প্রিয়-পাত্রী ছিলেন না—সকলেই তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিত, এবং স্বামীর পাদুকা ছাড়া আর কিছু বড় মানেন না বলিয়া, তাহারা গোপনে তাঁহার অনেক নিন্দাও করিত। প্রকাশ্যে কেহ কখন কিছু বলিতে সাহস করিত না। লোকে বলিত, তিনি নাকি অনেক মন্ত্র তন্ত্র জানেন, আর রাত্রে দেবতাদের সঙ্গে তাঁহার কথাবার্ত্তাও চলিয়া থাকে। অন্যান্য আপত্তির মধ্যে, অমনতর লোককে বেহাইন করিতে পুরন্দরের মার বিশেষ আপত্তি, কিন্তু বিজ্ঞ ঘোষ মহাশয় সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রোজ সকালে ফুলকুমারী মার পূজার জন্য ফুল তুলিয়া আনে। সে ফিরিয়া আসিলে তবে মা নাইতে যান; কেন না বাড়ীতে আর কেহ নাই। ভজহরির মা রাত্রে শোয়, আর ভোর হইতে না হইতে চলিয়া যায়, হাটবার ভিন্ন দিনের বেলায় তাহার বড় একটা দেখা পাওয়া যায় না। কৃষাণ ফনু সেখের সঙ্গে জোৎজমার ভাগে বন্দোবস্ত, কাজেই সকল সময়ে তাহার আসার দরকার হয় না। তবে ফুলি দিদির সাদি নাকি ভারি কাছে, সেই জন্য আজ কাল বৈকালে তিনি মা ঠাকুরাণীকে এক এক বার দর্শন দিয়া যান, আর দূরের হাট বাজারে যাইতে হইলে ত ফনু ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

আজ সকাল বেলায় ফুলের ফিরিয়া আসিতে বড় দেরি হইতে লাগিল; মার নাইতে যাওয়ার অবসর হয় না। মা ক্রমে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, ঘরে লোকজন নাই, বিশেষ বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী, মেয়েটার এ আক্কেল টুকু নেই যে, এখনও সে খেলিয়া বেড়ায়! আবার উদ্বিগ্নও হইলেন,—সে কি! মেয়ে

তেমন নয়, তবে এত দেরি কিসের জন্যে? শেষে নিস্তারিণী আর থাকিতে পারিলেন না, কলসী কক্ষে বাহির দুয়ারে চাবি বন্ধ করিয়া স্নানে চলিলেন। পথে সুগুনির মা বাগ্দী বউকে ডাকিয়া, বলিয়া গেলেন, ফুলকুমারীর এক বার খোজ করে যেন, অনেক ক্ষণ হইল, মেয়েটা ফুল তুলিতে গেছে, কি জানি এখনও কেন ফেরেনি! সুগুনির মা তখন সুগুনির সঙ্গে বসিয়া সলবণ "পান্ত ভাতের" প্রতি সুবিচার করিতেছিলেন। কিন্তু ফুলকে মানুষ করিয়াছিলেন, নিশ্চিন্ত হইয়া ভোজন করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাহাকে বেশী দূর যাইতে হইল না। ফুল ও কালী দ্রুতপদে আসিতেছিল, রোদে দুজনেই পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, ফুলকে তার উপর বিষণ্ণ ও ম্লান দেখাইতেছিল, কাজেই বাগ্দী মা তাহাকে এক বার কোলে লইয়া মুখ মুছাইয়া দিতে ব্যস্ত হইলেন। বামুনের মেয়ে কালী দুই হাত পিছাইয়া গেল, ফুলও শুষ্ক ওষ্ঠে হাসি ফুটাইয়া একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিল,

"ছুঁস্‌নে আমায় বাগ্দী মা—পুজোর ফুল নষ্ট হবে। কোথা যাচ্ছিস্ তুই?"

বাগ্দী মা। কোম্‌নে আর যাব মা—তোরই খোঁজে! বলি হোঁ মা ফুলি, মাকে কি এম্‌নি করে ভাবাতে হয় গা? কাল বাদে পরশু বিয়ে, এমন করে যেম্‌নে তেম্‌নে ঘুরো না বাছা, ঠাকুর স্থাবতায় দিষ্টি দেবে!

ফুল আরও ম্রিয়মাণ হইল। ভয়ার্ত্তস্বরে বাগ্দী মাকে সুধাইল, মা কি করিতেছে, আর রাগ করেচে কি না? শেষে সইকে অনুরোধ করিল, তাকে বাড়ী রাখিয়া আসিতে হ'বে, মা নেয়ে আসিলে তবে সই বাড়ী ফিরে যেতে পাবে। নইলে মা বক্‌বে!

এখন মা যে সত্য সত্যই ফুলকে যখন তখন বকেন, তা নয়। কিন্তু মার একটু অপ্রসন্ন দৃষ্টি, একটু ওষ্ঠ কুঞ্চনই কন্যার পক্ষে যথেষ্ট। কালী তা জানিত। হাসিয়া সইয়ের প্রস্তাবে রাজি হইল। বাড়ীর কাছে তাহারা আসিলে বাগ্দী মা কর্ত্রীঠাকুরাণীর কাছ থেকে চাবি আনিতে দীঘির ঘাটে ছুটিলেন। সে দিনকার মত তাঁর "নুন পান্তার" আশা চলিয়া গিয়াছিল।

এ দিকে সেই বাগ্দী বুড়ী, লাঠি হাতে গুড়ি গুড়ি, বাঁ কাঁখে গোবরের ঝুড়ি, দীঘির পথে ঘরে ফিরিতে ফুলকুমারীর মাকে পাইয়া বসিল। আর কাউকে দেখিলে বুড়ী হাসিত না, কিন্তু বোসেদের বউমাকে দেখিলে তাহার ভারি আহ্লাদ। নিস্তারিণী আদর করিয়া সুধাইলেন,

'কি কার্ত্তিকের মা! কোথায় গিয়েছিলে, দু দিন দেখিনি যে?

কাজেই বুড়ী তাঁহাকে পাইয়া বসিল। অনেকক্ষণ ঘুরিয়া সে বড় ক্লান্ত হইয়াছিল; ইচ্ছা সেই পথের মাঝে একটু বসিয়া, বউমাকে আপনার দুঃখের কাহিনী জানাইয়া হৃদয়ভার কিঞ্চিৎ লাঘব করে, কিন্তু তাঁহার দাঁড়াইবার বিশেষ সম্ভাবনা না দেখিয়া, ফটীকের মা মন্থরতর গতিতে সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

ছেলেরা সব দল বাঁধিয়া বুড়ীর দিকে আসিতেছিল, বউমাকে দেখিয়া আর অগ্রসর হইল না।

দীঘির ঘাটে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে, বুড়ী প্রথমেই ফুলকুমারীর মার কাছে সকাল বেলাকার উদ্যানভ্রমণের গল্পটা করিল, ফুলকে বটগাছতলায় সে শয়ানাবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছে শুনিয়া, তিনি বড় উদ্বিগ্ন হইলেন। আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কেউ সেখানে ছিল কি না?"

বুড়ী। ছ্যাল বৈকি বউমা! দেকনু যে চক্কবত্তীদের মেয়েটা বাগানের পুকুরে সাঁতার দেচ্চে! ভারি বজ্জাত মেয়েটা—আর কি মুই সেথা দেঁড়াতে পারি গা! ছুঁড়ীর ভেতর ঐ চক্কবত্তীদের ছুঁড়িটে, আর ছোঁড়ার ভেতর ঐ ঘোষের বেটা পুরো! মা গো—মা! গাঁয়ে আর আমায় টেক্‌তে দেলে না! তা হেঁগা বউমা, পুরোর সঙ্গে তুমি নাকি তোমার ফুলির বিয়ে দেবা! আহা অমন সোনার মেয়ে—

নিস্তারিণী দেখিলেন, বুড়ী তাঁহার ভাবী জামাতাকে সহজে ছাড়িতে চাহে না। পাছে রাগের মাথায় গালি দিয়া বসে এই ভয়ে কথাটা ফিরাইতে তিনি ব্যস্ত হইলেন। বলিলেন, "তা বারণ করে দেব পুরনকে ফটীকের মা, আর যেন তোমায় না রাগায়! ছেলে ভাল, তবে ছেলে মানুষ কি না, এখনও মানুষের মর্য্যাদা বোঝেনি। আশীর্ব্বাদ করো; ফুল যেন আমার সুখে থাকে।"

বুড়ীর রুদ্ররস সুতরাং করুণায় পরিণত হইল। চোখের জল মুছিয়া বলিল, —"ঠাকুর স্যাবতা বর কনেকে সুখে রাখুন!—ফুলি যেন তোমার পাকা মাথায় সিঁদুর পরে! তোমার ভাল হবে না ত, কার ভাল হবে বউমা—আহা! গরিব দুখীর ওপর তোমার যে ময়া! ফটীক বলে, মা তুই বউমার কাছে যাস্ আর কোথাও যাস্‌নে।—তা আমি কি চুপ করে বসে থাকৃতে পারি গা? ভাবি কি, তবু দুঝুড়ি গোবর কুড়িয়ে ফটীকের একটু আসান করি, বাছার আমার প্যাটে খেতে কুলোয় না, দুটো কচি কাচা হয়েচে!—আজ তোমার কাছেই যেছেলাম বউমা—বলি মাথায় একটু ত্যাল চেয়ে দিয়ে আসি!" তখন বুড়ী আপনার রুক্ষ পক্ক কেশের নুড়ি খুলিয়া ফুলের মাকে দেখাইল। এমন

সময়ে সুশুনির মা বউমাকে জানাইয়া দিল যে, ফুল বাড়ী আসিয়াছে, এবং চাবি লইয়া ফিরিয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে নিস্তারিণী বাগ্দী বুড়ীকে বলিলেন যে, দুপুর বেলায় তার তেল মাখার আর খাওয়ার নিমন্ত্রণ। বুড়ীর আনন্দ ধরে না। বউমা নাহিয়া উঠিলে খানিক তাঁর সঙ্গে আসিল, তার পর ঘরে গেল। প্রতিবেশিনীরা স্নানে আসিতেছিলেন, দূর হইতে দেখিয়া পরস্পরে বলিতেছিলেন, "ফুলের মার যত ভাব ডাইনি মাগীটের সঙ্গে। কাল বাদে পরশু মেয়ের বিয়ে, এখনও মন্তর তন্তর নিয়েই আছেন!—মর্!"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দীঘির ঘাট হইতে ফিরিতে সুশুনির মা বাড়ীর কাছে আসিয়া কন্যারত্নের সাক্ষাৎ লাভ করিল! সুশুনি আপনার জঠরানল নির্ব্বাপণ করিয়া উঠিয়া দেখিল, সব ভাত সে খাইতে পারে নাই, অতএব তাহার মাতৃভক্তি জাগিয়া উঠিল! সে কাজেই বাড়ীর বাহিরে আসিয়া মাতার পথ নিরীক্ষণ করিতেছিল। মাকে দেখিয়া ভুক্তাবশিষ্ট অন্নের খবর দিল, এবং তাহার হাতের চাবি কাড়িয়া লইয়া ফুলকুমারীর কাছে গেল।

অতএব বাগ্দী মার আগমন প্রতীক্ষায় উন্মুখ ফুলকুমারী যখন সুশুনি দিদিকে আগ্রহে সুধাইল যে, মার নেয়ে ফির্তে কত দেরি, কি বলিল, এবং রাগ করেচে কি না, সে কোন কথার উত্তর দিতে পারিল না। কালী সইয়ের ভাবনার ভাগিনী নহে, ভাবনার কারণও তার বিবেচনায় কিছু ছিল না, অতএব সে দাওয়ায় বসিয়া পা ছড়াইয়া মহা আনন্দে সুশুনির সঙ্গে তার শ্বশুরবাড়ীর গল্প জুড়িয়া দিল। ফুল ছোট ছোট দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে তাহা শুনিতেছিল, এক একবার চকিত দৃষ্টিতে দ্বারের দিকে চাহিতেছিল—মা আস্‌চে কি না!

একটু পরে পূর্ণ কুম্ভ কক্ষে মা আসিয়া পৌঁছিলেন। ফুল মার দিকে

চাহিতে পারিতেছিল না, অধোমুখে ফুল গুছাইতেছিল। কালী দেখিল, সইমার মুখে রাগের বিশেষ কোন চিহ্ন নাই, সচরাচর যেমন দেখে ম্লান গম্ভীর মুখচ্ছবি, তাহার কোন বৈলক্ষণ্য দেখিল না। কাজেই সে সাহস পাইয়া সইয়ের দুর্দ্দশার প্রতিকার করিতে সচেষ্ট হইল। হাসিয়া ডাকিল—"সই মা!"

নি। কেন মা?

কা। তুমি নাকি সইয়ের উপর রাগ করেচো? তা সইয়ের কোন দোষ ছিল না গো, আমি তাই তোমায় বল্‌তে এয়েচি। সই ভয় পেয়েছিল বলে আমরা অনেক ঘুরে এলাম।

নি। ফটীকের মাকে দেখে বুজি?

কা। বাগ্দী বুড়ীর কথা বল্‌চো? কেমন করে জানলে তুমি সইমা?

নি। আর তুই নেংটো হয়ে সাঁতার দিচ্ছিলি, ফুলি বটগাছতলায় শুয়েছিল,—নয়?

কালী ভারি আশ্চর্য্য হইয়া গেল। চক্ষু বিস্তার করিয়া সইয়ের দিকে চাহিল। তখনও ফুল অধোমুখে। নিস্তারিণী বালিকাদের এই ভয়ে কৌতুহলে মাখামাখি সরল সুন্দর ভাব দেখিয়া আনন্দানুভব করিতেছিলেন। কালী সইমার মুখের দিকে চাহিয়া আবার সুধাইল, "বল দেখি, কেন জলে নেমেছিলাম সইমা!"

নিস্তারিণী কমলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কেন পদ্ম তুল্‌তে! ফুলির ভারি ভয়, তার মানা শুনিস্‌নি বটে?"

এবার ফুল মা ও সইয়ের দিকে চাহিয়া লজ্জায় মৃদু হাসিল। সে বুঝিল, মেঘ কাটিয়া গেল, মা আজ্ আর বক্‌বে না।

কালী বলিল "সইমা, তুমি খুব মন্তর তন্তর জান লোকে বলে। এসব মন্তর দিয়ে বল্‌চো, নয়?"

সইমা সে কথার জবাব দিলেন না। গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"তুই বাছা ফটীকের মাকে অমন করে ক্ষেপাস্ কেন? পুরনও ক্ষেপায়! আহা গরিব মানুষ, কেন এমন করিস্ বাছা?"

কালী হাসিয়া বলিল—"বুঝেছি সইমা, বাগ্দী বুড়ী সব তোমায় বলেচে। তা সে গাল দ্যায় কেন, ডান মাগীটে—তাই ত ক্ষেপাই সইমা! পুরো দাদা আবার তার মাতায় নুন ছিটিয়ে দেয়, মাগী যে নেচে ওটে গো! ওঃ বুজেচি, তোমার মন্তর মিছে সইমা,—সেই তোমায় সব লাগিয়ে দিয়েচে।"

নি। তা, মিছে তো কিছু বলেনি বাছা! আমার মাথা খাস্ কালী, আর তাকে রাগাস্‌নে, পুরোনকে একবার ডাকিস্ তো, আমি মানা করে দেব। আহা বুড়ো গরিব মানুষ কত মন্নি করে।

চুপ করিয়া সুবুদ্ধি মেয়ে এ অনুযোগ এবং অনুরোধ শুনিল। তার পর হাসিয়া উঠিল। বলিল, "আচ্ছা সইমা, আমি আর কখন রাগাবো না বাগ্দী বুড়ীকে, কিন্তু তুমি বাছা মাকে বলে দিতে পাবে না যে, আমি নেংটো হয়ে সাঁতার দিয়েচি।"

নিস্তারিণী মৃদু হাসিয়া সম্মত হইলেন, কালীকে বলিয়া দিলেন যে, আজও একবার তার মা ও পিসিমাকে দুপুর বেলায় যেন পাঠিয়ে দেয়। একলা মানুষ, বিয়ের কাজ আর হয়ে উঠে না। দুষ্ট মেয়ে এ সুযোগ ছাড়িবার পাত্রী নহে। বলিয়া রাখিল, সেও আস্‌বে সইকে নিতে, গা ধুতে যাবার জন্যে। তখন নিস্তারিণী কাপড় ছাড়িয়া ফুল লইয়া পূজার ঘরে প্রবেশ করিলেন।

সুগুনিও উঠিয়া গেল। তখন ফুল চুপি চুপি সইকে বলিল, "তবে আর দুপুর বেলায় কাপড় কাচ্‌তে গিয়ে কাজ নেই।" কালী মাথা নাড়িল, না গেলে পুরো দাদা বল্‌বে "মিচকতারি!" তার উপরও ফুল দুই বার অসম্মতি প্রকাশ করিল, কিন্তু শেষে সইকে পারিয়া উঠিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বঙ্গ সাহিত্যে এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোন ভাষায় কোন কবি বোধ করি "মধ্যাহ্নের" সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কবিতা লেখেন নাই; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, সে কবিতাও কবির কোমল বয়সের লেখা। বাস্তবিক মধ্যাহ্নের যে প্রচণ্ড শোভা, ছেলেরা ভিন্ন আর কেহ তাহা উপভোগের প্রকৃত অধিকারী নহে। কি সুখে যে তারা সেই চৈত্র বৈশাখের মার্ত্তণ্ডতলে আম-বাগানে মাতামাতি করিয়া বেড়ায়, তাহা আর একবার ছেলে হইয়া ভোগ করিতে না পারিলে বুঝা যায় না।

গুরু-মহাশয়কে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া পাঠশালার ছেলের দল ভোলা আর মধোকে ধরিতে চলিল—পথপ্রদর্শক পুরন্দর নিজে। যে পথে আম-বাগান বেশী, তালপুকুর যাইবার অন্য সোজা পথ থাকিলেও পুরন্দর সেই পথে চলিল। গাছের ছায়ায় রাখালেরা কোথাও খেলিতেছে, অদূরে সবৎস গাভীর পাল এক মনে তৃণ ভোজনে রত, কেহ বা সে মায়া ভুলিয়া সুপক্ক যব ও গোধুম ক্ষেত্রের দিকে ছুটিতেছে। কোথাও কোন ভাবুক রাখাল ছায়াতলে অর্দ্ধশয়ানাবস্থায় দূরে মৃগতৃষ্ণিকার ছলনা লক্ষ্য করিতেছে; এবং থাকিয়া থাকিয়া কখন সঙ্গীতসুধা, কখন বা গো-গণের প্রতি গালি বর্ষণ করিতেছে। কোথাও বটগাছের ডালে ঝুলন যাত্রার উৎসব পড়িয়া গেছে—কোথাও শ্রান্ত ক্লান্ত শাখামৃগের অনুসরণে পাঁচনী ও ঢিলহস্তে ছোট বড় রাখালেরা ছুটাছুটি করিতেছে। কোথাও কেহ নবঘনশ্যাম আম্র স্তবকের দিকে পাঁচনী লক্ষ্য করিতেছে, কেহ ঢিল ছুড়িতেছে, কেহ অদৃষ্ট এবং বাতাসের উপর নির্ভর করিয়া চাহিয়া আছে—কখন্ একটি আঁব পড়িবে। অতএব তালপুকুর পর্য্যন্ত পৌঁছিবার যে সহিষ্ণুতা এবং আকর্ষণ, তাহা এক পুরন্দরেরই রহিল।

পুরন্দরের প্রথম চেষ্টা, ভোলা আর মধোকে ছলে বলে কৌশলে যেমন করিয়াই হোক্, তাড়াইতে হইবে। অতএব সে পুকুরের উত্তর কোণ হইতে অলক্ষ্যে ভোলা ও মধোর গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। তখনও ভোলা সচকিতে চারি দিকে চাহিতেছিল, মধো মহা সাবধানে অতি সন্তর্পণে কাক-কুলায়ের সমীপবর্ত্তী হইতেছিল। তখন মতলব আঁটিয়া পুরন্দর নিকটবর্ত্তী সদ্যকর্ষিত ভূমি হইতে এক কোঁচড় ঢিল সংগ্রহ করিল, এবং ঘুরিয়া অপেক্ষাকৃত দূরপথে বটতলার দিকে গেল। হঠাৎ মধোর পিঠের উপর চারি পাঁচটা ঢিল গিয়া লাগিল—সে ফিরিয়া চাহিতে না চাহিতে ভোলার ভয়ার্ত্ত চীৎকার শুনিল। ভোলা ছুটিয়া পলাইতে পলাইতে বলিয়া গেল—"মধোরে ভূতে ঢেলা মেরে অশ্বথ গাছে চড়েচে।" বাস্তবিক ততক্ষণ ভূত মহাশয় অশ্বথ গাছের ঘনপত্রান্তরাল আশ্রয় করিয়া শাখা প্রশাখা আন্দোলিত করিতেছিলেন, এবং সময় বুঝিয়া আর একবার ছোট বড় লোষ্ট্রের রাশি মধোর প্রতি লক্ষ্য করিলেন। কাজেই মধো পড়িতে পড়িতে তিন লাফে মাটিতে পড়িল, এবং পশ্চাতে আর না দেখিয়া ভোলার অনুসরণ করিল। তখন পুরন্দর সেই গাছের ডালে বসিয়া আপন মনে খুব এক চোট হাসিয়া লইল। তার পর কাকের বাসায় কোকিলের ছানা দেখিতে বটগাছে উঠিতে লাগিল। কিন্তু এবার অলক্ষ্যে

উঠিতে পারিল না। কাকদম্পতি কুলায়ে উপস্থিত হইয়াই একবার আশ্রয়-দাতা বটবৃক্ষের আপাদ মস্তক দেখিয়া লইল। পুরন্দর তত সাবধানে উঠিতেছিল না, উঠিলেও বায়স-চক্ষু এবং চঞ্চুকে প্রতারিত করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব মুহূর্ত্ত মধ্যে কাক-রাজ্যে বার্ত্তা প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে স্থান কাক-সমাকুলিত হইয়া উঠিল। মনুষ্যমণ্ডলীর ন্যায় পুরন্দরের কাকমণ্ডলীতেও যথেষ্ট নাম যশ ছিল—অনেক বায়স-শিশু তাঁহার কল্যাণে অকালে কাকদেহ ত্যাগ করিয়াছিল। কাজেই চঞ্চুর উপর চঞ্চুর খরাঘাতে পুরন্দরকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তাহার বাগিন্দ্রিয় পঞ্চমে এবং হস্তপদ বিংশতিতে যুগপৎ পরিচালিত হইলেও, এ ক্ষেত্রে জয়লাভ করিতে পারিল না।

এ দিকে ছোট ছোট মেয়ে দুটি ছোট ছোট কলসী কাঁখে তালপুকুরের মেয়েঘাটে আসিয়া নামিল। পুরন্দর তাহা দেখিল, কিন্তু আরও একটু রঙ্গ করিতে তাহার ইচ্ছা ছিল। চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া কালী কোথাও পুরন্দরকে দেখিতে পাইল না। ফুলের দৃষ্টি জলের উপর। সে পুকুরের পাড়ের দিকে চাহিতেই পারিতেছিল না। কিন্তু শেষে যখন কালী বলিল, "দাদা বুঝি এল না," তখন ফুলের চক্ষু একেবারে বটগাছের উপর উঠিয়া আবার জলের দিকে নত হইল। সেই ভাবে ফুল আস্তে আস্তে সইকে বটগাছের দিক্ দেখাইয়া দিল, আর অনুরোধ করিল—মানা করিয়া আসে, কাকের ছানা যেন না মারে।

কালী মানিল, এ হতে পারে বটে, পুরোদাদা বটগাছে উঠেচে কাকের ছানা পাড়্‌তে, নইলে কাক পোড়ার মুখোরা অমন করে মর্‌বে কেন?

অতএব সকলসী সই এবং আপনার কলসী ঘাটে ফেলিয়া, কোমরে কাপড় জড়াইয়া, কালী বটগাছের দিকে ছুটিয়া চলিল। পুরন্দর তাহা দেখিল, বোন্‌টি কষ্ট পাইয়া অত দূরে না এসে, এ দয়াটুকুর বোধ করি সঞ্চার হইল। কাজেই কালী অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিতে না করিতে দেখিল, বটগাছের যে ডালটা পুকুরের পানে হেলিয়া আছে, তাহা হইতে কে এক জন [illegible] লাফাইয়া পড়িল। চিনিল—আর কে, পুরো দাদাই বটে!

সাঁতার দিতে দিতে পুরো দাদা অনেক রঙ্গ করিতেছিলেন। মাথার উপরে সূর্য্যের দিকে মুখ এবং হাত দিয়া জল ছিটাইতেছিলেন, কখন ডুবিয়া, কখন চিৎ হইয়া, শান্ত জলরাশিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিলেন। আর কখন কখন আদর করিয়া "বোন্‌টি" বলিয়া এমনি চীৎকার করিয়া উঠিতেছিলেন

যে, সে রব প্রতিধ্বনিত হইয়া তালরাজি শিরস্থ ছায়া-প্রয়াসী পক্ষীগণের বিষম ভীতির কারণ হইতেছিল। কালীর তাহাতে মহা আনন্দ, কিন্তু তাঁর সইয়ের ঠিক বিপরীত ভাব। ভয়, পাছে গোলমাল শুনিয়া কেহ সেখানে আসিয়া পড়ে! যদি দেখে, কনে বরের সাঁতার দেওয়া দেখিতেছে, তা হলে কি হবে! কাজেই তিনি যুবতীর মত লজ্জা রাখিতে ঠাঁই না পাইয়া জল হইতে উঠিয়া পলাইলেন, এবং গাছের আড়ালে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন। সই কাছে আসিলে তার উপর অভিমান করিয়া কথা কহিলেন না, সে আদর করিয়া হাত ধরিয়া টানিলে কাঁদিয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন, "তোর সঙ্গে আর কোথাও যাব না!"

এখন সইয়ের মুখ দেখিলেই কালী তাহার মনের কথা বুঝিতে পারে, কাজেই তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না, কেন অনর্থ ঘটিয়াছে। ততক্ষণে পুরন্দর ঘাটে আসিয়া হাজির হইল, এবং দ্বিগুণ স্বর চড়াইয়া বোন্‌টিকে ডাকিতে লাগিল।

কালী বলিল—"তোমার পায়ে পড়ি দাদা, অত চেঁচিও না।"

পুর। বামুন হয়ে পায়ে পড়লি বোন্‌টি—আমার যে পাপ হবে। তা আর চেঁচাব না, এখন বল কি কথা? শীগ্‌গির বল্!

কা। মাথাটা আগে মুছে ফেল দাদা,—এই গামছা নাও। ছি—আবার নইলে, ব্যামো হবে যে!

অপ্রতিভ হইয়া পুরন্দর কালীর দত্ত গামছায় মাথা মুছিল। বোন্‌টি তখন সাহস পাইয়া দাদাকে দুইটি অনুরোধ করিলেন—কাকের ছানা না মার্‌তে, আর বাগ্দী বুড়ীকে না রাগাতে।

পু। (হাসিয়া) তা এই কথা বল্‌তে ডেকেছিলি বোন্‌টি?—তুই ভারি দুষ্ট হয়েছিস্!

কা। তা দুষ্ট হই আর যা হই, মাথা খাও দাদা, তুমি আর অমন করে কাকের ছানা মেরো না—সই কত দুঃখু করে! সত্যিই ত, তাদের মারা কত কাঁদে। তোমার কি মায়া হয় না দাদা? আর সইমা তোমায় একবার ডেকেচে। বাগ্দী বুড়ীকে আর ক্ষেপিও না।

কথাগুলি বলিতে কালীর মুখে বিষাদে আনন্দে মাথামাথি একটা জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছিল—আপনা ভুলিয়া পুরন্দরের মুখ পানে স্থির করুণ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া, বালিকা আর্ত্ত জীবের জন্য করুণা ভিক্ষা করিল। সেই শুভক্ষণে

ফুলকুমারী সই ও পুরন্দরকে লুকাইয়া দেখিতে গিয়া, ভাবী স্বামীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করিল। পুরন্দর সে নয়নে দেখিল কেবল করুণা,—কালীর কথার চিত্র যেন সেই শান্ত করুণ নয়নে ভাসিতেছিল। পরের দুঃখের কথায় আর কখন পুরন্দরের হৃদয় কাঁপে নাই। আজি এই প্রথম কাঁপিয়া উঠিল। সে আর দাঁড়াইল না, খানিক দৌড়িয়া গিয়া "আচ্ছা বোন্‌টি" বলিয়া, আবার ছুটিয়া চলিয়া গেল। কাজেই সকাল বেলাকার কোন কথা শোনা হইল না। কালীও তাহা বলিবার জন্য ব্যস্ত হইল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে মহাধুম—ছেলের বিবাহের বাদ্য বাজিয়া উঠিয়াছে। পনর বৎসর ধরিয়া ঘোষ মহাশয় এক কলমে জমীদারের নায়েবি করিতেছেন। মাথার উপরে টাক তেমন জাঁকিয়া উঠে নাই বটে, কিন্তু তাঁহার স্তরবিন্যস্ত বিশ্বোদর উদরটির পানে তাকাইলে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, মা লক্ষ্মী বাস্তবিক পনর বছর যাবৎ সেখানে বাসা বাঁধিয়াছেন। তাহা হইলে কি হয়? কিছুতে সে উদর পুরিবার নহে। মনিব জমীদার হাশয় দয়া করিয়া হুকুম দিয়াছিলেন, নায়েব পুত্রের বিবাহের বাবে পরগণায় াকা প্রতি দুই আনা উস্থল করিয়া লয়। নায়েব মহাশয় তাহার উপর আর চারি আনার ফিকিরে ছিলেন, কিন্তু রাইয়তদের সঙ্গে অনেক কিচিকিচি কোলাহলের পর অনুগ্রহপূর্ব্বক দুই আনায় রফা করেন। এ ছাড়া দধি দুগ্ধ তরকারী ও কদলী পত্র এবং মৎস্যের ভার মাতব্বর প্রজাদের ঘাড়ে চাপাইয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। তথাপি শান্তি নাই। প্রাতে উঠিয়া রোজ রোজ আজকাল গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন—উদ্দেশ্য, কার্ কিসে ছোঁ মারিবেন। বিষয়ী লোক যারে বলে, ঘোষজা তাহার সাড়ে ষোল আনা। কোন কোন কবি এক নায়িকাকে নানা মূর্ত্তিতে দেখাইয়াছেন, কিন্তু সে বহুরূপীও যত ভ খাঁটি বিষয়ী লোকে, তত আর কিছুতে নহে। বহুরূপী যখন যার কাছে,

তখন তাহার সেই রং। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য যে আহার্য্যান্বেষণ, তাহাতে তাহার কখন ভুল চুক হয় না। ঘোষ মহাশয় মতলব হাসিলের জন্য স্বকক্ষ শ্রেণীর লোকের কাছেই খবৃত্ত, সমকক্ষের কাছে যখন যেমন তখন তেমন এবং প্রজার কাছে প্রায়ই সিংহ। এ সকলই তাঁর ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সেই একমাত্র রজত চক্রের জন্য। সে লক্ষ্য কখন ব্যর্থ হইবার নহে।

গোলপাতার ছাতি স্কন্ধে মাথায় চাদর বাঁধিয়া যষ্টি হস্তে নায়েব মহাশয় ওরফে মহেশ্বর ঘোষ হরিশপুর প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইয়াছেন। সৌভাগ্য-ক্রমে গ্রামের সঙ্গে তাঁহার জন্মভূমিত্বের মাত্র সম্বন্ধ—নায়েবিত্বের নহে, তথাপি এই প্রভাতে গরিবদের ভিতর সামাল সামাল পড়িয়া গিয়াছে। ঘোষজার ইচ্ছা একটু দ্রুত চলেন, কিন্তু তাঁহার সম্মুখব্যাপী উদরটি সে সাধে বাদ সাধিতেছিল। মানুষের ইচ্ছা যে স্বাধীন নহে, এর চেয়ে তাহার আর কি গুরুতর প্রমাণ চাই? ঘোষ মহাশয়ের মনে সে দার্শনিক তত্ত্ব উঠিতেছিল কি না জানি না, কিন্তু তিনি যে একটা কিছু ভাবিতেছিলেন, তাহা তাঁহার মন্থর পদবিন্যাস এবং ভ্রুকুটিভীষণ বদনমণ্ডলে প্রকাশ পাইতেছিল। নিন্দুকেরা বলিত, শীকারের পূর্ব্বে চীল মহাশয় ঐরূপ চিন্তাযুক্ত হন, এবং তাহার দৃষ্টিও ঘোষজার বক্র দৃষ্টির অনুসরণ করে। সে যেমনই হউক, ক্রমে ঘোষ মহাশয় ফনু সেখের বাটীর সম্মুখে পৌঁছিলেন—ফনু কিন্তু ফুলি দিদির ভাবী শ্বশুর মহাশয়কে তেমন হৃষ্টচিত্তে সেলামটা করিতে পারিল না। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার গৃহপ্রাঙ্গনস্থ কাঁঠাল গাছটি যে ফলে ফলে ভরিয়া রহিয়াছে, রাস্তা হইতে তাহা দেখা যাইতেছিল। নায়েব মহাশয় মাথার চাদর খানি ভাল করিয়া বাঁধিয়া সেই দিকে পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বলিলেন, "ফনো রে, বিয়ের তরকারির জন্যে ইচড় গোটা ত্রিশেক তোকে দিতে হবে।"

ফনু দাড়ি চুমরাইয়া কষ্টে ঈষৎ হাসিয়া যোড়করে জবাব করিল, "সে এজ্ঞে কর্‌বেন না নায়েব মোশাই, ওই কৈঁটাল কটি মোর গুজরাণ, না থাক্‌লে ক্যাখন বেচিনে।"

"মর ব্যাটা" বলিয়া ঘোষজা যষ্টি আন্দোলিত করিলেন, ফনু দুই হাত পিছাইয়া আপনার দরওজার দিকে গেল। "ব্যাটা তোর বড় আস্পর্দ্ধা হয়েচে। বেহাইন ঠাক্‌রুণের জমী গুলো ফাঁকী দিয়ে খাচ্ছিস্, রোস্ একবার, বিয়ে হোক্। কাঁঠাল পাকিয়ে খাওয়াচ্ছি একবার। ব্যাটা তোর পৈজার পয়জার হবে, তবে আমার নায়েবি সার্থক।

এইরূপে ঘোষজা গরিবের পক্ষে সেই প্রাতঃকালে রুদ্ররসের অবতারণা করিতে করিতে, ক্রমে বজরুল করীমের "দৌলতখানার" নিকটবর্ত্তী হইলেন। সেখ বজরুল করীম নবাব সরকারে খালাসীর কর্ম্ম করেন, অতএব হরিশপুর গ্রামে তিনি একজন মুৎসুদ্দির মধ্যে। বাস্তবিকও সেখজীর আদব কায়দার ঘটা, ভ্রুর আবশ্যক অনাবশ্যক কুঞ্চন এবং প্রসারণ, সর্ব্বোপরি তাঁহার অজাধিক শ্মশ্রুকুঞ্জের কেয়ারি দেখিয়া লোকের মনে হইতে পারে বটে যে, নসীব্ ভাল হইলে একটা পেয়াদাগিরি তাঁহার প্রাপ্য। সে আপশোষের কথাটা স্বয়ং সেখজী আলবোলায় তামাকু চড়াইয়া অনেকবার তাঁহার গ্রামস্থ মিলিত এবং তাঁহার উন্নত পদ গৌরবে বিস্মিত সেখমণ্ডলীতে প্রচার করিয়াছিলেন। এহেন সেখজী যে নায়েব মহাশয়ের কদর বুঝিবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। ঘোষ মহাশয় দূরদর্শী—নবাব সরকারের লোকটাকে তিনি হাতে রাখা অতি কর্ত্তব্য জ্ঞান করিতেন, এবং কাজেই তিনি তাঁহার পারসী ভাষার জ্ঞানভাণ্ডার হইতে বাছিয়া বাছিয়া শব্দ রত্ন সকল খালাসী জীউর প্রতি প্রয়োগ করিতেন। সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে সম্বোধন করিতেন—"হুজুরকা দৌলতখানা" ইত্যাদি, এবং নিজের "গরিবখানার" দিকে "তসরিফ্ ফরমাইতে" নিমন্ত্রণ করিয়াও আসিতেন। আজ সেই জন্যই এদিকে আগমন। খালাসী মহাশয় তখন জীর্ণ গালিচা ও ছেঁড়া তাকিয়ার মসনদে প্রতিবেশীমণ্ডলে বসিয়া নূতন মাটীর ফরসীতে সহরের সদ্যঃ আমদানী অম্বুরী তামাকুর সেবা করিতেছিলেন। নায়েব মহাশয়ের আকস্মিক আবির্ভাবে আদব কায়দার ঘটা পড়িয়া গেল। এ কথা সে কথার পর কোন কথা না পাইয়া ঘোষজা সুধাইলেন, "আচ্ছা খালাসীজী, সরকারের সব খবরই ত তোমার মালুম আছে, লড়াইয়ের কথাটা কি সত্যি?"

খা। (বিজ্ঞতা সহকারে) গুজবটা সাঁচ বলে এ তাঁবেদারেরও মালুম হয়। নইলে নয়া পানসীর ফরমায়েস্ কেন হবে?

"খয়ের!" বলিয়া নায়েব মহাশয় চিন্তামগ্নের ভাব দেখাইলেন। কিছু পরে বলিলেন, "খালাসীজী, তোমার এক্‌বাল্‌ছে কিছু জমী আবাদ করেছি, লড়াই হলে পাছে সিপাহী লুটে পুটে ন্যায়!" খালাসীজী ভ্রুর যুগপৎ আকুঞ্চন প্রসারণ করিয়া নায়েব মহাশয়কে অভয় দিলেন, "হুজুর মানীর ইজ্জৎ রাখ, তোমার কুছ্ পরওয়া নেই!

নায়েব মহাশয় চলিয়া গেলে সেখজী তাঁহার মোসাহেবদের কাছে প্রকাশ

করিয়াছিলেন যে, এর চেয়ে আর ইজ্জৎ কি হইতে পারে? এবং তিনি ভরসাও দিয়াছিলেন যে, দরবারে "কোসিস্" করিয়া, নায়েব সাহেবের একটা জমকাল চাকরীও করিয়া দিবেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

বেড়াইয়া আসিতে ঘোষ মহাশয়ের বেলা প্রায় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেল। গৃহিণী ৪।৫ বার বাহিরে লোক পাঠাইয়া কর্ত্তার দেখা পান নাই, অতএব রাগে অভিমানে তিনি গর্ গর্ করিতেছিলেন। স্বর্ণকার কড়ার মত আজ প্রাতে অলঙ্কার দিয়া যায় নাই, কাজেই সেই সূত্র হইতে গৃহিণী ঠাকুরাণীর ক্রোধাবেশ। দয়া স্নেহাদি যেমন ক্ষুদ্র একটি সংসার হইতে বিশ্ব সংসারময় ছড়াইয়া পড়ে, গৃহিণীকুলের রাগ অভিমানাদি তেমনি বিশ্বসংসার হইতে উঠিয়া ক্ষুদ্র প্রাণী স্বামী বেচারীর উপর কেন্দ্রীভূত হয়। স্বর্ণকার আসিল না দেখিয়া, কর্ত্তৃঠাকুরাণীর প্রথম রাগ হইল ভৃত্যের ওরফে দুঃখীরাম হাজরার উপর; সে পলাইলে ধাক্কা গিয়া পড়িল পরিচারিকা ওরফে বিন্দী পোড়ার-মুখীর উপর; এবং ক্রমে সেই রাগ ছড়াইয়া পড়িল তৃতীয় নম্বর কন্যা, চতুর্থ পুত্র, এবং শেষ ও পঞ্চমে স্বামী খোদ নায়েব মহাশয়ের উপর। কাজেই ঘোষ মহাশয় যখন বাড়ী পৌঁছিলেন, তখন একটা বিষম হুলু স্থূল পড়িয়া গেছে। আমরা ঘোষ মহাশয়ের শ্ববৃত্তি ও সিংহবৃত্তির পরিচয় দিয়াছি, উভয়ই শক্তি-পক্ষে; কিন্তু আত্ম-শক্তিপক্ষে তাঁহার যে বৈষ্ণবভাব অর্থাৎ মেষবৃত্তি, সে পরিচয়টা এতক্ষণে দিব।

কর্ত্তা মহাশয় বাহিরে পৌঁছিয়াছেন শুনিয়া, পুরনের মা প্রথমে ভাবিলেন শয্যার আশ্রয় লইবেন, কিন্তু এ বয়সে, বিশেষ এত বেলায়, তাহাতে কেমন লজ্জা লজ্জা করিতে লাগিল। অতএব জগদ্ধাত্রী আর দেরিমাত্র না করিয়া, স্নানের উদ্যোগ করিলেন। হুঁকা হস্তে "দেহি পদপল্লবমুদারং" ভাবে কর্ত্তা মহাশয় যখন অন্দরে প্রবেশ করিলেন, তখন গৃহিণী শয়নাগারের হর্ম্ম্যতলে পা ছড়াইয়া স্নেহযষ্টি তৈলসিক্ত করিতেছিলেন—সম্মুখে পিত্তলকলসী। দেখিয়াই

কর্ত্তার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল, এবং দীর্ঘিকার গভীর কৃষ্ণ সলিলরাশি তাঁহার চিত্তপটে বিভীষিকার বেশে জাগিয়া উঠিল। মহেশ্বর হুঁকা হস্তে শয্যায় বসিয়া গদ্‌গদকণ্ঠে ডাকিলেন, "গিন্নি!" গৃহিণী মুখ বাঁকাইয়া অধিকতর মনোযোগ সহকারে তৈলমর্দ্দনে মন দিলেন। কর্ত্তার আর গৃহিণী সম্ভাষণে সাহস হয় না! তাঁহার সঙ্কোচ দেখিয়া তাঁহার হুঁকাও ধীরে ধীরে এবং দীর্ঘ বিরামের পর এক এক বার আওয়াজ দিতে লাগিল। দণ্ডেক এই ভাবে গেলে, ঘোষ মহাশয় কিঞ্চিৎ নায়েবিস্বরে আবার ডাকিলেন—"গিন্নি!"

এবার গিন্নি কথা কহিলেন। "নাইতে চলেচি, মিছে মিছে পিছু ডাকা কেন?"

ক। বলি কিসে রাগ হলো? ছেলের বিয়ে, তুমি ঘরের গিন্নি, কথায় কথায় ছেলে মানুষের মত রাগলে কি চলে?

গৃ। যখন ছেলে মানুষ ছিলাম, ভারি তখন কি না আদর কর্ত্তে! যাও, যাও সব আমর মনে আছে। বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ!

কথাটা বাস্তবিক সত্য। কর্ত্তার মধুর ভাবোন্মাদটা বয়সের ফল—নহিলে প্রথম বয়সে গৃহিণী ছিলেন ভার্য্যামাত্র। নায়েবির মূল শ্বশুর, এবং সেই অবধি লক্ষ্মীর শ্রী। অতএব শ্বশুরকন্যার আদরও সেই হইতে। জগদ্ধাত্রীর কথায় সব কথা গুলো ঘোষজার মনে পড়িয়া গেল। খোঁটা খাইবার ভয়ে তিনি কথার স্রোত ফিরাইতে ব্যস্ত হইলেন।

"সত্যি গিন্নি রাগ কেন হলো? শুনলাম নাকি সেকরা গয়না নিয়ে এসেনি! তা রাগ কিসের, এখুনি মেরে তার হাড় ভেঙ্গে দেব!"

গৃ। মেরে ধরে আর কাজ নেই—আমি তোমার আপদ বালাই, আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। বাবা তোমার নায়েবি করে দিয়েছিলেন, আর আমার দোসরা যায়গায় একটা বিয়ে দিতে পারতেন না? তা তিনি নেই, ভাই ত আছে, বাপের বিষয় ত আছে! বাপের বাড়ী গেলে দুটি খেতে পাব, দুখানা পর্‌তে নেই পেলাম!

গর্জ্জন হইলেই তার বর্ষণ আছে। সুতরাং অবশ্যম্ভাবী চোকের জলে গৃহিণীর বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সক্রেটিসের মত মহেশ্বর পূর্ব্ব হইতেই সে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, অতএব ধৈর্য্য ধরিয়া রহিলেন। "সবুরে মেওয়া ফলে" অনেক দিনের কথা, তবে পাশ্চাত্য পণ্ডিত স্পেনসার নূতন ভাবে কথাটা বলিতেছেন বটে!

কিন্তু সবুরে ঘোষ মহাশয়ের ভাগ্যে মেওয়া ফলিবার বিশেষ সম্ভাবনা

দেখা গেলনা। বেশী সবুর করিবার যে অবসর, তাহাও তাঁহার ছিল না। অতএব রোদনের তৃতীয়াবস্থায়, অর্থাৎ দীর্ঘশ্বাস ও হা হুতাশের লাঘব হইতে না হইতে, তিনি মান ভঞ্জন কাণ্ডে ইতি করিবার মনস্থ করিলেন।

"তা হয়েচে, আমারি ঘাট হয়েচে! আমি নিজে গিয়ে গয়না এনে দেব এখন! কাল ছেলের গায়ে হলুদ, ছি, তুমি আর অমন রাগ টাগ করো না গিন্নি! বলি সে কথাটার কি হলো? বেয়ানকে জিজ্ঞেস্ কর্‌লে না?" শেষ কথাটায় সদ্যসংস্কৃত বাঁধ আবার ভাঙ্গিবার উপক্রম হইল। চক্ষু মুছিয়া জগদ্ধাত্রী স্বামীর পানে লোহিত লোচনের বঙ্কিম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, বলিলেন

"তোমার যেমন ছোট নজর—অমন বাপের বেটী আমি নই! এরি মধ্যে বেয়ান বেয়ান করে নাল পড়চে! অমন মন্তরি তন্তরি পূজোরি বেয়ান নিয়ে আমি কি কর্‌বো! ভাল গেরো জুটিয়ে দিচ্চো যা হোক্! ঐ বেয়ানকে আমি জিজ্ঞেস করবো—'বউমাকে কি কি গয়না দিবে বেয়ান?' মরণ আর কি! ও সব তুমি করো, টাকা টাকা করে খেপেছেন, খোসামুদে, কিপ্পণ মিন্‌সে!"

এ নূতন বিপদে নায়েব মহাশয় পার দেখিতে পাইতেছিলেন না। তাঁর মনে হইতেছিল, এর চেয়ে মনিব জমীদার হিসাব নিকাশের তলব করেন, সে ভাল! কিন্তু ছেলে পুরন্দর অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া তাঁহার উদ্ধার সাধন করিল। বাপ যে ঘরের ভিতর, তা সে জানিত না। অতএব সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে মার আর্দ্র চক্ষু দেখিয়াই বলিয়া উঠিল; "কেঁদে মর্‌চো কেন আবার সকাল বেলায়; পাঠশাল থেকে এসে ক্ষিধেয় মর্‌চি, দিদিকে জিজ্ঞেস কর্‌লাম যে মা কোথায়, তা হতভাগী হেঁসেই কুটি কুটি!" বলিতে বলিতে পিতার ধূমপানের রব তাহার কানে গেল। অমনি পুত্ররত্ন এক লাফে আঙ্গিনায় ফিরিলেন, এবং ছুটিয়া পলাইলেন। বাপের "পুরো রে—ও পুরো" প্রভৃতি ডাক সে ক্ষিপ্র গতির নাগাল পাইল না। তখন গৃহিণী তৈল বাটিকা ও কলসী ছাড়িয়া উঠিলেন। কর্ত্তাও ধড়ে প্রাণ পাইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

পুরন্দরের গায়ে হলুদ হইয়া গিয়াছে—এখন বাকী বিবাহ। গায়ে হলুদের দিনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা দিদির সঙ্গে পুরনের ঝকড়া; কেন না, দিদির কৌশলে বাপ সম্মুখে উপস্থিত থাকায় তুই দণ্ড ধরিয়া তৈল হরিদ্রার মর্দ্দন যন্ত্রণা পুরনকে সহিতে হইয়াছিল। নহিলে কার সাধ্য অতক্ষণ এক জায়গায় তাহাকে বসাইয়া রাখে! অভিমানে পুরন্দর ভাল করিয়া কাহাকেও চাহিয়া দেখিতেছিল না—অপাঙ্গে চাহিতে একবার দিদির ঈষৎমুক্ত দন্তপংক্তিতে কষ্টসংবৃত হাস্যলহরী দেখিয়া তাহার গা জ্বলিয়া গিয়াছিল। কাজেই ঠাকুরাণী দিদি যখন জোরে কর্ণ মর্দ্দন করিয়া দিলেন, এবং বোসেদের বড় বৌ যখন ঘোমটার ভিতর হইতে কাণে কাণে বলিলেন—"ছোট্ ঠাকুর ভাই, মাগুরমাছ সাঁতলালে কে?" তখন উত্তর গাওয়া দূরে থাক্, ভাল করিয়া সে তাঁহাদের ভ্যাঙ্গাইতেও পারিল না। অতএব গায়ে হলুদ শেষ ও পিতা চক্ষুর অন্তরাল হইলেই, পুরন্দর নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল। তাহার ফলে দিদি প্রভৃতি সুন্দরী-গণের তৈলহরিদ্রাময় দেহে পুষ্করিণীর পঙ্ক ও দ্রবীভূত গোময় শোভা পাইতে লাগিল। দিদির নাকাল কিছু বেশী রকমের হইয়াছিল, অতএব তিনি "লক্ষণের দিনেও" রোদন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ভাইয়ের প্রাপ্য গালি মোক্ষদা কাজেই "লক্ষণের দিনে" মার প্রতি বাক্যবাণরূপে প্রয়োগ করিলেন, এবং তখন মায়ে ঝিয়ে ঝুটোপুটি বাধিয়া গেল।

বরের গায়ে হলুদ এইরূপ বীররসে শেষ হইয়া গেল। হিন্দুর মেয়ের বিবাহ চিরকালই করুণরসাত্মক, কালভেদে আরও রূপভেদ হইয়াছে—কাজেই কনের গায়ে হলুদে তার ব্যতিক্রম হয় নাই। বেশী রকমের আমোদ প্রমোদ নিস্তারিণীর স্বভাববিরুদ্ধ, সুতরাং ভদ্র প্রতিবেশীরা অনেকক্ষণ ধরিয়া জটলা করিতে পান নাই। "ছোট লোকের" মেয়ে ছেলেরা কিন্তু তাঁহাকে অল্পে ছাড়িল না—কেন না, করুণার মিষ্ট হাসিটুকু তাঁর দেবতার বৃষ্টিবিন্দুর মত ছোট বড় ভেদ করিতে জানিত না। এ কারণে গ্রামের গরিব দুঃখীরা বরের বাড়ীর দিকে বড় একটা না ঘেঁসিয়া, কনের বাড়ী নির্ব্বিবাদে আক্রমণ করিল। নিস্তারিণী সেটা আন্দাজ করিয়া আগে হইতেই তৈল

হরিদ্রার যথোচিত আয়োজন করিয়াছিলেন, সুতরাং রুক্ষ শরীরে কাহাকেও ফিরিতে হইল না।

বাগ্দী বুড়ীর বড় আনন্দ, সে পুত্রবধু, পৌত্র ও পৌত্রীগুলিকে যথাসাধ্য তৈল হরিদ্রা নিষিক্ত করিয়া, হাসি মুখে বৌমার দিকে চাহিল। গদ গদ কণ্ঠে বলিল—"ষোল সতের গোণ্ডা বয়েস হলো বউমা কি বিশ গোণ্ডাই হয়, হরিশ-পুরে এমন পুণ্যির কাজ কাউরে করতে দেখিনি। বড় নোকে ঘটা করে বিয়ে গ্যায়, গরিবের মাথায় একটু ত্যাল কেউ দিতে পারে না বাছা! ফট্‌কের বাপ যে বলতো যেন আজা আমচন্দরের আজ্যি! আহা গরিব দুক্কীর কত আশীর্ব্বাদই কোড়লে মা—ফুলি যেন তোমার মাছে ভাতে থাকে, আর সুবচুনী করে—এম্‌নি দান ধর্ম্মে যেন মতি হয়।"

শুনিয়া বউমা একটু একটু লজ্জিত হইলেন, চোক ছল ছল করিয়া আসিল। তৈল হরিদ্রায়, হাস্য-অশ্রুতে যুগপৎ মাখামাখি হইয়া গরিব দুঃখীরা আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে ঘরে ফিরিয়া গেল।

আসল আমোদ ফুলকুমারীর সখীদের মধ্যে। সুশীলাদের সঙ্গে কালীর ভাব হইয়া গিয়াছিল, অতএব সইয়ের গায় হলুদে তাহাকে আঠার আনা কর্ত্তৃত্ব করিতে সকলেই সহায়তা করিয়াছিল। ফুল-মধ্যবর্ত্তিনী কুমারীদের স্নানের ঘাটে আবির্ভাব হইলে, সেখানে আর কাহারও ঠাঁই হইল না—ফুলের অনুনয় বিনয় ও মানা সত্বেও কালী প্রমুখ সখীগণ অল্প বিস্তর সাঁতার দিয়া পুষ্করিণীর আশ্রিত জলচরদিগকে ভীতিবিহ্বল করিয়া তুলিল।

মাতামাতি শেষ করিয়া পুরন্দর ততক্ষণে স্নানে যাইতেছিল, ছুটিতেছিল বলিলেই বোধ করি ঐতিহাসিক সত্যের পূর্ণ গৌরব রক্ষা হয়। দূর হইতে কনের দলকে দেখিয়া বিশেষতঃ, পুরন লজ্জায় মাঠের দিক্ দিয়া অপথে যখন ধাবিত হইল, তখন আর এ বিষয়ে কোন সংশয় রহিল না। পলায়নপর বরের হাতে একটা কিছু ছিল, তাহা লইয়া কুমারী সভায় বিষম তর্কবিতর্ক উপ-স্থিত হইল।

কেহ বলিল দর্পণ, কেহ বলিল জাঁতি। কাজল-লতা হাতে কনে লজ্জায় নিরপেক্ষ রহিলেন। কেবল সই ছুটিয়া গিয়া পুরো দাদার হাতে জিনিসটা কি দেখিয়া আসিয়া তর্ক মীমাংসায় সহায়তা করিতে চাহিলে, তিনি অন্যের অলক্ষ্যে তাহাকে চিম্‌টী কাটিবার লোভ সামলাইতে পারিলেন না। অতএব কালীর আর নাড়িবার সাধ্য রহিল না।

এ পক্ষ লেখকের নিবেদন—বাস্তবিক এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখার দিনে, এই কাজললতা এবং দর্পণ বা জাঁতিরহস্যের একটা মীমাংসার প্রয়োজন হইয়াছে। আমার এক হাঁচি টিকটিকি সম্প্রদায়ভুক্ত বন্ধু বলেন যে, ঐ যে দেখ কাজললতা, উহা মাতৃত্ববোধক। জাঁতিরহস্য তিনি আজিও ভেদ করিবার অবসর পান নাই, কিন্তু দর্পণ সম্বন্ধে তিনি স্থিরনিশ্চয় যে, উহা রূপজ, বর মুহুর্মুহু দেখিবেন, তাঁহার রূপ যেন কন্যার মনোহরণ করিতে পারে। এই সম্প্রদায়ের পাল্টা গাওয়া যাঁহাদের অভ্যাস, তাঁহাদের একজন বলেন যে, জাঁতি ধারণ একটা ঐতিহাসিক চিহ্ন, বিবাহ যে শক্তিমূলক, তাহারই প্রমাণ—পুরাকালে তরবারি সহায়ে কন্যা হরণ চলিত, সেই অর্থব্যঞ্জক, কিন্তু জাঁতির স্থলে ছুরীর কেন ব্যবহার হয় না, তিনি তাহার কোনও সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে পারেন না। আমার এক সদ্যবিবাহিত এবং তাম্বূল তাম্রকূট প্রিয় বন্ধুর কথাটাই এ পক্ষের লাগে ভাল। তিনি বলেন, বিবাহের কটাদিন তাম্বুল ও তামাকের যথোচিত সেবাই বোধ করি সুবুদ্ধি শাস্ত্রকারদের অভিপ্রেত! এখন মহাশয়দের যেরূপ অভিরুচি!

একাদশ পরিচ্ছেদ।

তার পর বিবাহ। বৈশাখী প্রভাতে কিসলয়কুঞ্জে এক দিকে কোকিল, পাপিয়া বউ-কথা-কওর গান; আর এক দিকে ললিত রাগে রসনচৌকীর বৈবাহিক গীতি, দুই মধুরে লয় হইতেছিল। নব বৈশাখে বাস্তবিক কেমন একটা মিলনের ভাব আছে—হরিৎ ধরিত্রী যেন নীল অনন্ত বিস্তৃত আকাশের মিলন জন্য উন্মুখ, নীচে সেই চিরপ্রহেলিকাময় গগণরূপী মনুষ্য হৃদয়, সেও বাঞ্ছিতের মিলনভিখারী।

নায়েব মহাশয়ের একমাত্র পুত্রের বিবাহ, অতএব বরপক্ষে ধুমধামের কিছু বাকী রহিল না। প্রভাত হইতে না হইতেই গ্রাম গ্রামান্তরের লোক হরিশপুরের দিকে ছুটিয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে মজিব জমীদারের প্রেরিত

আসবাবে নায়েব মহাশয়ের বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণ ছাইয়া গেল। একটা হাতী এবং চারিটা ঘোড়া আর তাহাদের ভৃত্যাদি জঙ্গম আসবাব গ্রামের বাহিরে দীঘির ধারের বটতলায় আসিয়া আশ্রয় লইল। রাইয়তদের মধ্যে যাহারা মাতব্বর, তাহাদের কেহ কেহ উপঢৌকন লইয়া আসিল,—আর আসিল আহূত অনাহূত বাদ্যকরের দল। ঢাকের মহাশব্দে ঢোলের কড় কড়ানি ডুবিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহাতে শ্রবণেন্দ্রিয়ের পক্ষে কোনরূপ ইতর বিশেষ বুঝা গেল না। যাহা হউক, হরিশপুর গ্রামে একটা অভূতপূর্ব্ব জয়োল্লাস পড়িয়া গেল। অনেক লোকে স্নানাহার ভুলিয়া, হস্তী এবং ঘোটক শিবির ঘিরিয়া রহিল। ছেলেরা হাতীকে "পায়কুলআঁঠির" ভয় দেখাইয়া, কেহ বা তাহার "গোদা পায়ের" অবমাননা পূর্ব্বক অবিরল শ্লোক পড়িতেছিল। গজবর "চারার" প্রতি বিশেষ মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন, শ্লোক তাঁহার স্থূলচর্ম্ম এবং শূর্পকর্ণ ভেদ করিতেছিল কি না বলা যায় না, কিন্তু "মাহুত" ও "মেঠ্" বাবাজীদের তাহাতে ধৈর্য্যচ্যুতি হইতেছিল। তাহার ফলে, ছেলেদের পিতৃ মাতৃ কুল উদ্ধার হইতেছিল।

এ সকলে জগদ্ধাত্রীর বড় আনন্দ, কিন্তু দুই একটা ত্রুটির জন্য তাঁহার ধন গৌরব কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইতেছিল। প্রথম নম্বর, স্বামী পুত্রবধুর অলঙ্কার ও বস্ত্রাদির তেমন ব্যবস্থা করেন নাই; দ্বিতীয় নম্বর, বেশী আতস্ বাজীর বন্দোবস্ত করিতে বলার অনুরোধ তিনি রক্ষা করেন নাই; এবং তৃতীয় নম্বরে এবং সর্ব্বোপরি পুরনের বিয়েতে, মোটে একটা হাতী, কিন্তু তাঁর ভাইয়ের বিবাহে চারিটা হাতী আসিয়াছিল। অতএব অনুযোগের উত্তরে ঘোষ মহাশয় নিরর্থক ব্যয়াধিক্যের করুণ আপত্তি দীনভাবে পেস্ করিলে, তাহাতে হুতাশনে আহুতি পড়িল। প্রকৃতির আইনে ঘাতের ধর্ম্ম প্রতিঘাত। সুতরাং নায়েব মহাশয় হাতীর মাহুতকে ডাকাইয়া তাহার কৈফিয়ৎ তলব করিলেন যে, সে কেন "দানা" সঙ্গে করিয়া আনে নাই। এবং কৈফিয়ৎ সন্তোষজনক না হওয়ায় নায়েবির প্রধান সম্বল স্বরূপ যে সম্বন্ধবিরুদ্ধ এবং অভিধান রাজ্যের বহির্ভূত বাক্যাবলী, সেই বাণ তাহার দিকে হানিলেন। এই গুরুতর কার্য্য শেষ করিয়া, নায়েব মহাশয় তাম্রকূট সেবনে রত হইবেন, এমন সময়ে বাগ্দী-বউ সুগুনির মা তাঁহার সম্মুখ দিয়া যায়। পাপিয়া যেমন সপ্তম হইতে একেবারে নামিয়া খাদে স্বরলহরী আয়ত্ত করে, ঘোষ মহাশয় তেমনি একেবারে ক্ষণিকপূর্ব্ব কঠোরতা ভুলিয়া, তাঁহার সাধ্য মিষ্টভাব সংগ্রহ করিলেন। "বল্লি,

বাগ্দী বেয়ান যে বড় এদিকে, তা আপনাদের কাজেই ভোর, এ বাড়ীতে কি এক বার আস্তেও নেই ? আমিও ত বেহাই, পর ত নই !”

এখন সুগুনির মা এক অভূতপূর্ব্ব সঙ্কটে পড়িল; কেন না, নায়েব মোশাই এই সবে প্রথম আজ্ বেহাইন সম্বোধন করিয়া তাহাকে সম্মানিত করিলেন। কাজেই সে জিব্ কাটিয়া মাথার কাপড় টানিয়া জড়সড় হইয়া একধারে দাঁড়াইল, মহেশ্বর মনে মনে হাসিলেন, বলিলেন, “বেহাইন ঠাক্রুণ শুনচি নাকি ছোট লোকগুলোকে খুব তেল হলুদ বিলিয়েচেন। তা বেশ, তাঁর আর কে আছে ? ছেলে ছিল না, জামাই হোল। জামাইকে দান সামগ্রী কি রকম দেবেন, বউমাকে অলঙ্কারই বা কি দেবেন, তা কিছু জান বাগ্দী বেয়ান ?”

সুগুনির মা তখনও সামলাইতে পারে নাই। কম্পিতকণ্ঠে জবাব যাহা দিল, তাহার অর্থ এই যে, ফুলের মার যা কিছু আছে, সবই কন্যা জামাতার। কিন্তু উত্তরটা বৈবাহিক মহাশয়ের মনের মত হইল না। তিনি পুনশ্চ বলিলেন,

“তাত বটেই। তা কি জান বেয়ান, তবু লোক লৌকিকতাটা আছে। সেই জন্যে আমি ভাব্‌চি যে, মনিব মহাশয়েরা যে হাতী, ঘোড়া লোক জন পাঠিয়েচেন, তাদের খোরাকী গুলো বেহাইন ঠাক্রুণ সরবরাহ করেন। সে বেশ দেখাবে ভাল, লোকেও বুঝ্‌বে আমি সমানে সমানে কাজ কর্‌চি ! তা এই কথা তুমি বেহাইনকে গিয়ে বলো বাগ্দী বেয়ান! তাঁর যদিস্যাৎ অমত না হয়, তা হলে লোকজন সব পাঠিয়ে দেব।”

বাগ্দী বেয়ানের কোন কথা ফুটিতে না ফুটিতে ঘোষ মহাশয় তাঁহার প্রিয় খানসামা দুঃখীরামকে হুকুম করিলেন যে, যত লোকজন বাহির হইতে আসিয়াছে, তাহাদের কনের বাড়ী দেখাইয়া দেয়—সেইখানে তাহাদের সিধা মিলিবে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সুগুনির মা কখন আশা করে নাই যে, নায়েব মোশাই তাহার সঙ্গে বেয়ান সম্বন্ধ ধরিবেন। বড় মানুষের মেয়ে পুরনের মা ছোট লোকের মেয়ে ছেলের সঙ্গে কথা কহিতে হইলেও নাসিকা কুঞ্চিত করিতেন, কাজেই তাঁহাকে কখন বেয়ান বলিতে সুগুনির মার সাহস হয় নাই। অতএব প্রফুল্ল মনে প্রভুপত্নীর কাছে নিজ সম্মানলাভের গল্পটা করিতে গিয়া, বেচারী প্রথমতঃ এক পসলা অশ্রুবারি বর্ষণ করিয়া ফেলিল। নিস্তারিণী প্রথমে আনন্দানুভব করিতেছিলেন, কিন্তু গল্প জমিয়া আসিলে, বিশেষ তাহার উপসংহারে, তাঁহার বিশেষ ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তাঁহার এমন আয়োজন কিছু ছিল না যে, খবর দিতে দিতে ঘোষ মহাশয়ের সেই ছোট রকমের অশ্বমেধ যজ্ঞটির রসদ সরবরাহ হইতে পারে। পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের সাধারণতঃ নিন্দাভয় বেশী—বিশেষ একমাত্র কন্যার বিবাহসংক্রান্ত নিন্দাভয়। নিস্তারিণী কূল কিনারা দেখিতেছিলেন না। এমন সময়ে ফনু আসিয়া জানাইয়া দিল যে, নায়েব মোশাইদের ভুঙ্কীরাম যত লোক জনকে এ বাড়ীতে সিধা লইতে তাগাদা করিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা সব এল বলে। ফনু নিজের বুদ্ধি খরচ করিয়া পুরোহিত ঠাকুরের সন্ধানে গিয়াছিল, কিন্তু তিনি গ্রামান্তরে গিয়াছেন। অনন্যোপায় হইয়া কর্ত্তৃঠাকুরাণী সার্ব্বভৌম মহাশয়কে ডাকিতে পাঠাইলেন। কালী তখন সইয়ের সঙ্গে কাছের ঘরের দাওয়ায় বসিয়া কুটনো কুটিতেছিল, বাপের নাম শুনিয়া তিন লাফে সইমার কাছে হাজির হইল। জিজ্ঞাসা করিল, বাবাকে কি জন্য এখন ডাক্‌চে, কেন না, আজ ত বিয়েও নয়, পূজোও নয়। সইমার মুখে নিত্য সুলভ হাসিটুকুর সম্প্রতি অভাব দেখিয়া কালী বিস্মিত হইল। মর্ম্মপীড়িত হইয়া তাঁর কোলের কাছে ঘেঁসিয়া বসিল। বড় দুঃখেও হাসিয়া নিস্তারিণী মায়াবী মেয়েটার মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন।

আদর পাইয়া কালী সইমার হাতে হাত রাখিল। সে বুঝিল, উদ্বেগের বিশেষ কিছু কারণ ঘটিয়াছে। অতএব পুনশ্চ সইমাকে আগ্রহে জিজ্ঞাসার উপর জিজ্ঞাসা করিল, বাবাকে তখন ডাক্‌তে পাঠালে কি জন্যে?

নি। বিয়ের ভারি একটা কথা আছে মা।

কা। তা ফনো দাদাকে পাঠালে কেন? বাবা এখন আহ্নিকে রয়েচে, মোছনমান ডাক্‌লে কি আর রক্ষে আছে বাছা! আমায় কেন বলো নি সইমা!

এই বলিয়া কালী সইয়ের দিকে ফিরিয়া তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিল—ফিরে এসে কাপড় কাচ্‌তে যাবে। তখন ছুটিয়া আপনার বাড়ী গেল। আহ্নিকের ঘরে পিতা শালগ্রাম শিলা, তাম্রকুণ্ড, পদ্মাসন এবং পুষ্প চন্দন ও গঙ্গোদক সম্মুখীন হইয়া দেবার্চ্চনায় নিমগ্ন ছিলেন। সে সময়ে সে গৃহে কাহারও প্রবেশের অনুমতি ছিল না। কিন্তু কন্যা বিধি নিষেধের ধার ধারেন না। যা কিছু ভয় মাকে, বাপের বড় আদরের মেয়ে। কাজেই তিনি আহ্নিকের দেরি দেখিয়া ধূপদান লইয়া পড়িলেন, এবং পাখা করিয়া ধূমে ঘর আচ্ছন্ন করিয়া দিলেন। সার্ব্বভৌম বুঝিলেন, কিছু একটা মতলব আঁটিয়া মা-লক্ষ্মী তাঁহাকে ছলনা করিতেছেন, সহজে একটু শীঘ্র আজ আহ্নিক না সারিলে চলিতেছে না। অতএব তিনি সত্বর হইলেন।

পুষ্পাধারে ফুল বিল্বপত্রের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও বাপকে শিখায় নির্ম্মাল্য বাঁধিতে দেখিয়া কালীর মুখ প্রফুল্ল হইল। বুঝিল, কৌশলটা নিষ্ফল হয় নাই। কিন্তু তবু দুষ্ট মেয়ে বাপের মন বুঝিবার জন্য কথা পাড়িল। মাথা নাড়িয়া ডাকিল—"বাবা!"

"কেন গো মা জননি!"

কা। এত শীগ্‌গির যে তোমার আহ্নিক হয়ে গেল? অর্দ্ধেক ফুল বিল্বি পত্তর থাক্‌তে থাক্‌তে!

সা। আমি ভাব্‌লাম মা লক্ষ্মীর কিছু একটা দরকার আছে!—নয় গো?

কা। (হাসিয়া) সত্যি বাবা, সইমা তোমায় একবার ডাক্‌চে, কি একটা ভারি কথা আছে। বাগ্দী মা পুরো দাদাদের বাড়ীতে কি শুনে এয়েচে, শুনে সইমার চোক ছল ছল কর্‌চে!

এই বলিয়া কন্যা নিজে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং দণ্ডায়মান পিতার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। কাষ্ঠপাদুকাপরিহিত, চন্দনচর্চ্চিত নামাবলী-ধারী সার্ব্বভৌম মহাশয় প্রসন্নমনে মুগ্ধের ন্যায় চলিলেন। বাটীর বাহির হইতে না হইতে কি একটা কথার জন্য একবার গৃহিণীসম্ভাষণে যাওয়ার ইচ্ছা হইল। "তোমার গর্ভধারিণীকে একটা কথা বলে আসি" বলিয়া পশ্চাৎপদ হইতে চাহিলে, কন্যা মহা আপত্তি করিয়া বসিল। অগত্যা তিনি চলিলেন।

এ দিকে দুঃখীরামের নির্দ্দেশানুসারে, জমীদারের লোকজন কনের বাড়ীতে আসিয়া হাজির। সুতরাং সার্ব্বভৌম মহাশয় পৌঁছিতে না পৌঁছিতে ফুলেদের বহির্ব্বাটী লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। পণ্ডিত বিস্মিত হইতেছিলেন—বিবাহের একদিন পূর্ব্বে বরযাত্র আসাটা কি শাস্ত্রসঙ্গত, না লৌকিক ব্যবস্থা? শেষে স্মার্ত্ত পণ্ডিতের স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন দ্বিধা বোধ না হউক, আত্ম স্মৃতিশক্তিকে বিশ্বাসঘাতিনী মনে হইতে লাগিল। ভাবিলেন, হয় ত আজই বিবাহের দিন, আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এই মহা ভাবনায় নিমগ্না-বস্থায় সার্ব্বভৌমকে যাহারা প্রণাম করিয়াছিল, প্রতিদানে তাহারা তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভে বঞ্চিত হইয়াছিল। প্রকৃতিস্থ হইয়া, তিনি আপনাকে অন্দরের প্রবেশপথে কন্যার আকর্ষণবিরহিতাবস্থায় যখন দেখিলেন, তখনও লোকে প্রণাম করিতেছে। অপ্রতিভ হইয়া তাহাদিগকে "জয়োস্তু" বলিতে না বলিতে আবার সার্ব্বভৌমকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ কন্যার পশ্চাৎবর্ত্তী হইতে হইল। বাপাকে বাহিরে দাঁড় করাইয়া কালী সইমাকে খবর দিয়া আসিয়াছিল। বাপের বসিবার আসন নিজে বিছাইয়াছিল। সার্ব্বভৌম আসন গ্রহণ করিলে, নিস্তারিণী গৃহমধ্যে উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। ফুলকে প্রণাম জানাইতে শিখাইয়া দিলেন, কিন্তু তাহার ভারি লজ্জা করিতে লাগিল। কালী বলিল, "বাবা, সইমা তোমায় নমস্কার করেচে!"

মায়েব সেথায় নমস্কার দুঃখীরাম যত

সা। জয়োস্তু! বিবাহের দিন কি আজ স্থির হয়েচে? আমার যেন স্মরণ হয়, আগামী কল্য ত্রয়োদশীতে শুভদিন। মালক্ষ্মী, জিজ্ঞাসা করতো, তোমার সইমাকে।

সইমাকে হাসিতে দেখিয়া কালীও হাসিল, আপনা হইতে বলিল,

"বাবা, তোমাতে আর পুরুত ঠাকুরে দেখেছো দিন, সইমা তার কি জানে? তোমরা ত কাল্‌কের কথাই বলেছিলে গো।"

সার্ব্বভৌম কাজেই কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া গেলেন। আত্ম-সম্বরণ করিয়া বলিলেন,—

"একটা ব্যাপার দেখে আমার স্মৃতিশক্তিটা কথঞ্চিৎ আচ্ছন্ন হয়েছিল। বাহিরে বিস্তর লোক দেখচি, তারা সব বরপক্ষীয়। গ্রামে বিবাহ হলে কি লোকাচার মতে এক দিন পূর্ব্বে বরযাত্র আসার ব্যবস্থা?

তখন নিস্তারিণী কালীকে দিয়া সকল কথা বলাইলেন। শুনিয়া সার্ব্বভৌম একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "এরূপ রাক্ষসের ব্যবহার ওই

পামরটারই শোভা পায়। বলিতে কি, এ সম্বন্ধের কথায় আমার তেমন মত ছিল না। আহা, কেদার ভায়া, মহাপুরুষ ছিলেন তিনি—ওদের ওপর তাঁর যৎপরোনাস্তি বিরাগ ছিল। তা আমি বিবেচনা কর্‌লাম কি যে, মেয়েটি গ্রামেই থাক্‌বে, জামাতাটিও দিব্য ছেলে, কাজেই আর আপত্তি করে তোমার সইমাকে মনঃক্ষুণ্ণ করি নি। কিন্তু কি এ ব্যাপার? পাষণ্ডটাকে দু' কথা শুনিয়ে দিয়ে এ ঘোর অন্যায়ের প্রতিবাদ করাই কর্ত্তব্য। এখুনি আমি চল্লাম।"

নিস্তারিণী বলাইলেন যে, সেটা ভাল হয় না। এখন এই উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধারের একটা পরামর্শ করা চাই। এখুনি এখুনি জিনিস পত্তর পাওয়া যায় কোথায়?

সার্ব্বভৌম মুস্কিলে পড়িলেন। স্মৃতিশাস্ত্র সাগর মন্থন করিয়া দেখিলেন, কোন ব্যবস্থা উপস্থিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। সাংসারিক ব্যাপারে গৃহিণী তাঁহার কর্ণধার, নিজে সে সব কিছু বোঝেন না। কাজেই পণ্ডিত নীরবে চিন্তা করিতেছিলেন।

কালী সইমার শিক্ষামত বলিল, "বাবা, সইমা বল্‌চেন, পুরো দাদার বাবার কাছেই যাওয়া ভাল, কিন্তু কোন ঝকড়ার কথা বলা হবে না। লক্ষ কথা না হলে বিয়ে হয় না—সব তাতে কনেরই হার। তুমি নরম করে যদি সইয়ের শ্বশুরকে দুটো কথা বল, তাতে কিছু ফল হতে পারে।"

সা। মূর্খস্য লাঠ্যৌষধং! নরম কথা বলে মহেশ্বর ঘোষকে ভোলান কি সহজ কথা গো!

কা। সইমা বল্‌চে, এই মাত্তর বল যে, এ বিপদে তিনি রক্ষে করুন। জিনিস পত্তর তিনি সব আনিয়ে দিন,—দাম যা লাগ্‌বে, সইমা দেবে। নইলে এখুনি এখুনি যোগাড় হয় কেমন করে?

সা। হাঁ, এ কথাটা আমারও লাগ্‌চে ভাল। মহেশ্বরকে বশীভূত করিবার মন্ত্রৌষধি যদি কিছু থাকে ত সে রৌপ্য চক্র। আচ্ছা মালক্ষ্মী, সেই কথাই ভাল, আমি চল্লাম। উত্তর যা পাই, বলে পাঠাব এখন তোমার সইমাকে। রাম রাম, এমন চণ্ডালের সঙ্গেও মানুষে কুটুম্বিতা করে।

সার্ব্বভৌম আসন ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে বহির্ব্বাটী হইতে ফনু সেখ আসিল, এবং খবর দিল, "নায়েব মোশাইদের চাকর হুকীরাম কি কথার জন্তে এয়েচে!"—কৌতুহলী হইয়া সার্ব্বভৌম মহাশয় পুনশ্চ ভাল করিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন, এবং তাহাকে ডাকাইতে পাঠাইলেন।

দুঃখীরাম নায়েব মহাশয়ের উপযুক্ত ভৃত্য। প্রভুর সেবাতেই বল, আর প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া টাকা আদায় করিতেই বল, সে একরূপ সিদ্ধবিদ্য। সার্ব্বভৌম মহাশয়কে দেখিয়াই গলায় গামছা বেড়িয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। এবং পরম ভাল মানুষের মত দাঁড়াইয়া রহিল। স্মার্ত্ত পণ্ডিত দুঃখীরামকে চিনিতেন, অতএব বক ধার্ম্মিকের উপাখ্যান স্মরণ করিতেছিলেন।

দুঃখীরাম করযোড়ে বলিল, "নায়েব মোশাই মা ঠাকুরাণীর কাছে আমাকে একবার পেটিয়ে দেলেন। এই যে সব লোক জন, এদের খোরাকী যদি ঘরে না থাকে, তবে বাবু বলেন, তিনি পেটিয়ে দেবেন। এর পরে তেনারে দাম দেলেই চল্‌বে।"

সার্ব্বভৌমের মুখে রক্তিম রাগ দেখা দিতেছিল, ঘরের ভিতর হইতে দেখিয়া নিস্তারিণী প্রমাদ গণিলেন, এবং তাড়াতাড়ি কালীকে দিয়া বলাইলেন যে, সেই কথাই ভাল। বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন বলিয়া তিনি বৈবাহিক মহাশয়কে ধন্যবাদের ভাগ পাঠাইতেও ভুলিলেন না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বৈশাখের শুক্ল ত্রয়োদশী—রজনী সর্ব্বসৌন্দর্য্যশালিনী। বাঙ্গলার পল্লীগ্রামের শোভা পূর্ণ মাত্রায় যদি দেখিতে চাও, এই কৌমুদী-প্রফুল্ল নিশি-বাসরে আসিয়া দেখ। বৃক্ষ লতা কিসলয় স্তবকে ফল পুষ্পে চন্দ্ররশ্মি মাখিয়া বিহ্বল, দীর্ঘিকা হৃদয়ে সেই শীতরশ্মি ধরিয়া বিহ্বল,—কোকিল, বউ-কথা-কও, পাপিয়াও যে গাহিয়া গাহিয়া বিহ্বল, সেও সেই সৌন্দর্য্যের উচ্ছ্বাসে। অনন্ত সৌন্দর্য্যের গানে সংসার পূরিয়া উঠিতেছে।

পুরন্দর ফুলকুমারীর আজ বিবাহ—হরিশপুরে জনকল্লোল আনন্দময়। জনসমাগমে প্রকৃতির কিছু বিকৃতি ঘটে।—বাদ্যভাণ্ডের অত্যাচারে পাখীরা সব নীরব, আতস বাজীর ধূমে জ্যোৎস্নাময়ী প্রকৃতির সে রমণীয় সঙ্কোচের ভাবটুকু কতকটা পৌরুষ ভাবে পরিণত। হউক, তথাপি যামিনী সর্ব্বসৌন্দর্য্যশালিনী। বিশেষ এমন সুন্দর রাত্রে "রোসনাই" করিতে গিয়া যে জ্যোৎ-

জ্জ্বল জ্যোৎস্নার শোভা মাটী করিয়া ফেলা হয়, উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহা হয় নাই। হিসাবী ঘোষ মহাশয় কিছু সে হিসাবে যান নাই, কিন্তু যেমন করিয়াই হোক, আলোর খরচ তাঁহার বিস্তর বাঁচিয়া গিয়াছিল।

কাজেই গৃহিণী জগদ্ধাত্রীর মনটা তেমন ভাল ছিল না। এ দিকে রাত্রি প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেল, দুই প্রহরে বিবাহের লগ্ন, ঘোষ মহাশয় মহা তাড়া লাগাইয়া দিলেন। পুরন্দরকে সাজাইয়া গোজাইয়া মার মন উঠে না,—পোষাক, অলঙ্কার কিছুই তাঁহার পছন্দমত হয় নাই। অতএব "শীগ্‌গির সার" দুই বার বলিতে গিয়া, ঘোষজা ভার্য্যার রক্তিম লোচনের তীব্র কটাক্ষ ও সুদীর্ঘ নিশ্বাস যুগপৎ উপার্জ্জন করিলেন। কন্যা মোক্ষদা পিতার কিছু পক্ষপাতিনী, মার তত বাড়াবাড়িটে তার ভাল লাগিতেছিল না, কিন্তু মার অভিমানের অশ্রু অন্ততঃ কিছু ক্ষণের জন্যও রুদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয় ভাবিয়া, সুবুদ্ধি মেয়ে আপনার বক্তব্য সম্প্রতি সংযম করিল। পুরন্দর খুঁটি নাটি স্ত্রী আচারের জ্বালায় তিক্ত বিরক্ত হইয়াছিল, ক্ষুধার জ্বালাও কিছু কম নহে, অতএব বেশ ভূষার অতিরিক্ত পারিপাট্য সমাধা করিবার ধৈর্য্য তাহার রহিল না। কাজেই জগদ্ধাত্রী ছেলেকে ছাড়িয়া দিলেন, এবং প্রথামত তাহাকে কোলে লইয়া বহির্ব্বাটীতে চৌপালায় উঠাইয়া দিতে গেলেন। বিজ্ঞ প্রতিবেশিনী ও কুটুম্বিনীরা অর্দ্ধচক্রাকারে চৌপালা বেড়িয়া দাঁড়াইলেন, এবং জগদ্ধাত্রীকে অনুরোধ করিলেন, ছেলের মুখে স্তন্য দিয়া জিজ্ঞাসা করা হউক—"কোথায় চল্‌লে বাবা?" এ পর্য্যন্ত কোন বিঘ্ন ঘটিল না, কিন্তু উত্তরদাতা পুরন্দর তেমন সহজে তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ করিল না। সবাই যত বলে, "বল্ পুরন, মা তোমার দাসী আন্‌তে চল্‌লাম", পুরন তত হাসিয়া আকুল। আদর করিয়া কেহ বলে পুরন, কেহ "পুরু", কেহ "পুরো", কেহ "বর",—কিন্তু পুরনের জবাব সেই হাসি। শেষে দিদি মোক্ষদা ভাইয়ের ধৃষ্টতা সহিতে না পারিয়া রুক্ষস্বরে "পুরো" এবং "ভারি দুষ্টু" বলার লোভ সামলাইতে পারিলেন না। অমনি ভাই রাগিয়া গেল, এবং তারস্বরে "ছুঁড়ি, তোর বরকে বলগে বল্‌তে" প্রভৃতি সাধু ভাষায় ভগিনীর সম্মান রক্ষা করিল। ইহার ফল এই হইল যে, স্বয়ং ঘোষ মহাশয় আসিয়া "লক্ষণের সময়েও" পুরন্দরকে কিঞ্চিৎ অনুযোগ করিলেন। এইরূপে জগদ্ধাত্রীর রুদ্ধ অশ্রুপ্রবাহ সহসা উথলিয়া উঠার অবসর পাইল, এবং আমরা খবর রাখি, সে রাত্রে তিনি জল গ্রহণ করেন নাই।

এ দিকে কনের বাড়ীতে বরযাত্রদের অভ্যর্থনা জন্য যথোচিত আয়োজন

হইয়াছে। অধিকাংশ বরযাত্র স্বগ্রামবাসী হইলেও কন্যা পক্ষের প্রতি তাঁহাদের সেই অহিনকুল সম্বন্ধ। অতএব ওপাড়ার লোক ভুলিয়াও একবার দিনের বেলায় কন্যা পক্ষের কোনও সহায়তা করিতে আসে নাই। নিস্তারিণী কিন্তু লোকাভাব জানিতে পারিলেন না। পুরোহিত হারাধন ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, তাহার যথেষ্ট বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, আর প্রতিবেশীরা ছোট বড় সকলেই আপনার মত ভাবিয়া দিনমান পরিশ্রম করিতেছিল। লুচির ঘরে অনেকগুলি আবশ্যক অনাবশ্যক লোকের সমাগম হইয়াছিল,—কেন না, গব্যরসসার যে ঘৃত, তাহার সৌরভ মিঠা কড়া তাম্রকুট গন্ধে মিশিয়া সে স্থান "অতিসেব্য" করিয়া রাখিয়াছিল। নিতান্ত নীরবে যে লুচি প্রস্তুত ও তাম্রকুট সেবন চলিতেছিল, ইহা কেহ ভাবিবেন না। মাঝে মাঝে হাস্যলহরী উথলিয়া উঠিতেছিল, এবং কন্যার শ্বশুর মহাশয়ের ব্যয়কুণ্ঠতার নানা কাহিনী জনে জনে মহা উল্লাসের সহিত বিবৃত করিতেছিলেন।

অন্দর মহলে আরও জাঁক। রক্তসম্বন্ধে বলিতে গেলে নিস্তারিণীর ত্রিকুলে কেহ বড় ছিল না। কিন্তু আজ আত্মীয়া অনেকগুলি জুটিয়াছিল। তালিকা এইরূপ :—পাঁচকড়ির মা নিস্তারিণীর সইমার ভাগিনেয় বধূ, কামিনীর পিসি তাঁহার জ্ঞাতিসম্বন্ধে ননদের যাতা, ভবসুন্দরী পিত্রালয়ের প্রতিবেশিনী কন্যা, মাতু এবং জগদম্বা বেগুনফুলের ভাই-ঝি, ইত্যাদি। এ হেন "সার্ব্বজনীন এবং সার্ব্বভৌমিক" কুটুম্বিতার আদর অপেক্ষা করিতে কর্ত্তৃঠাকুরাণীর দিনমান কাটিয়াছে। বিবাহের খুঁটিনাটি কাজকর্ম্মের ভার তিনি অনেকাংশে বৃদ্ধা পুরোহিত ঠাকুরাণী এবং কালীর মা ও পিসিদের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। কাজে কর্ম্মে মন নিবিষ্ট থাকিলেও অন্য দিনের চেয়ে আজ স্বামীর স্নেহ প্রফুল্ল মুখখানি বারম্বার নিস্তারিণীর মনে পড়িতেছিল, বারম্বার আহ্নিকের ঘরে গিয়া স্বামীপাদুকা দর্শন করিতে করিতে তিনি চখের জল মুছিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু কুটুম্বিনীবর্গের দাবি দাওয়াতে শোকের ফল স্থায়ী হইতে পাইতেছিল না। এই ভাবে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাটিল।

সন্ধ্যার পর মেয়েদের কনে সাজাইতে অনেকক্ষণ গেল। নিস্তারিণীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু নানা কাজে বারম্বার তাঁহাকে উঠিয়া যাইতে হইতে ছিল। কালী একবারও সইয়ের কাছ ছাড়া হয় নাই। এক বৃন্তে তারা দুটি ফুল, আজ্ বুঝি ছাড়াছাড়ি সুরু হইল। তাই আহ্লাদের ভিতরও দুই সইয়ের মর্ম্মতল হইতে যেন রোদন ধ্বনি উঠিতেছিলেন।

শেষে বর আসিল, শুভলগ্নে বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গেল। কন্যাদানের সময় স্বামীকে স্মরণ করিয়া নিস্তারিণী রোদন সম্বরণ করিতে পারেন নাই—পুরোহিত এবং সার্ব্বভৌমও চোকের জল মুছিতেছিলেন। যাঁহারা কেদার নাথকে জানিতেন, সকলেই দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন। ফুলকুমারী এইরূপে বিষাদপরিবৃত হইয়া স্বামীর সঙ্গে "শুভদৃষ্টি" বিনিময় করিল। তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল—কেন না, সেই সরোবর তীরে মুগ্ধাবস্থায় মৃত পিতার যে কণ্ঠ সে দিন শুনিয়াছিল, এ মুহূর্ত্তে আবার যেন তাহাই শুনিল। কে জানে, বিধাতার কেমন ইচ্ছা, এক এক ক্ষেত্রে পরিণাম এই ভাবে সূচিত হইয়া থাকে। কে ইহার রহস্যভেদ করিবে? ক্ষুদ্র আমরা পতঙ্গ, বালকের ন্যায় দৈবশক্তির যথেচ্ছা ক্রীড়ার সামগ্রী মাত্র।

দ্বিতীয় খণ্ড।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ ব্যাপারটা সুখে দুঃখে এত জড়িত যে, মনে হয়, ইহা সুখ দুঃখেরই মিলন। অনিশ্চিত এবং অদৃষ্টের উপর ইহার সম্পূর্ণ নির্ভর, সংসারের আশায় নৈরাশ্যে ইহার জীবন। ঋষি কণ্ব হইতে সাধারণ গৃহী পর্য্যন্ত সকলকেই যে কন্যাবিদায়ের সময় বাষ্প মোচন করিতে হয়, তাহার অন্য কোন অর্থ নাই।

অনেক আশা করিয়া নিস্তারিণী পুরন্দরের সহিত ফুলকুমারীর বিবাহ দিলেন। যাহা কিছু দেখিয়া লোকে কন্যা পাত্রস্থ করিতে পারিলে সৌভাগ্য জ্ঞান করে, উপস্থিত ক্ষেত্রে আপাত দৃষ্টিতে তাহার সকলেরই যোজনা হইয়াছিল। কুলমর্য্যাদায় বল, ধন সম্পদ মান সম্ভ্রমে বল, মহেশ্বর ঘোষ গ্রামে কাহারও অপেক্ষা হীন নহেন। তার উপর এক মাত্র পুত্রের বধূ—শ্বশুর শাশুড়ীর সাধ আহ্লাদের এমন সামগ্রী আর কি হইতে পারে? চিরজীবন শোক দুঃখে কাটিলেও এমন স্থলে মানুষের মনে স্বতঃই আশা ভরসার সঞ্চার হয়—নিস্তারিণীরও হইয়াছিল। কিন্তু বিবাহের অষ্টাহ গত হইতে না হইতে বুঝা গেল, সেটা তাঁহার ভ্রম মাত্র। অর্থপিশাচ ঘোষ মহাশয় দিনে দিনে স্বমূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিতে লাগিলেন। নূতন জমীদারী খরিদ করিলে তাহার হাট হদ্দ এক বার দেখিয়া লওয়ার যেমন রীতি, সেই ভাবে তিনি পুত্রের শ্বশুরালয়সংক্রান্ত ব্যাপার সকল দেখিবার মনস্থ করিলেন। মালিক কিছু নিজে জমিদারী দেখেন না,—বরাৎ মুৎসুদ্দি নায়েব প্রভৃতির উপর। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মালিক স্বয়ং নায়েব মহাশয়, অতএব মণি-কাঞ্চন যোগ হইয়াছিল।

বেচারী ফনু সেখকে যে তিনি এক দিন শাসাইয়াছিলেন—"রোস্ আগে বিয়ে হোক্"—বিবাহ শেষ হইয়া গেলে সেই কথাটা কার্য্যে পরিণত করিতে নায়েব মহাশয় কৃতসংকল্প হইলেন। অতএব পুরন্দর "যোড়ে" আসিয়া শ্বশুরালয়ে থাকিতে থাকিতে তিনি এক দিন প্রাতঃকালে তাঁহার চিরসহচর তিনটি

পদার্থ—গোল পাতার ছাতা, বাঁশের লাঠি এবং উদর—এই তিন পদার্থ সহায় করিয়া, বৈবাহিক গৃহে পদার্পণ করিলেন।

পুরন্দর তখন তাহার পাঠশালার সহচরদের সঙ্গে খেলায় মত্ত ছিল। ভিন্ন গ্রামে শ্বশুরালয় হইলে জামাতাকে যে ছদ্মবেশের নিগড় পরিতে হয়, স্বগ্রামে তাহা বড় করিতে হয় না। প্রথম দিন পুরনের বড় লজ্জা লজ্জা করিয়াছিল, মুখ তুলিয়া এমন কি কালীর সঙ্গেও কথা কহিতে পারে নাই, কিন্তু ভোলা এবং মধো আসিয়া তাহার সকল সঙ্কোচ দূর করিয়া দিল। পুরন্দরের সঙ্গে দুই চারিটা কথা কহিয়াই তাহারা প্রথম এক দফা ছুটাছুটি করিল, তাহার পর বাটীর সম্মুখবর্ত্তী বকুল গাছে তিন লাফে উঠিয়া বসিল। মধো বকুলের ফুল এবং ভোলা ফল সংগ্রহে মন দিল।

পুরন্দর এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিতে লাগিল, নিকটে কেহ আসিতেছে কি না! গাছে উঠিবার দুর্জ্জয় লোভ মহাকষ্টে তাহাকে সম্বরণ করিতে হইল। তখন দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া গাছের নীচে বসিয়া ফুল কুড়াইতে লাগিল, এবং হাতে পায়ে ব্যস্ত, কখন বা ভোলার কোঁচড় হইতে অপহৃত বকুল ফুল চর্ব্বণে রত মধো যে মহানন্দে গুরুমহাশয়ের গত কয়েক দিনের প্রহার এবং তাম্রকূট:সেবন ও নিদ্রার গল্প করিতেছিল, এক মনে তাহাই শুনিতেছিল।

এমন সময়ে গজকচ্ছপগতি পিতৃদেবের চিরপরিচিত চলিষ্ণু বংশছত্র পুত্রের দৃষ্টিপথে পড়িল। অমনি ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় এবং অন্দরে প্রবেশ পূর্ব্বক শয়ন গৃহে অর্গল বদ্ধ করিয়া শয়ন। শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী তখন সেই গৃহের দাওয়ায় বসিয়া কুটনো কুটিতেছিলেন, কনে সইয়ের সঙ্গে গৃহান্তরে পুতুল খেলায় বরের স্মৃতি নিমজ্জিত করিয়াছিলেন। অতএব হঠাৎ পুরন্দরের সেই ভাবে আবির্ভাবে শাশুড়ীর মাথায় চকিতে কাপড় উঠিল, কনের খেলা ধূলা ভাঙ্গিয়া গেল, আর কালীর সর্ব্বাঙ্গে হাসি ফুটিয়া উঠিল, এবং সে বাহিরে ছুটিয়া দেখিতে গেল,—ব্যাপার খানা কি? পরে বৈবাহিক মহাশয়ের শুভাগমন বার্ত্তা শুনিয়া, কনের মা তাড়াতাড়ি আসনাদির বন্দোবস্ত করিতে উঠিলেন।

একটু পরে "পুরোরে ও পুরো" ডাকিতে ডাকিতে ঘোষ মহাশয় বৈবাহিক-গৃহে প্রবেশ করিলেন। আসন বিছাইয়া বেহাইন ঠাকুরাণী গৃহ মধ্যে আশ্রয় লইলেন। শ্বশুরের নাম শুনিবা মাত্র তাহার অনেক আগে ফুল লুকাইয়াছিল, সুতরাং জামাইর মহাশয়কে আদর-অভ্যর্থনা করিবার জন্য একা কালী আসনের নিকট রহিল।

ঘোষ মহাশয়ের এটা ভাল লাগিল না। তিনি আসিয়াছেন নানা কাজের কথা কহিতে, অপর লোকে শুনিবে—হইলই বা সে বালিকা—ইহা হইতেই পারে না। কাজেই কালীকে কোন রকমে বিদায় করিতে নিতান্ত ব্যস্ত হইলেন।

"আরে কেও সার্ব্বভৌম ভায়ার মেয়ে নয়? তুই এখানে কেন গো! ডাগর মেয়ে বাপের একটু ভাবনাও নেই। রাত দিন আহ্নিক পূজো আর পুঁথির রাশ নিয়েই আছেন। কারো পরামর্শ তো নেবেন না! আমি এক দিন এক সম্বন্ধের কথা বলে মহা মুস্কিলে পড়েছিলাম আর কি! ভায়া এক বারে অগ্নিশর্ম্মা—বলেন, 'হাঁ আমি কি কন্যার বিবাহ দিয়ে পণ গ্রহণ করব নাকি?' দোষটা কি? চাল কলার চেয়ে সে ভাল; এমন সুযোগ কি ছাড়্‌তে আছে?" লজ্জায় কালী সইয়ের কাছে গিয়া লুকাইল, মহেশ্বর তাহা লক্ষ্য করিলেন না। তাঁহার মনে হইল, আপদ বালাই মেয়েটা তবে পলাইয়াছে। তখন ঝোঁকটা গিয়া পড়িল ছেলে পুরন্দরের উপর। তাহাকে ছুটিয়া পলাইতে দেখিয়াছিলেন, কাজেই বুঝিয়াছিলেন, বাড়ীর ভিতর কোথাও লুকাইয়া আছে। পিতার তীব্র স্বরে পুরন বিহ্বল হইয়া উঠিল, এবং দ্বার খুলিয়া নিতান্ত ভাল মানুষের মত তাঁহার কাছে মাথা গুঁজিয়া বসিল।

পিতা। এখানে বসলি কেন, বোকা ছেলেটা কোথাকার? দেখ্ তোর শাশুড়ী ঘরে আছেন কি না।

পুরন্দর উঠিয়া দেখিল, এবং বিষণ্ণ নীরবে সম্মতি-সূচক মাথা নাড়িল।

পিতা। তবে তুই ওই চৌকাঠে বোস্—আমি বেহাইনকে যে কথা বল্‌ব, তুই তার জবাব শুনে আমায় বল্‌বি—বুঝলি?

ভিতর হইতে এক খানা আসন চৌকাঠে আসিয়া পড়িল, কিন্তু জামাতার তাহাতে উপবেশন করিবার সাহস বা প্রবৃত্তি হইল না। পুরনের মনে হইতেছিল, কোন রকমে বাপের সম্মুখ হইতে পলাইবার উপায় হইতে পারে কি না? পিতার প্রসাদে শ্বশুরালয় সে মুহূর্ত্তে তাহার পক্ষে নিতান্ত আধুনিক অর্থ-ব্যঞ্জক হইয়া উঠিয়াছিল!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ঘোষ মহাশয় একটি ছোট রকমের ভূমিকা করিয়া কথা পাড়িলেন। তিনি যে এখন নিতান্ত আপনার হইয়াছেন, এবং সকল বিষয়ে বেহাইন ঠাকুরাণীর যে কর্ত্তব্য তাঁহার পরামর্শ লওয়া—বৈষয়িক কোন কথা গোপন করা আর যে বিহিত হয় না—ইহাই তাহার ইঙ্গিত। কতক উদ্বেগ, কতক কৌতূহল আসিয়া নিস্তারিণীর হৃদয় চঞ্চল করিয়া তুলিল। বৈবাহিক বলিয়া চলিলেন—

"কতক গুলো ভাল জমী শুনচি নাকি একটা মোছলমানকে ভাগে দেওয়া হয়েচে? কি তার নামটা,—মরুক—ফনো বুজি—হাঁ ফনোই বটে।—তা এত লোক থাকতে মোছলমানকে জমী দেওয়া কেন? সে ত সবই ফাঁকি দেয়, নইলে ২।৩ বছরের ভেতর অমন গুছিয়ে উঠলো কেমন করে? ব্যাটার বাড়ীতে আম কাঁঠালের বাগান, ৩।৪ টে মরাই। তা আমি বলি কি, ওকে ছাড়িয়ে দিয়ে—যদিস্যাৎ কোন বাধা না থাকে, আমার চাকর দুঃখীরামের ভাই নসীরামকে জমীগুলো দেওয়া হোক্। লোকটা আমার আশ্রিত, আর ডাকতে হাঁকতেও পাওয়া যাবে।"

নিস্তারিণী বিপদে পড়িলেন। তিনি ভাবিয়া পাইতেছিলেন না, ফন্নুর অপরাধটা কি? আম কাঁঠালের বাগানের নাম শুনিয়া একবার সেই ইচড়ের কথাটা তাঁহার মনে পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু বৈবাহিক মহাশয় সেই তুচ্ছ ব্যাপার ধরিয়া গরিবের অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছেন, তিনি এরূপ নীচতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। প্রথমে তিনি চুপ করিয়া রহিলেন, পরে উত্তরের জন্য নিতান্ত পীড়াপীড়ি হইলে জামাতাকে দিয়া বলাইলেন, ফন্নু অনেক দিনের আশ্রিত লোক, খুব বিশ্বাসী।

শাশুড়ী এত আস্তে কথা কহিতেছিলেন যে, বালক জামাতাও তাহা বুঝিতে পারে নাই, বিশেষ ভোলা আর মধোর সঙ্গে বকুল তলার খেলার কথা ভাবিয়া সে তখন অন্যমনস্ক হইতেছিল। অতএব পিতার কাছে ধমকের উপর ধমক খাইল। নিস্তারিণী জামাতার দুর্দ্দশা দেখিয়া একটু অগ্রসর হইয়া বসিলেন, এবং উত্তর পুনরুক্ত করিলেন।

সুরেশ্বর ভাবেন নাই যে, বেহাইন তাঁহার প্রথম অনুরোধ এই ভাবে

উপেক্ষা করিতে সাহস করিবেন। এবার একটু জোরের সহিত বলিলেন, "তা যাই হোক্, জমী গুলো তার কাছ থেকে ছাড়াতে হবে!"

নি। সেটা ভাল হয় না। আশ্রিত লোক, কত আশা করে আছে। কাল বিয়ে হোল, আজ্ তার রুজি মার্‌লে, গরিব মল্লি করবে। আর সে অনেক দিনের আশ্রিত, যখন তখন ডাকিয়ে এনে ফাই ফরমাইস্ করতে পারি। নূতন লোক দিয়ে তা হবে না, আমি তার সাম্‌নে বেরুব কেমন করে?

ইহার উপর আর কথা চলে না। বেহাইনের কাছে এতটা দৃঢ়তার প্রত্যাশা মহেশ্বর করেন নাই, গৃহিণীকেই তিনি স্ত্রীজাতির আদর্শ মনে করিতেন, সুতরাং হটিয়া কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইলেন। কিন্তু আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে যেমন পিত্ত পড়িয়া যায়, বৈষয়িকতার একটা সীমা আছে, যাহার বাহিরে মনুষ্যত্বের পিত্তও তেমনি লোপ হইয়া আসে। মহেশ্বর হটিলেন, কিন্তু তবু ছাড়িলেন না।

"আচ্ছা তা বেয়ান না শোনেন, থাকুক মোছলমান ব্যাটারই ভাগে জমী গুলো! কিন্তু দেখে শোনেই বা কে? আমি ত দু পাঁচ দিন পরে পরগণায় চলে যাব। হাঁ, আর একটা কথা বল্‌তে চাই। আমার মনীব সরকারে একটা জমীদারী বিক্রী হবে, আমার ইচ্ছা, বেনামী করে সেটা পুরনের জন্য খরিদ করি। কিন্তু অনেক টাকার দরকার,—কোথায় পাব? বেহাই মশায় শুন্‌তে পাই অনেক টাকা উপার্জ্জন করেছিলেন। কিছু টাকা কর্জ্জ পেতে পারি কি না—বিষয় আপনকার কন্যা জামাতারই থাক্‌বে বেয়ান!"

নিস্তারিণী সশঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। স্বামীর অন্তিম অনুরোধ মনে পড়িয়া গেল। গুপ্ত ধনের কথা কাহারও কাছে কখন তিনি ব্যক্ত করেন নাই, বিশেষ বিষয় খরিদের পরামর্শ স্বামী চিরকাল ঘৃণা করিয়া গিয়াছেন। বেহাই কথাটা আর না তোলেন, এই ভরসায় নিস্তারিণী প্রথমে উহা একেবারে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। ব্যাধের জালে পড়িয়া হরিণীও বুঝি এইরূপে পলায়নের চেষ্টা করে।

বৈবাহিক মহাশয় হাসিলেন—সে হাস্য পূর্ণ বিষয়ীর শুষ্ক হাস্য, অবিশ্বাস এবং নৈরাশ্য তাহার প্রাণ। মুহূর্ত্তে তিনি একটা মতলব আঁটিয়া লইলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন

"আমি নিজের জন্যে কিছু বল্‌ছিনে বেয়ান, আপনকার কন্যা জমাতার

ভবিষ্যতে যাতে ভাল হয়, তাই আমার উদ্দিশ্যো! আপনকাদের কৃপায় এক কলমে আমি যা করেছি, আমার তাই খায় কে? শুন্‌চি নাকি নবাবের সঙ্গে কোথাকার পাদশার শিগ্‌গির একটা মস্ত নড়াই হবে। সহরের এত কাছে থেকে টাকা পুঁতে রাখ্‌লে সে টাকা থাকা ভার, সিপাহীরা সব লুটে নেবে। তার অপিক্ষা যদিস্থাৎ বিষয় আশয় করা হয় ত মাটি কেউ নিতে পারবে না।"

নিস্তারিণী দেখিলেন, উত্তর দেওয়া অনর্থক। উত্তর দিলে কথাবার্ত্তা ক্রমে কষ্টকর হইয়া উঠিবে। তথাপি চক্ষু লজ্জা এড়াইতে না পারিয়া বলিলেন, "যা কিছু সামান্য তাঁর আছে, সবই কন্যা জামাতার।" নায়েব মহাশয় বেয়ানকে চিনিয়াও ভাবিলেন, সবুরে মেওয়া ফলে। তিনি উঠিলেন। পথে যাইতে নানা ফন্দী তাঁহার মনে উঠিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

কর্ত্তা গৃহে ফিরিতে না ফিরিতে গৃহিণী শুনিলেন, তিনি বেয়ান বাড়ী গিয়াছিলেন। কেন গিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে ত পরামর্শ করিয়া যান নাই! এই প্রথম নম্বর অপরাধ। দ্বিতীয়, বিয়ের আট দিন যেতে না যেতে সেখানে যাওয়া—একি কুলক্ষণ! জগদ্ধাত্রী হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গেলেন, স্থির করিলেন, আজই বাপের বাড়ী চলিয়া যাইবেন। কাজেই কর্ত্তার সাক্ষাৎলাভের পূর্ব্বেই, তিনি মেঝেয় পড়িয়া চখের জলে অর্দ্ধেক আঁচল ভিজাইয়া দিলেন।

মুখের শীকার ছুটিয়া গেলে ক্ষুধিত শার্দ্দূলের যে অবস্থা—ক্রোধ এবং ভবিষ্যৎ আহার্য্যান্বেষণের চেষ্টাময় উদ্বেগ, সেই ভাবে নায়েব মহাশয় ফিরিয়া আসিয়া আপনার বৈঠকখানায় বসিলেন। দুঃখীরাম তখন কার্য্যান্তরে ছিল, অতএব তামাক সাজিতে অযথা দেরি হইয়া গেল। দুঃখীরাম, দুঃখীরাম, দুখে, দুখো প্রভৃতি নামের অপভ্রংশ, রোষকষায়িত লোচন এবং ক্রমোচ্চ তীব্র কণ্ঠে বারম্বার ঘোষিত হইলেও যখন হাজরাপুত্রের সাড়া পাওয়া গেল না, তখন কাজেই নায়েব মহাশয়ের বাৎসল্য রসের গালি ক্রমে মধুর রসের দিকে অগ্রসর হইল। শ্যালক নামে তিন বার অভিহিত হইবার পর, দুঃখী

নিতান্ত দুঃখিত ভাবে মনিব সমীপবর্ত্তী হইল, এবং কলিকা লইয়া প্রস্থান করিল। সকলেই ভরসা করিয়াছিল, এত গর্জ্জনের পর দুঃখীর পৃষ্ঠোপরি কিঞ্চিৎ বর্ষণ হইবে, আর কেহ হইলে হইতও তাই, কিন্তু দুঃখী প্রিয় ভৃত্য, তাহার জন্য নায়েব মহাশয়ের আইনে কতকগুলা বর্জ্জিত বিধি ছিল।

দুঃখীরাম অতঃপর তাড়াতাড়ি তামাক সাজিয়া আনিল বটে, কিন্তু একটা কুখবরও সেই সঙ্গে লইয়া আসিল। মনিব মহাশয় সতৃষ্ণ নয়নে তামাক ইচ্ছা করিয়া ভৃত্যের স্ফীত এবং কলিকার অগ্নিপ্রেরিত রক্তিমাভায় উজ্জ্বল গণ্ড দুই খানির উপর প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন, এমন সময়ে দুঃখীরাম মাঠাকুরাণীর দুর্জ্জয় মানের সংবাদ দিল। প্রভুর উপর আজ তাহার মহা অভিমান হইয়াছিল, বিশেষ তিনি প্রতিপালক পিতা হইয়া যে রাগভরে নিতান্ত বিরুদ্ধ সম্বন্ধ ধরিয়া থাকেন, এবং এইমাত্র ধরিয়াছিলেন, সে অপমান তাহার হৃদয়ে বাজিতেছিল। সুতরাং নায়েব মহাশয় একেবারে শুকাইয়া গিয়া যখন ভৃত্যের নিকট কর্ত্রীঠাকুরাণীর মানের কারণ অতিশয় ব্যস্ততা সহকারে বারংবার জিজ্ঞাসু হইলেন, সে তখন নিতান্ত নির্ব্বিকার ভাবে একটি আধটি কথা কহিয়া, কেবল তাঁহার কৌতূহল ও উদ্বেগ যুগপৎ বৃদ্ধি করিয়া একরূপ প্রতিশোধ লইতে লাগিল।—"তা আমি কি জানি হুজুর, তিনি কি আমাকে বলে কয়ে রাগ করেচেন?" "জুতো ঝেড়ে আমাদের গুজরাণ—ও সব কথার আমরা কি জানি বাবু!" "মা ঠাকরুণের জন্যেই এ বাড়ীতে থাকা, তাঁর দুক্ষু দেখ্‌লে ভারি দুক্ষু হয়।"

এই সকল কথা দুঃখীরাম মুখ মহা ভার করিয়া বলিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার ফলস্বরূপ মনিবের কুঞ্চিত ভাব দেখিয়া, তাহার মনে প্রতিশোধ-সুলভ একটা সুখ জন্মিতেছিল। ঘোষ মহাশয় সাধারণতঃ মনুষ্যচরিত্র এবং অসাধারণতঃ প্রজাচরিত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইলেও, দুঃখীরামচরিতামৃতের মর্ম্ম ভেদ করিয়া উঠিতে পারিতেন না, কাজেই তাহার ভার ভার মুখ খানায় বিশ্বাসী ভৃত্যের দারুণ অভিমান ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইতেছিলেন না। কিন্তু তাহার হৃদয় মন্দির লীলালহরী তখন দেখিতে পাইলে, নায়েব মহাশয় কূপবাসী ভেকের ন্যায় বলিয়া উঠিতেন সন্দেহ নাই—"বাপু হে—তোমার খেলা, আমার মরণ!" ফলতঃ আর তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। "নদী যথা ধায় সিন্ধু পানে" মুক্তকচ্ছ এবং দোদুল্যমান-উদর ঘোষ মহাশয় অন্দর

পথে ধাবিত হইলেন। আলবোলা হাতে কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে তাঁহার উপযুক্ত ভৃত্যও প্রভুর পথানুসরণ করিল।

ঘোষ মহাশয় বুঝিয়াছিলেন, কিসের জন্য অভিমান। বাস্তবিক তিনি মনে মনে স্বীকার করিলেন যে, কর্ত্রীঠাকুরাণীকে না সুধাইয়া তাঁহার বৈবাহিক গৃহে সে ভাবে যাওয়াটা ভাল হয় নাই। কিন্তু কৃত কার্য্যের জন্য বিনা ওজরে স্ত্রীজাতির কাছে অপরাধ স্বীকার করা অথবা মনের আসল মতলব প্রকাশ করিয়া বলা যে বৈধ, চাণক্য পণ্ডিত কৈ এমন উপদেশ দেন নাই। কাজেই ঘোষ মহাশয় গৃহিণীসম্ভাষণের জন্য মনে মনে একটা সওয়াল জবাবের খস্ড়া তৈয়ার করিলেন। এ দিকে জগদ্ধাত্রী এতক্ষণ গুন্ গুন্ সুর ধরিয়া হর্ম্ম্যতল আশ্রয় করিয়াছিলেন—এক এক বার বঙ্কিম-দৃষ্টিতে স্বামীর পথ চাহিতেছিলেন। অতএব নায়েব মহাশয়ের অন্দর প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রোরুদ্যমান কণ্ঠ একেবারে পঞ্চমে চড়িয়া গেল। কর্ত্তা শুনিলেন, পনর বৎসর পরে গৃহিণীর পিতৃশোক উছলিয়া উঠিতেছে—কেন না, রোদনের ছন্দোবন্ধময় ভাষায় জগদ্ধাত্রী বলিতেছিলেন, "বাবা গো, কেন আমার এমন বিয়ে দিয়েছিলে!"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

"বলি ও গিন্নি—ছি! ক্ষেপ্‌লে নাকি?"

গৃহিণীর পদপ্রান্তে বসিয়া বসিয়া, অনেকক্ষণ ধরিয়া রোদন বেগের লাঘব ভরসা করিয়া, কর্ত্তা শেষে আর থাকিতে পারিলেন না। কেন না, ভূতপূর্ব্ব বিবাহের জন্য পিতৃ আত্মাকে বিধিমতে অনুযোগ করিয়া শোকাভিভূতা কন্যা মাতৃ আত্মাকে আসরে নামাইবার উপক্রমণিকা প্রচার করিবেন—এইরূপ বোধ হইল। কাজেই কর্ত্তাকে উপায়ান্তর না দেখিয়া একটু স্নেহমাখা তৎসনার সুরে জবাব সুরু করিতে হইল। "খেপ্‌লে নাকি গিন্নি! গাঁয়ে বেহাই বাড়ী, ছেলেকে একবার দেখে এসেছি, এই বই ত নয়? ছি—ছেলেমানষি কর্ল্লো না, উঠ, লক্ষীটি আমার।" ইত্যাদি।

দুঃখীরাম সকলিকা ফরসিটি বারান্দায় রাখিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল, এতক্ষণে তাহার প্রতি ঘোষজার দৃষ্টি পড়িল। কিন্তু তাম্রকূট সুন্দরী ও (পাঠক পাঠিকা ব্যাকরণের ব্যভিচার ধরিবেন না, এ পক্ষ লেখক আধুনিক স্ত্রীজাতির পৌরুষ উপাধি ধারণের প্রতি সহানুভূতি রাখেন)—তাম্রকূট মহাশয়াও তাঁহার দীর্ঘ অবহেলায় অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া শেষে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছিলেন। লক্ষ্মীর অনুগ্রহ লাভ করিতে গেলে যেমন সরস্বতীর নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়, গৃহিণীর মান রাখিতে তেমনি বোধ করি মাদক রসজ্ঞতার কাছেও চিরবিদায় লওয়ার প্রয়োজন। যখনকার কথা আমরা বলিতে বসিয়াছি, তখন এ কথা তত না খাটুক, এখন খাটিতেছে।

স্বামীর সোহাগের ফলে মানিনী একবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন, দেখিয়া নায়েব মহাশয়ের ধড়ে প্রাণ আসিল। সাহস পাইয়া তিনি আবার বলিতে লাগিলেন—"আমি ভাবি নি যে, ছেলেকে দেখ্‌তে গেলে তুমি এমন রাগ্‌বে। তা তোমায় না জিজ্ঞেস্ করে গিয়ে ভাল করিনি গিন্নি—শেষে পস্তাতে হচ্চে। ভাল কথা, লোকে বেহানের অনেক নিন্দা করে, আগে তা আমি পিত্তয় কর্‌তাম না। কিন্তু আজ দেখ্‌লাম সত্যি! এমন অহঙ্কার, তা আগে জান্‌তাম না!"

এ অমোঘ অস্ত্র। সাধারণতঃ শ্রীমতী জগদ্ধাত্রী দাসী পরনিন্দায় থাকেন ভাল, তার উপর বেহাইনের নিন্দা! নায়েব মহাশয় কিছু সন্ধান করিয়া বাণক্ষেপ করেন নাই, বেহাইনের উপর বাস্তবিক তাঁর অভক্তি হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু এ ক্ষেত্রে যেমন করিয়াই হোক্, লক্ষ্য বিঁধিয়া গেল। ইহার ফলে গৃহিণীর রোদন বন্ধ এবং মানস্রোত ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইল। বিস্মিত ঘোষজা শুনিলেন, সহধর্ম্মিণী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া অস্ফুটস্বরে বলিতেছেন, "কাঙ্গালের কথা বাসি হলে মিষ্টি নাগে। তখুনি বলেছিলাম, বলি মন্তুরি তন্তুরি বেয়ান করো না। আমার যেমন পোড়া কপাল, কত দিকে কত যন্ত্রণাই দিলে পোড়ার মুখো মিন্‌সে!"

এ সকলের জন্য নায়েব মহাশয় সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু কথা শেষ করিয়া গৃহিণী যে আবার জোরে জোরে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িতে লাগিলেন, ইহাতে তাঁহার ভয় হয় হইল, পাছে কাঁচিয়া বর্ষণ সুরু হয়। অতএব বাক্যশৃঙ্খল রক্ষা করিবার জন্য তিনি পুনশ্চ কহিলেন—

"পুরোকে দেখে একবার মনে কর্‌লাম স্ত্রীলোকের সংসার, চাকর বাকরে

লুটে পুটে খায়, বেহাইন ঠাকৃরুণকে ছুটো সলাই না হয় দিই! তা আমার যুক্তি পরামর্শ বড় বড় মুৎসুদ্দিরা ঘাড় পেতে শোনে, কিন্তু বল্‌ব কি গিন্নি—বেহান কি না তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দিলে। আমি ত একেবারে অবাক্! কিসের যে অহঙ্কার, তা ত জানিনে। বড় মানুষের মেয়ে হলে বটে তা সওয়া যায়। ওঁর বাপ মার বংশ যে কি—তা আর আমার জান্‌তে বাকী নেই!"

অমনি গৃহিণীর মনে আত্ম-পিতৃবংশ-গৌরব জাগিয়া উঠিল। তিনি উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন—"বাবা বল্‌তেন, ছোট লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা কর্‌তে নেই! আমার কথা যে না শোনে, আমি তাকে বলে কেন অপমান হব।"

মহেশ্বর বাস্তবিক বেহাইনের দৃঢ়তায় চটিয়া আসিয়াছিলেন, তার উপর গৃহিণীকে উত্তেজিত করিয়া একটা মতলব হাসিল করাও তাঁহার ইচ্ছা, অতএব কিঞ্চিৎ কাতর হইয়া বলিলেন—

"ঘাট হয়েচে গিন্নি, তোমার বুদ্ধি নিয়ে চল্‌লে এ অপমান আমার হ'ত না। আর তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন কাজই কর্‌ব না, দিব্বি করচি গিন্নি! এ অপমানের শোধ নিতেই হইবে। কি করে তা হয় বল?"

গৃ। তার আবার কি? পালকী বেহারা পাঠিয়ে দাও, ও বেলা ছেলে বউ নিয়ে আসুক্। মরণ আর কি! অহঙ্কার নিয়ে ধুয়ে ধুয়ে খান এখন্।

মহেশ্বরের মতলব সিদ্ধ হইল। তিনিও ইহাই আঁচিয়া রাখিয়াছিলেন, নহিলে বেহাইনকে যুগপৎ নরম ও জব্দ করার উপায়ান্তর নাই। প্রকাশ্যে তিনি গৃহিণীর বুদ্ধির অনেক সাধুবাদ করিলেন, এবং তারস্বরে দুঃখীরামকে ডাকিতে লাগিলেন।

জগদ্ধাত্রী বলিলেন, "কিন্তু তোমার কাজে কথায় এক রত্তিও পেত্তয় নেই। এখুনি যদি বেয়ান বলে, কিছু টাকা দেব, তুমি অমনি কুকুরের মতন ছেলে বউ আবার বয়ে দিয়ে আস্‌বে। ছি! এত লোভ কি করতে আচে? এর পর ব্যাঙেও তোমায় নাতি মার্‌বে।"

এই বক্তৃতা কতক্ষণ চলিত বলা যায় না, কিন্তু দুঃখীরাম আসিয়া পড়াতে গৃহিণী ঠাকুরাণীকে ইহা বন্ধ করিতে হইল। কর্ত্তাও সম্প্রতি আর অধিক বাক্য যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

খবরাখবর নহিলে সংসার চলে না। দেশে যখন রেলের গাড়ী, তারের দূত ছিল না, তখনও খবর ছিল। সহরের খবর বড় রাখি না, কিন্তু পল্লীগ্রামের সেই সনাতন খবরবাহিকারা আজিও বিরাজ করিতেছেন। কর্ত্তা গৃহিণী যখন কথায় বার্ত্তায় নিযুক্ত, তখন হরিশপুরের প্রধান খবরবাহিকা যিনি, তিনি ঘোষ মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত ছিলেন। নয়নের মাসী চারি আনা পয়সা ধার করিতে ঘোষপত্নীর কাছে আসিয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহার দেখা না পাওয়াতে, যথায় কন্যা মোক্ষদা মাছ কুটিতে নিযুক্ত, হাসি মুখে গুড়ি গুড়ি তথায় গিয়া বসিলেন।

নয়নের মাসীর অবশ্য বয়স হইয়াছে, নহিলে গুড়ি গুড়ি হাঁটিবে কেন? কিন্তু স্বয়ং সে তাহা স্বীকার করিতে চাহে না। যাহারা তাহাকে বলিত, শোকাতাপা মানুষ বলে কম বয়সে নয়নের মাসীর কোমর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহাদের কথাই ঠিক্, এইরূপ তাহার বিশ্বাস। কিন্তু সে যেমনই হউক, মান্ধাতার আমলের খবর তাহার ওষ্ঠাগ্রে, আর অধিকাংশ গল্পের সঙ্গে আপনাকে অধিনায়িকা ভাবে জড়িত করিতে নয়নের মাসীর বড় ভাল লাগিত। এই অসঙ্গতি সত্ত্বেও জগদ্ধাত্রী নয়নের মাসীকে প্রায় সমবয়স্কা জানিয়া, পেটের কথা খুলিয়া বলিতেন।

মোক্ষদা একটু তেজী মেয়ে, ঠকামি এবং মিছায় তেমন রাজি নহে, কাজেই নয়নের মাসী হাসির উত্তরে হাসিমাখা অভ্যর্থনায় বঞ্চিত হইল। তা হউক, বৃদ্ধা বসিবার উদ্যোগ করিলে মোক্ষদা একটু ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "বস"।

নয়নের মাসী বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া অবধি কলহের একটা ঘ্রাণ পাইতেছিল,—ঘ্রাণশক্তির প্রখরতা জীব বিশেষেরই একচেটিয়া নহে—কাজেই কোন ওছিলায় নিগূঢ় তত্ত্বটুকু জানিতে ব্যস্ত হইল। কিন্তু মোক্ষদা মেয়ে বড় শক্ত, সহজে তার কাছে কথা পাওয়া যায় না,—সেটি নয়নের মাসীর জানা ছিল। বুড়ী ভাবিয়া চিন্তিয়া সুধাইল—"মাছ এল কোত্থেকে গো?"

মো। অত জানিনে বাপু! কুটুচি এই জানি।

"আমি ভেবেছিলাম বুঝি নতুন কুটুম বাড়ীর মাছ। তা হাঁ মা, তোমার মাছই নাকি তোমার বাপের"—নয়নের মাসী আর বলিতে পাইল না। মোক্ষদা ঘৃণা প্রকাশ করিয়া তাহাকে বাধা দিল।—"ওসব কথায় আমি থাকিনে! যত অনাছিষ্টির খবর কি তোমার কাছে বাছা!" কাজেই বুড়ী অপ্রতিভ হইয়া নতমুখে নখে মাটী খুঁড়িতে লাগিল।

এমন সময়ে দুঃখীরামের ডাক পড়িল। নায়েবি গলাবাজীর সপ্তমে সে ডাক, বাড়ীর প্রতিধ্বনি জাগাইয়া তুলিল। "এজ্ঞে"! বলিয়া দুঃখী নিজের তরফে যে জবাব দিল, তাহার মাত্রাও ন্যূন নহে। নয়নের মাসী অপ্রতিভ হইয়া গিয়াছিল, এই গর্জ্জনের পর গর্জ্জনে বিদ্যুৎস্পৃষ্টার ন্যায় তাহারও যেন চমক ভাঙ্গিল।

চুপ করিয়া থাকা নয়নের মাসীর কর্ম্ম নহে। তাহার বয়সের সে ধর্ম্মও নহে। সে যেন আপন মনে বলিতে লাগিল—"আহা দেখ্‌লে চোক জুড়োয়! এই সেদিন মোক্ষর মার বিয়ে হলো—সে যেন কাল, এর মধ্যে মেয়েরও ছেলে হবার বয়স হলো!"

মোক্ষদা আবার একটু রঙ্গপ্রিয়। কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধার ন্যায় তাহার দিকে চাহিল। বুড়ী ভাবিল, এইবার মেয়েটার মন ফিরেছে! সে আবার বলিতে লাগিল,—

"সেদিনের কথা বাছা মোক্ষ! তোমার মা তখন ন'বছরের ফুট ফুটে মেয়েটি, আমি কোলে করে বাড়ী বাড়ী বউ দেখিয়ে এনেচি। সেই হতেই ত আমার সঙ্গে অত ভাব! এক বয়সী কি না! তা সে সব কথা এখন স্বপন বলে মনে হয়। এই যে বাছা তুমি এখানে বসে বসে মাছ কুট্‌চো, এইখেনে একটা তাল গাছ ছিলো, কত তালই তাতে ফল্‌তো। ভাদ্দর মাসের রাত্তিরে ভিজে ভিজে তোমার পিসিতে আর আমাতে কত তালই কুড়িয়েচি। বল্লে না পিত্তয় যাবে মা, এক দিন একটা বেহ্মদত্তি আমাদের দুজনকে তাড়া করেছেলো, খড়ম পায়ে, গলায় পৈতার গোছ—তোমার বাপ তখন ছেলে মানুষ।—কত-বার কোলে করেচি!"

মোক্ষদার হাসি চাপিয়া রাখা ভার হইল। এমন সময়ে মা আসিলেন, এবং নয়নের মাসীর সঙ্গে চোখোচোখি হইলে এক মুখ হাসিলেন। মোক্ষদা এই সুযোগে হাসিয়া কুটি কুটি হইল।

কাহারও অল্পবিস্তর বুঝিতে বাকী রহিল না, কেন মোক্ষদা হাসিতেছে।

নয়নের মাসী আবার অপ্রতিভ হইল। দেখিয়া মা বলিলেন, "কি ছাই হাঁসিস্! এখনও মাছ কোটা হোল না। জামাইয়ের খবর না পেয়ে আমি ভেবে মর্‌চি, তোর বাপু কেবল হাঁসি।" জামাইয়ের কথা তুলিয়া মা কন্যাকে অবনত-মুখী করিলেন, নইলে মায়ে ঝিয়ে একবার বোঝাপড়ার সম্ভাবনা ছিল।

অতঃপর গৃহিণী নয়নের মাসীকে বলিলেন—"আর শুনেচো গো, আমা-দের এঁরা পুরনকে একবার দেখতে গিয়ে অপমান হয়ে এয়েচেন! আমার ভজুনি পুজুনি বেয়ান অপমানের আর কিছু বাকী রাখেন নি! তা ওঁকে হলে আমাকে হলো কি না তুমিই বলত নয়নের মাসী!" নয়নের মাসী বিস্ময়ে হাঁ করিয়া ভ্রূবিস্তার করিলেন।

তার পর বলা বাহুল্য, জগদ্ধাত্রী একে একে সকল পেটের কথাই নয়নের মাসীর কাছে খুলিলেন—অবশ্য মেয়ের সামনে নহে। চারি আনা পয়সার উপলক্ষে নয়নের মাসীর আগমন হইয়াছিল, মায় সিধা এবং মনের কথা তাহার সাড়ে আঠার আনা হইল। অতটা হজম করা তাহার বয়সের কর্ম্ম নহে। অতএব পথে যাইতে নয়নের মাসী অনেকটা খোলসা হইয়া গেল। পদ্ধতিটা কিরূপ, পরে দেখা যাইবে।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

পুরনের শ্বশুরবাড়ী যে দিকে, তাহার ঠিক বিপরীত দিকে নয়নের মাসীর ঘর। কিন্তু ঘোষ পত্নীর কাছে ক্ষুধার আতিশয্য এবং বরাবর গৃহ গমনের প্রয়ো-জনীয়তা প্রতিপন্ন করিয়া থাকিলেও, বৃদ্ধার পদযুগল তাহাকে বোসেদের বাড়ীর পানে লইয়া চলিল। পথে কলহের একটা মৃদুমধুর সৌরভ তাহার নাসারন্ধ্র পরিতৃপ্ত করিতেছিল, অতএব রাস্তার লোকে ঘোষ ও বোসেদের ঝগড়ার কথা লইয়া কানাকানি করিতেছে না দেখিয়া, নয়নের মাসীর বিস্ময়ের সীমা ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে সৌরভীর মার সঙ্গে তাহার দেখা হইল। সৌর-ভীর মা নয়নের মাসীর চেয়ে বয়সে ছোট, এবং দ্বিতীয় দরজার খবরবাহিকা, কাজেই তাহার ঘ্রাণশক্তি কিঞ্চিৎ প্রখরতর। সে তাহার প্রথম দরজার "অপ-

সরে”র প্রতি অঙ্গ দোলনে, প্রতি পদক্ষেপে লোমহর্ষণ কিছু ব্যাপারের আভাস পাইতেছিল।

সৌরভীর মাকে দূর হইতে দেখিয়াই নয়নের মাসীর জিভ্ সামলান দায় হইয়া উঠিয়াছিল, সে কাছে আসিলে তাহাকে শুনাইয়া যেন আপন মনে বলিতে লাগিল—“যাদের ভাল বাসি, তারা যে দুখু পায়, সে আমাদেরি কপাল। কে জান্‌তো বল, বিয়ের আট দিন যেতে না যেতে এমনটি ঘট্‌বে।”

সৌরভীর মা আঁচিয়া লইল, ব্যাপার খানা কি। তথাপি আগ্রহে একটু একটু ভীতিবিহ্বল স্বরে সুধাইল, ব্যাপার কি?

বুড়ী। কিছুই তোরা শুনিস্‌নি গো—গাঁ টি টি হয়ে গেল যে! নায়েব মোশাইয়ের সঙ্গে বোসেদের বউমার ঝকড়া। নূতন কুটুমে কুটুমে এরি ভেতর চোকোচোকি রইল না। আহা! ভাবলে কান্না পায়।

বলিতে বলিতে স্বর কিঞ্চিৎ হ্রস্ব করিয়া, এ দিক ও দিক চাহিয়া নয়নের মাসী অতি বিশ্বস্তভাবে তাহার শ্রোত্রীকে জানাইয়া দিলেন যে, দৈবজ্ঞ বলিয়াছে, কনেটি বড় অলক্ষণযুক্তা, দুইটি সংসার ছারখার করিতে জন্মেছে।

সৌরভীর মা অবাক্ হইয়া দণ্ডকাল হাঁ করিয়া বৃদ্ধার দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর দুইজনে বোসেদের বাড়ীর বউমার সম্বন্ধে কিছু কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিয়া, আপন আপন পথে চলিয়া গেল। তাহার ফলে ঘোষ মহাশয়ের শয়নকক্ষে স্ত্রী-পুরুষে যে পরামর্শ হইয়াছিল, শাখা পল্লবিত অবস্থায় তাহা স্নানের ঘাটে ফুলকুমারীর মার কাণে উঠিল। ভবসুন্দরী নিস্তারিণীকে সম্বোধন করিয়া সুধাইলেন,

“বউ সত্যি কথা কি?”

নি। কি সত্যি ঠাকুরঝি?

ভব। এই আজ্ সকাল বেলার কথাটা। তোমার সঙ্গে পুরনের মা বাড়ী বয়ে এসে নাকি ঝকড়া করে গেছে, আর ছেলেবউ নিতে নাকি বেহারা পাল্কী পাঠিয়েছে?

নিস্তারিণী অবিশ্বাসের ক্ষীণ হাসি হাসিলেন। ভবসুন্দরীকে অপ্রতিভ হইতে দেখিয়া সৌরভীর মা বলিল, “কেন বউমা, কিছুই কি তুমি জান না? দুঃখীরাম বেহারা পাল্কী নিয়ে যে বর কনে আনতে গেল, এই মাত্তর আমি দেখে আস্‌ছি।”

আর অবিশ্বাসের স্থান রহিল না। নিস্তারিণীকে নীরব দেখিয়া, সৌরভীর

মা পথে নয়নের মাসীর সঙ্গে তার যে কথা হইয়াছিল, কিছু ছাঁটিয়া ছুটিয়া এবং আবশ্যকমত দুই এক স্থলে বাড়াইয়া, সেই স্নানযাত্রীসমবেত কুলকামিনী-মহলে তাহাই ব্যক্ত করিল। স্থির ধীরভাবে নিস্তারিণী তাহা শুনিলেন। রোজ যেমন স্নান করেন, আজও তেমনি স্নান করিলেন—কোনও চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না। তখন গৃহে ফিরিলেন।

গৃহে আসিয়া দেখিলেন, কথা সত্য। বহির্ব্বাটীতে দুঃখীরাম পাল্কী বেহারা লইয়া হাজির। মনিবের আজ্ঞা ওবেলা, কিন্তু ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনা তাহার অভ্যাস। কাজেই তাহার আর দেরি সহে নাই। এ দিকে সদুঃখীরাম পাল্কীর আগমন বার্ত্তা পাইয়া পুরন্দর পূর্ব্বেই অপথে পিতৃ-গৃহাভিমুখে ছুটিয়া পলাইয়াছিল। নিস্তারিণী সকল শুনিলেন, কাপড় ছাড়িয়া দুঃখীরামকে ডাকাইলেন। গৃহের ভিতর হইতে স্থির অবিকম্পিত কণ্ঠে বলি-লেন,—"তোমার মনিবকে বলো, মেয়ে আমি বিক্রয় করি নি! জামাতা উপযুক্ত হয়ে যদি তাকে কখন স্মরণ করে, তবে পাঠাব!"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ফুলের মা ধীরে ধীরে আহ্নিকের ঘরে প্রবেশ করিলেন! হৃদয়ে ঝটিকা বহিতেছিল। তখন সাধ্বী স্বামীপাদুকা হৃদয়ে ধারণ করিয়া নীরবে অশ্রুসিক্ত করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

দুঃখীরাম বাটীর মধ্যে মাথা হেঁট করিয়া মা ঠাকুরাণীর কথা শুনিয়া আসিল বটে, কিন্তু বহির্ব্বাটীতে আসিয়া তাহার সে ভাব আর রহিল না। দুই খানা পাল্কীই শূন্য ফেরৎ যাইবে শুনিয়া বাহকদের কেহ কেহ হাসিল, ফন্থু সেখ কাছে দাঁড়াইয়া, সেও দন্তপংক্তি ঈষৎ বিকাশিত না করিয়া থাকিতে পারিল না। ইহাতে দুঃখীরামের ভারি অপমান বোধ হইল। সে গর্জ্জন করিয়া মহা আস্ফালন সহকারে ফন্থুর প্রতি ধাবিত হইল; কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা বাধা দেওয়াতে তাহার হাতের লাঠি হাতেই রহিয়া গেল। তখন ফন্থুর দাড়ি ও খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে অনেক কুকথা কীর্ত্তন করিতে করিতে, মায়ের মহাশয়ের

প্রিয় ভৃত্য দ্রুত পদে মনিব-গৃহে ফিরিয়া চলিল। পথে রাগের মাথায় সে নাকি বলিয়াছিল, "বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়ে ছাড়বো, তবে সিন্ আগুরির ছেলে," সে কথা তখনই নিস্তারিণীর কানে উঠিল।

ডাকাত পড়ানর ভয় প্রদর্শন সত্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু দুঃখীরাম যে পথে যাহার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, তাহাকেই বলিয়াছিল যে, "পরগোণা হলে একবার দেখতুন্" তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এ দিকে পুরন্দর অপথে লুকাইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল, এবং অন্যের অলক্ষ্যে দিদির ঘরে গিয়া তাহার বিছানায় মুখ লুকাইয়া শয়ন করিল। মোক্ষদা মাছ ধুইয়া আসিয়া স্নানের উদ্যোগ করিতেছিল। চুল খুলিবার উদ্দেশে গৃহে প্রবেশ করিয়াই ভ্রাতাকে সে ভাবে দেখিয়া সে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার বিস্ময়ের সীমা ছিল না। তখন "কি হয়েছে পুরু, কি হয়েছে ভাই" বলিতে বলিতে বোন্ বিছানায় গিয়া বসিল, এবং ভাইয়ের মাথা কোলে তুলিয়া লইল।

মোক্ষদা দেখিল, পুরন কাঁদিতেছে। তখন আঁচল দিয়া চোক মুছাইয়া দিল। দেখিল, ভাইয়ের কাপড়ে কর্দ্দমের ছিটা এবং চোর কাঁচকি, পায়ে তিন চার জায়গায় কাঁটার ছড়। নয়নের মাসীর সঙ্গে মার যে ভাবে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহাতে মোক্ষদা বুঝিয়াছিল, আজ একটা কিছু ঘটিবে। অতএব মহা উদ্বিগ্ন হইয়া পুরনকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিল।

পুরন্দর অনেকক্ষণ উত্তর দিতে পারিল না। শেষে বলিল,—"কেন, তুই জানিস্ নে, দুখে দাদা পাল্কী বেহারা নিয়ে আন্‌তে গিয়াছিলো!"

মো। পাল্কী বেহারা নিয়ে এরি ভেতর আন্‌তে গিয়াছিলো! কাকে-রে? তোকে না বউকে?

পু। দুজনকেই? আমার ভারি লজ্জা হলো, তাই পালিয়ে এয়েচি।"

বড় দুঃখেও দিদি হাসিল—"তা পালিয়ে এলি কেন, ছি, দেখতো কত কাঁটার ছড় লেগেচে। লোকে নিন্দে করবে যে!" বলিয়া দিদি ভাইয়ের পায় হাত বুলাইয়া দিল।

পুরন বিজ্ঞ মানুষের মত দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "কত নিন্দে করচে দিদি দুধারে রাস্তার লোকে! আমার ইচ্ছে করে কোথাও পালিয়ে যাই, এবাড়ে আর থাকব না।"

তখন দিদির জিজ্ঞাসা মতে পুরন তাহাকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া প্রান্তে পিতা

শাশুড়ীকে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, একটি একটি করিয়া সকলই বলিল। ভাই বোন উভয়েরই মতিগতি অনেকটা পিতৃবংশ ছাড়া এবং মাতৃবংশানুগত। তুচ্ছ অর্থের জন্য ছল ধরিয়া পিতা যে নূতন কুটুম্বের সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া, উভয়েই হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পাইল। মোক্ষদা ছল ছল নেত্রে ভ্রাতার ম্রিয়মাণ মুখচ্ছবি দেখিতেছিল। এমন সময়ে মা আসিলেন।

ভারতচন্দ্রের বৈকালিক নিদ্রামগ্ন রাজা বীরসিংহের রাণী ঠাকুরাণীর মত তখন জগদ্ধাত্রীর মূর্ত্তি খানি, তার উপর এইমাত্র স্নান করিয়া আসিয়া তিনি চূড়ার আকারে কেশরাশি মাথার উপরে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। এইমাত্র নয়নের মাসীর নয়ন মাতৃস্বসার কাছ হইতে সন্দেশ বহন করিয়া আনিয়াছেন যে, দুঃখীরামকে প্রহার ও অপমান করিয়া বোসেদের বউমা পাল্কী বেহারা ফিরাইয়া দিয়াছে। তাহার পর বহির্ব্বাটী হইতে কে এক জন আসিয়া বলিয়া গেল, শূন্য পাল্কী লইয়া দুঃখীরাম ফিরিয়া আসিল, তারা বউ পাঠায় নি, ছেলে হাঁটিয়া পলাইয়া আসিয়াছে। মা বাড়ীর সকল ঘর খুঁজিয়া হয়রাণ হইলেন, কোথাও পুরনের দেখা পাইলেন না। বাকী এক মোক্ষদার ঘর, কিন্তু সে স্নানে গিয়াছে জানিতেন। অতএব তাহার দ্বার খোলা দেখিয়া, ক্রোধ ও উদ্বেগের উপর কর্ত্রীঠাকুরাণী একটু একটু কৌতূহলপরবশ হইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। পুরন্দরকে দেখিয়া তিনি বাম হস্তে বাম গণ্ড রাখিয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইলেন।

মার সে মূর্ত্তি দেখিয়া কষ্টে মোক্ষ হাস্য সংবরণ করিল! সেও নীরবে নিতান্ত ভাল মানুষের মত মার আচরণ লক্ষ্য করিতে লাগিল।

বিস্ময়বিহ্বলতার প্রথম বেগ প্রশমিত হইলে, মাতা প্রায় সেই ভাবে দক্ষিণে হেলিলেন। পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "হাঁরা সেই মন্তুরি তন্তুরি শতেকখোয়ারীই না হয় ক্ষেপেচে, তুইওকি আবাগীর বেটিকে বিয়ে করে—"

মোক্ষদা দেখিল, মা বড় বাড়াবাড়ি করিতেছে। কাজেই কথা শেষ হইতে না হইতে বলিল, "ছি মা! গাল দিয়ে অলক্ষণ করো না। আসল কথাটা কি, তা হয় ত তুমি জান না। দোষ সব বাবার, মাহইমার নয়।"

যত ভয় পুরনের পিতাকে, মাতাকে তাহার কিছুই নহে। মাকে বাক্যবাণ উদ্গীর্ণ করিতে দেখিয়া পুরন উঠিয়া বসিয়াছিল। [illegible] এবং

পুত্রের বিষণ্ণভাব দেখিয়া, জগদ্ধাত্রী থামিয়া গেলেন। দিদি বলিল, "বল্ ত পুরু সব কথা মাকে।"

পুরু দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উপেক্ষার ভাবে বলিল—"তুই-ই বল, সব ত শুনেছিস্।"

তখন মোক্ষদা খুঁটিয়া খুঁটিয়া সব কথাগুলি ভাইয়ের কাছে যেমন শুনিয়াছিল, মাকে শুনাইল। কিন্তু মা দমিবার পাত্রী নহেন। মনে মনে স্বামীর অন্যায় স্বীকার করিলেও, তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন না যে, বেহাইনের পাল্কী বেহারা ফেরৎ পাঠাইবার কি অধিকার? "যে মেয়ে দিয়েচে, তার আবার তেজ কি?" তাঁহার মনে হইল না, তাঁহারও কন্যা আছে।

মোক্ষদা স্থিরভাবে বলিল, "মা মেয়ে সবারই আছে। আমার শ্বশুরবাড়ীর সামান্যি এ কথা ও কথা শুনে তুমি জ্বলে উঠ কেন? তাও দেখেচি বাছা! তোমার বড়মানুষ বাবা ঠাক্‌মার কত খোয়ার কর্‌তেন, তা তোমার নয়নের মাসীর কাছেই শুনেচি। আমার কথা শোন। মাহুইমার সঙ্গে ঝক্‌ড়া করো না। বাবাকে বলে, এই বেলা মিটিয়ে ফেল। বল ত আমি ও বেলা বউকে দেখ্‌বার ছল করে মাহুইমার হাতে পায়ে ধরে আসি।"

কন্যার এতটা গৃহিণীপনা মাতার অসহ্য হইল। তাঁহার জানা ছিল, কথায় তিনি মেয়েকে পারিয়া উঠিবেন না। অতএব তিনি মুখ বাঁকাইয়া উঠিলেন। তখন আর ভৈরবী মূর্ত্তি ছিল না। পুত্র কন্যা উভয়েই বুঝিল, মার মন নরম হইয়াছে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

শাখা পল্লবিত হইয়া নূতন কুটুম্বদের নূতনতর কলহের বৃত্তান্ত অর্দ্ধ প্রহর মধ্যে হরিশপুরের ঘরে ঘরে প্রচার হইয়া গেল। তাহার ফলে, সেদিনকার মত সেই ক্ষুদ্র পল্লীখানিতে একটা জীবন্ত ভাব জাগিয়া উঠিল। তোমরা সব পাড়াগাঁয়ের অনেক নিন্দা করিয়া থাক, কিন্তু কুৎসা দলাদলি, কলহ কচ্‌কচি আছে বলিয়াই সে গরিব অসাড় পল্লীগ্রামের নাড়ী কখন কখন পাওয়া যায়, এ খবর বোধ করি রাখ না!

কন্যা পুত্রের কাছে কলহের বিবরণ যেরূপ শুনিলেন, তাহাতে জগদ্ধাত্রীর মন একটু নরম হইল বটে, কিন্তু বেহাইন যে বড় অহঙ্কারী, মেয়ে দিয়েও যে তাঁহার কাছে মাথা হেঁট করে না, এটা অসহ্য। কাজেই স্বামীর স্বাভাবিক ধনলোভের প্রতি তাঁহার বরাবর যে বিতৃষ্ণা ছিল, এ ঘটনায় তাহার তীব্রতা কিছু বাড়িল না। বরং যে কোন ওছিলায় হউক, "ভজুনি পুজুনি" বেহাইনকে যে জব্দ করিবার সুযোগ হইয়াছে, ইহাতে তিনি ঈর্ষ্যাসুলভ একটা আনন্দ লাভ করিলেন। সাক্ষাৎ হইলে স্বামীকে বড় কিছু বলিলেন না, কিন্তু পুরন যে প্রাতের ঘটনায় দুঃখিত হইয়াছে, সে কথাটা বলিতে ভুলিলেন না। শুনিয়া নায়েব মহাশয় একটু কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা মতলব তাঁহার উর্ব্বর মস্তিস্কে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। বলিলেন, "বটে, এরি ভেতর শ্বশুরবাড়ীর উপর এত টান! তুমি যে বল, মন্তরি তন্তরি মাগীটে, তা সত্যি। ছেলেটা এখানে থাক্‌লে যাদু করে ফেল্‌বে দেখ্‌চি। তা হলেই আমাদের সুখ সোয়াস্তির দফা রফা আর কি? বুঝেছ?"

অর্দ্ধভাগিনী হইলেও জগদ্ধাত্রী স্বামীর মতলব এবং "সলার" সকল ভাগ আয়ত্ত করিতে পারিতেন না, এখনও ভাল পারিলেন না। কর্ত্তা গৃহিণীর নথভূষিত বিস্মিত বদনচন্দ্রের শোভা দেখিতে দেখিতে বলিয়া চলিলেন, "বুঝ্‌চো না? এর পরে যাদু করে ঐ ছেলেকে পাগল করে দেবে, তখন বউই হবে সর্ব্বস্ব। আমাদিকে আর গেরাহ্যিই কর্‌বে না। এখন থেকে তারও উপায় কর্‌তে হবে।"

এতক্ষণে কথাটা পরিষ্কার হইল। জগদ্ধাত্রী উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, "ঠিক কথাই তুমি বলেচো। কি উপায় কর্‌বো বল? তখুনি বলেছিলাম, ভজুনি পুজোনি বেয়ান করো না। হায় হায় আমার অনেক দুঃখের ছেলে, আমার একটি ছেলে! সেই ছেলে আমার পাগল করে দেবে? এখুনি গিয়ে আমি মাগীর পায়ে মাথা কুটে আস্‌বো।"

এ সব বিষয়ে জগদ্ধাত্রীর যে কথা সেই কাজ, স্বামী তাহা জানিতেন, সুতরাং সময় মত রথ রশ্মি সংযত করিতে আর দেরি মাত্র করিলেন না। "পাগল আর কি! সত্যিই কি ছেলেকে পাগল করে দেবে গা? তারও ত সেই সবে একটি মেয়ে! পাগল করে দেবে না, তবে মন্তর তন্তর করে ছেলেটাকে বশ করে নেবে, সেই আমার ভাবনা। তাই বল্‌চি, এখন থেকে একটা উপায় কর্‌তে হবে।"

গৃহিণী কিন্তু তত সহজে বাগ মানিলেন না,—"হাঁ, ডাইনির আবার মেয়ে জামাইয়ের উপর মায়া! পাগল করেই দেবে—হায় হায় কি শত্রুতা তোমার সঙ্গে ছিলো, এমন বিয়ে কেন দিয়ে দিলে? পাগলও কর্‌বে, বশও কর্‌বে, তোমায় টাকা দিলেই তো সব চুকে গেল গো! যেতে আমার দুঃখিনীর ধনই যাবে! বাবা গো, এই জন্যে কি আমার বিয়ে দিয়েছিলে—"

এই বলিয়া জগদ্ধাত্রী অঞ্চলে মুখ ঢাকিলেন এবং স্বামীর পায়ে ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া তিন বার মাথা কুটিলেন। মহেশ্বর মানিলেন, এ ক্ষেত্রে তাঁহার সারথ্য নিষ্ফল হইয়াছে।

সংক্ষেপে, শোক এবং অভিমানাধ্যায় সমাপ্ত করিয়া, গৃহিণী প্রস্তাব করিলেন, পুরনের কল্যাণার্থ "দৈবজ্ঞি" ডাকান হউক, একটা যাগ করিতে হবে। নায়েব মহাশয় নীরবে "তথাস্তু" করিলেন, ব্যয়াধিক্যের ওজর করিলে হিতে বিপরীত ঘটিবে জানিয়াই তাহা করিলেন না। তবে আসল কথাটা এই সুযোগে আবার তুলিলেন।—"তা তোমার যা ভাল বোধ হয়, তাই হোক্; কিন্তু আর একটা উপায় না করলে চল্‌বে না। পুরোকে এখানে রাখা হবে না, আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই, কি বল?"

"আমি কি নিয়ে থাক্‌বো?" বলিয়া গৃহিণী রোদনোন্মুখী হইলেন।

ঘোষ মহাশয় অতি দীন ভাবে আর্‌জী পেস্ করিলেন। "তা সত্যি বটে, কিন্তু ছেলে বড় হতে চল্‌লো, কায়েতের ছেলে, চাকরী বাক্‌রী না কর্‌লে কি চল্‌বে? দিন কতক মৌলবীর কাছে তো পড়া চাই, নইলে তালিম হবে কেমন করে?"

গৃ। তা বেশ, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল। মেয়ে শ্বশুর বাড়ী থাক্।

নায়েব মহাশয় নীরবে উঠিলেন। গৃহিণীর প্রস্তাবটা মনের মত হয় নাই—"পথে নারী বিবর্জ্জিতা" তখনকার দিনে বেদবাক্য ছিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

"মন্ত্রগুপ্তি" শিখাইবার জন্য এই বাঙ্গলা দেশে অনেক বার অনেক চেষ্টা হইয়া গিয়াছে, শাক্ত- বৈষ্ণব কেহই তাহাতে কসুর করেন নাই, কেন না, তাহার সাধনায় উভয় সম্প্রদায়েরই সিদ্ধি নির্ভর করিত, কিন্তু ফল কিছু হয় নাই। ঠাকুরদাদা মহাশয়দিগকে জবাবদিহি হইতে বঞ্চিত করা এ পক্ষের অভিপ্রেত নহে, কিন্তু ঠাকুরাণীদিদিরা বোধ করি ইহার জন্য বেশী পরিমাণে দায়ী। "ক্লীং" বা "হ্রীং" তাঁহারা দিব্য হজম করিয়া ফেলিতেন বটে, কিন্তু তার উপর আর দুটো কথার সংযোগ হইলেই, তাঁহাদের রসনার অগ্নিপরীক্ষা উপস্থিত। এখনকার শ্রীমতীগণ রাগ করিবেন না, কিন্তু জগদ্ধাত্রী দাসীতে আর তাঁর স্বামীতে শয়নকক্ষে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, দেখিতে দেখিতে তাহা রাষ্ট্র হইয়া গেল, সেটা যে প্রথমার কল্যাণে, ইহা সত্যের খাতিরে গরিব গ্রন্থকারকে বলিতেই হইতেছে।

অপরাহ্নে নিস্তারিণী ফুলকুমারীর চুল বাঁধিয়া দিতেছিলেন, কাছে বসিয়া কালী গল্প করিতেছিল। বলিতেছিল "সইমা পুরোদাদা তার বাপের সঙ্গে যাবে শুনেচো? হা দেখ সইমা, আমি ভাবি পুরোদাদাকে "সয়া" বল্‌বো, দাদা আর বল্‌বো না, কিন্তু ভারি লজ্জা করে। তা যাবার আগে পুরো দাদা তোমার সঙ্গে একবার দেখা কর্‌বে না?"

নিস্তারিণী নীরবে ঘাড় নাড়িলেন। ফুল লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া নখে মাটী খুঁড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং সইয়ের উপর রাগিতেছিল। সইয়ের সে ভাব দেখিয়া কালীর ভারি হাসি পাইতেছিল, কিন্তু সইমার সাম্‌নে সে অবস্থায় হাসি সামলাইতেই হইবে! বালিকা পলকে আত্মদমন করিয়া আবার বলিল, "ঝকড়ার জন্যে আস্‌বে না বল্‌চো? তা তুমি ত ঝকড়া করনি বাছা! পুরো দাদা যদি বাপ মার ভয়ে না আসে, তা আমি তাকে লুকিয়ে আন্‌তে বলবো। কেউ জান্‌তে পার্‌বে না।"

এবার নিস্তারিণী কথা কহিলেন। "তাতে কাজ নেই বাছা, ছেলেকে বাপ মার অবাধ্য হতে শেখাতে নেই। বেঁচে থাক্, চিরদিন কিছু ঝকড়া থাক্‌বে না।

কথাটা কালীর মনের মত হয় নাই, কিন্তু সইমার বিষণ্ণ মুখচ্ছবি দেখিয়া আর কিছু বলিতে তার সাহস হইল না। বরং যাহা বলিয়াছে, তাতেই হয় ত তিনি মন বেদনা পাইয়াছেন ভাবিয়া, সরলা বালিকা কিছু ক্ষুণ্ণ হইল। তখন সইমার মুখে একবার হাসি দেখিবার জন্য তার ক্ষুদ্র প্রাণটুকু ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অমনি পিতা মাতার একটা কথা তার মনে পড়িয়া গেল। উৎসাহে বলিল, "সইমা, সইকে সেদিন যেতে দাওনি শুনে, বাবার মুখে তোমার সুখ্যাত ধরে না।" কাজেই সইমাকে হাসিতে হইল, কালীও বাঁচিল।

চুল বাঁধা শেষ হইলে দুই সইয়ে কাপড় কাচিতে চলিল। চলনে ফেরনে দুজনের বরাবর পার্থক্য, তার উপর বিবাহের পর ফুল আরও মন্থর গতি হইয়াছিল, শ্বশুরবাড়ীর কুকুরটা বিড়ালটার জন্যও তার সশঙ্ক সচকিত দৃষ্টি! কিন্তু কালী ঠাকুরাণী রণরঙ্গে ধাইতেছিলেন। কোথাও ছাগশিশু মাতার সঙ্গে নিশ্চিন্ত মনে তৃণভোজনে রত, দৌড়িয়া গিয়া তাহাদিগকে তাড়া করিতেছিলেন; কোথাও পথের ধারে ছোট ছোট পাখীরা লেজ নাচাইয়া খেলিতেছিল, তাহাদের পাছে পাছে ছুটিয়া ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে উড়াইয়া দিয়া তবে ছাড়িতে ছিলেন। কাজেই ফুল পিছাইয়া পড়িতেছিল, এবং সইকে মৃদু অনুযোগ করিতেছিল। সই সেটা কিন্তু একটা নূতন রকমের খেলা ছাড়া আর কিছু ভাবিতেছিলেন না, এবং খেলাটাকে আরও আমোদ-জনক করিয়া তুলিবার জন্য ছুটিতে ছুটিতে এক এক বার থামিয়া ফুলকে হাত-ছানি দিয়া ডাকিতেছিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিতেছিলেন "শীগ্‌গির্ আয় সই!" ইহাতে ফুল আরও প্রমাদ গণিতেছিল, এবং মনে করিতেছিল, আর কখ্‌খনই সইয়ের সঙ্গে কাপড় কাচ্‌তে আস্‌বে না।

এম্‌নি করিয়া দুজনে ক্রমে তালপুকুরে উপস্থিত হইল। গা ধুইবার জন্য সই দুটির নির্দ্দিষ্ট কোনও পুষ্করিণী ছিল না, এবং আমরা খবর রাখি, এই অনিশ্চয়তার কারণ,—স্বয়ং কালী ঠাকুরাণী। একটু নির্জ্জন নহিলে তাঁহার সাঁতার দিবার তেমন সুবিধা হইত না, অতএব সে ইচ্ছা যে দিন তাঁর হইত, সেদিন সইকে নানা ছলে ভুলাইয়া, আপনার মনোমত স্থানে লইয়া যাইতেন। এ সব ফুলের সহিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আজ যে সাঁতার ছাড়া আর একটা দুষ্টুমি সইকে আশ্রয় করিয়াছিল, তাহার ছন্দাংশও বুঝিতে তাহার ক্ষীণ মনটুকু সক্ষম হয় নাই। হইলে, "ঠাকুরের দিব্বি" ফুল কোনও মতে কাপড় কাচিতে আসিত না।

ঘাটে আসিয়া কালী মহা ভাল মানুষটি হইয়া দাঁড়াইল এবং দুকথায় সইকে হাসাইয়া তাহার রাগ ভাল করিয়া দিল। তারপর সইমার সঙ্গে প্রথমে যে কথা হইতেছিল, ফুলের সঙ্গে চুপি চুপি আবার সেই কথাই আরম্ভ করিয়া দিল। বলিল "সই বরের সঙ্গে একবার দেখা কর্‌বি লো!"

শুনিয়া ফুল ভাবিল, বর বুঝি সেখানে কোথাও লুকাইয়া আছে। অতএব তাহার সর্ব্বাঙ্গ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল, কাপড় কাচিবার জন্য মাথার কাপড় কোমরে নামিয়াছিল, আবার হঠাৎ স্বস্থানে তাহার উদয় হইল। সইয়ের এই ভাব এবং যুগপৎ সচকিত দৃষ্টি ও বারম্বার জিহ্বা দংশন দেখিয়া কালী উচ্চ হাসির তরঙ্গ খুলিয়া দিল।

এমন সময়ে কেহ ধীরে ধীরে বটগাছ হইতে নামিয়া তাহাদের দিকে আসিতে লাগিল। উভয়েই মুহূর্ত্তে চিনিল, পুরন্দর! প্রথমে উভয়েই সমান বিস্মিত হইয়াছিল, কেননা কালীও এ ভাবে এ সাক্ষাতের আশা করে নাই। দৈবাৎ যদি সে পথে পুরন্দর আসিয়া পড়ে; এইরূপ বালিকাসুলভ কৌতূহলের বশে সে সইকে তালপুকুরের দিকে আনিয়াছিল। কাজেই উভয়ে বিস্মিত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। পুরন্দর ও বালিকাদ্বয়কে সে অবস্থায় দেখিয়া সশঙ্কিত হইল, আর অগ্রসর হইল না।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

"পূর্ব্ব" এবং "পরকাল" কথা দুটোকে অভিধান ছাড়া করিতে পারিলে যাঁরা বাঁচেন, তাঁরা যদি একবার ভাবিয়া দেখেন, আমরা সকলেই বাস্তবিক পিতায় ছিলাম এবং পুত্রে আছি, তাহা হইলে বোধ করি অনেক উৎপাতের শান্তি হয়। রক্তের টান বলিয়া যে একটা কথা আছে, সেটা নিতান্ত কথার কথা নহে। মনুষ্য প্রকৃতির নগ্ন ছবি আঁকিতে গিয়া যে জ্ঞানী বলিয়াছিলেন, এ সংসারে মানুষ কেবলমাত্র আত্মজকেই আপনার চেয়ে বড় হইতে দেখিলে সর্ব্বান্তঃকরণে সুখী হয়, তিনি বুঝি অজ্ঞাতে মহান্ সত্যের ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। এই যে ব্যক্তি গত সুখ, কাল ধর্ম্মে নির্ব্বিশেষে ইহা "মনুষ্যত্ব" গত হইবে না, কে বলিতে পারে?

পুরন্দরের এখন আর সে চঞ্চল বালকতা নাই। দেখিতে দেখিতে হৃদয়ে তাহার অকাল গাম্ভীর্য্যের ছায়া পড়িয়া গেল। পিতৃচরিত্রের কঠোর স্বার্থপরতা পূর্ব্বে কখন সে অনুভব করে নাই, জীবনের প্রভাতে সরল উদার স্বচ্ছ-হৃদয়দর্পণের সম্মুখে কেন অকস্মাৎ বিভীষিকার চিত্র প্রতিভাত হইল? তার পর সঙ্গে সঙ্গে পুরন্দর শুনিল, পিতার সঙ্গে তাহাকে যাইতে হইবে। সেইদিন হইতে পুরন্দর আগেকার ছুটাছুটি খেলা ধূলো সব ছাড়িয়া দিল। সমবয়স্ক সখাদের সঙ্গে মিলিত মিশিত বটে, কিন্তু পূর্ব্ববৎ প্রাণে প্রাণে নহে। গুরু মহাশয় রামধন ভট্টাচার্য্য বিবাহের উপলক্ষে পর্য্যাপ্ত বিদায় পাইয়াছিলেন, এবং তাঁহার "সিধা" ও "তামাকে"র বরাদ্দ অতঃপর বেশী হইবে এরূপ ভরসাও করিতেছিলেন, কাজেই পুরন্দরের বিষণ্ণ গম্ভীর মূর্ত্তি হঠাৎ একদিন তাঁহার চক্ষে পড়িয়া গেল। তিনি একমুখ হাসিয়া হাঁকিলেন "পুরোরে, বিয়ে করে জ্যেঠা মশায় হলি নাকি?"

পাঠশালার শত চক্ষু পুরনের হেঁট মুখ খানির উপর পড়িল। ছেলেদের ভিতর একটা অস্ফুট কাণাকাণির গোল উঠিল। হাট জমিয়া যায় দেখিয়া গুরু মহাশয় বেত্রাস্ফালন করিলেন।

মধো সুযোগ পাইয়া বলিল "বিয়ের জন্য নয় মশায়, আজ কদিনই পুরন অমন শুক্‌নো শুক্‌নো হয়েচে। বাপের সঙ্গে পরগোণায় যাবে পারসী পড়্‌তে, তাই জন্যে।

ভোলা বলিল, "তাই জন্যে আজ ওদের বাড়ী সত্যিনারাণের সিন্নি হবে মশায়।"

গুরুমহাশয় পুরন্দরের স্থানান্তর গমনের প্রস্তাব শুনিয়া কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইলেন। কোথায় বরাদ্দ বেশীর কথা, তা নয় একেবারে শূন্য ভাগের ব্যবস্থা! তিনি বাস্তবিক দমিয়া গেলেন, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিলেন, "কেনরে পুরো, এতই কি পণ্ডিত হয়ে উঠ্‌লি যে, এখানে আর পড়া হয় না? কে জানে বাপু, তোর বাপের বুদ্ধি যেন জেলাপির পাক।" গুরুমহাশয় ভাবিলেন, গরিবের উপর অত্যাচার করিয়া নায়েব যেমন পাপ করেন, তাঁহার সিধা তামাকের হন্তারক হইয়া ছেলেকে বিদ্যাশিক্ষার্থ অন্যত্র লইয়া যাওয়াও তদ্রূপ বা ততোধিক পাপ। নায়েব মহাশয়কে তিনি যে যথেষ্ট ভয় করিতেন না এমত নহে, আজ ভাবিলেন আর তিনি কোন "তোয়াক্কা" রাখেন না।

গুরুমহাশয়ের কথায় পুরন্দরের চক্ষে জল আসিল। পিতা যে সকলেরই হেয় হইয়াছেন, ইহা তাহার প্রাণে সহিতেছিল না।

সেই দিন জল খাবারের ছুটীতে গিয়া, পুরন্দর আর পাঠশালায় আসিল না।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

***

মধ্যাহ্নে স্নানাহারান্তে পুরন্দর ধীরে ধীরে তালপুকুরের দিকে চলিল। সে পথ তাহার চিরপরিচিত—দৈনিক ক্রীড়ার রঙ্গভূমি, কত মধুময় বাল্যস্মৃতি হায় তাহার সঙ্গে জড়িত! সে সব ছাড়িয়া কোন্ অপরিচিত দূর দেশে যাইতে হইবে ভাবিয়া, পুরনের হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, পথপার্শ্বস্থ বৃক্ষরাজি তাহার সেই ধীর মন্দ গতি দেখিয়া বিস্ময়ে চাহিয়া আছে। অদূরে শাবক লইয়া তৃণ ক্ষেত্রে শুক দম্পতি আহারান্বেষণে রত,—অন্য সময়ে সেই শাবক হরণের চেষ্টায় পুরন্দরের কত আনন্দ, কিন্তু এখন সে প্রবৃত্তি ছিল না। বরং আজ এই প্রথম জীবনে তাহার অনুশোচনা হইল, কেন মিছা খেলার অনুরোধে এতদিন নিরীহ পক্ষীশাবকদের পিতা মাতার স্নেহ নীড় হইতে কাড়িয়া লইয়াছি! মনে হইল, এক দিন ফুল কালীকে দিয়া, নিষেধ করিয়াছিল, কাকের ছানা মেরো না! অমনি বালিকা স্ত্রীর সরল সুন্দর মুখচ্ছবি মনে পড়িয়া গেল—পিতার দুর্ব্যবহারে সে কি ভাবিতেছে ভাবিয়া পুরন্দরের হৃদয়ে মহা যাতনা উপস্থিত হইল। সংসার তাহার যন্ত্রণামাত্রাত্মক মনে হইতে লাগিল।

ধীরে ধীরে পুরন্দর তালপুকুরের বটতলায় গিয়া পৌছিল। তাহার ঘন ছায়ার নীচে সুশীতল শান্তি বিরাজ করিতেছিল—দূরে অদূরে সর্ব্বত্র মৃগ-তৃষ্ণিকার ছলনা। পুকুরের কালজলে দীর্ঘ তালগাছের দীর্ঘতর ছায়া মৃদুল হিল্লোলে ঈষৎ কাঁপিতেছিল; কচ্চিৎ ঘুঘুর সকরুণ গান, কখনও বা চীলের তীক্ষ্ণধ্বনি সেই বিজন মধ্যাহ্নের নীরবতা ভঙ্গ করিতেছিল।

অন্য সময়ে এই প্রচণ্ড রৌদ্রে ছুটিয়া পুরন্দর কখন ক্লান্তি বোধ করিত না, কিন্তু আজ ধীরে ধীরে আসিয়াও পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, স্বেদে সর্ব্ব শরীর ভিজিয়া গিয়াছিল। বটতলায় আসিয়া মৃদু শীতল বায়ুস্পর্শে তাহার শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল। পুরন ভাবিল, পাঠশালার সময়টা এই খানেই কাটাইবে।

কিন্তু নির্জ্জন হইলেও এস্থান তেমন নিরাপদ বলিয়া আজ পুরন্দরের মনে হইতেছিল না। গুরুমহাশয়ের প্ররোচনায় পাঠশালার ছেলেরা এখানে পর্য্যন্ত হল্লা করিতে পারে। রাখালেরা দেখিতে পাইলে ছুটিয়া আসিবে, এবং ছোট বাবুকে বিচারাসনে বসাইয়া আপনাদের ক্ষুদ্র বৃহৎ নালিশ সকল তাঁহার কাছে রুজু করিবে। কেহ মিষ্টান্ন খাইতে চাহিবে, কেহ বা বৃক্ষ-জটায় ছোট বাবুকে উঠাইয়া দিয়া দোল দিতে ব্যস্ত হইবে। এ সকল রাখাল রাজ্যের কল্পনায় অন্য সময়ে পুরন্দরের বড় আনন্দ, কিন্তু আজ এ প্রকৃতির চিন্তাও তাহার বিষবৎ বোধ হইতেছিল। কাজেই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও কিছুক্ষণ পরে বট গাছের ঘন পত্রান্তরালে আত্মগোপন করাই তাহার কর্ত্তব্য বোধ হইল। গাছে উঠিয়া যে ডালটা পুষ্করিণীর দিকে হেলিয়া আছে, পুরন্দর তাহাই আশ্রয় করিয়া বসিল।

আপনাকে এইরূপে "লোক-লোচনের" বাহির সুতরাং নিরাপদ জানিয়া পঞ্চদশ বর্ষের বালক আত্ম-চিন্তায় নিমগ্ন হইল। মনের আঁধারে কোথাও সে আলোক দেখিতে পাইতেছিল না। শাশুড়ীর সহিত পিতার অনর্থক বিবাদ কোন কালে ভঞ্জন হইতে পারে, এমন তাহার বিশ্বাস হইতেছিল না। তারপর পিতা তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চান কেন? দেশেও তো পারসী পড়ার ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহার কোন উপায় না করিয়া, অতদূরে লইয়া যাওয়ার অভিপ্রায় কেবল তাহাকে কষ্ট দেওয়া। পিতার ব্যবহারে স্নেহ ও কোমলতা থাকিলে এ দুর্ভাবনা ছেলের মনে উঠিত না; কিন্তু মহেশ্বর ঘোষ মহাশয় পুত্রকে "পঞ্চ বর্ষানি" লালন পালন করিয়া, ষষ্ঠবর্ষ হইতে সেই যে "তাড়না" সুরু করিয়াছিলেন, "ষোড়শ প্রাপ্তি" পর্য্যন্ত তাহা অব্যাহত রাখাই তিনি প্রকৃত শাস্ত্রদর্শীর লক্ষণ মনে করিতেন। কলিকালের যেরূপ প্রাবল্য প্রজাদের ব্যবহারে তাঁহার শিক্ষা হইয়াছিল, তাহাতে অনেক সময় চাণক্য পণ্ডিতের "পুত্র মিত্রবদাচরেৎ" অনুশাসনাংশের উপর ন্যায়েব মহাশয়ের বিলক্ষণ সন্দেহ উপস্থিত হয়। অতএব অন্তরে বাৎসল্য স্নেহের অভাব না থাকিলেও ঘোষজা পুত্রের পঞ্চদশ বর্ষের শেষাশেষি তাহার

প্রতি মৌখিক বা লৌকিক ব্যবহারটা আরও কিঞ্চিৎ কঠোরতর করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

অতএব পুরন্দর বিচার করিল, বিদেশে কঠোরতর শাসনাধীনে রাখিবার জন্যই পিতা তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চান। স্থির করিল, মাতাকে বলিয়া একবার চেষ্টা করিবে যাহাতে যাওয়া বন্ধ হয়। সে চেষ্টা নিষ্ফল হইলে পিতা মাতার নিকট হইতে পলাইয়া যাইবে, সেও শ্রেয়। তার পর কি হইবে ভাবিতে ভাবিতে পুরন্দর অন্যমনস্ক হইতেছিল। এমন সময়ে কালীর হাসির শব্দে তাহার চমক ভাঙ্গিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

***

ঘন পত্রান্তরালে থাকিয়াও পুরন্দর ভাবিল, দুষ্টু বোনটি তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে। নহিলে প্রথম নম্বর, এ অপথে তাহারা কাপড় কাচিতে আসিবে কেন? দ্বিতীয়, তাহার আশ্রয় স্থানের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বোনটি অত হাসিবে কেন? আর তৃতীয় এবং নিঃসন্দেহ প্রমাণ, কনে অমন করিয়া ঘোমটা টানিবে কেন? কাজেই পুরন্দর মহা মুস্কিলে পড়িয়া গেল। এবং আর গাছে থাকিয়া বোনটির উচ্চতর হাস্যের কারণ হওয়ার চেয়ে অবতরণ করাই বিহিত জ্ঞান করিল।

অপ্রতিভ হইয়া পুরন্দর ঘাটের দিকে আসিতেছিল। ইচ্ছা বোনটিকে বুঝাইয়া দেয় যে সে যা মনে করেচে সেটা মিছে কথা,—কনেকে দেখিবার জন্যে কিছু এখানে আসে নি! কিন্তু বালিকাদ্বয়কে হঠাৎ বিস্মিত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া সেও সশঙ্কিত হইয়া দাঁড়াইল——আর অগ্রসর হইল না।

এ ভাবটা কিন্তু কাহারও বেশীক্ষণ রহিল না। ফুল ছুটিয়া গিয়া তাল গাছের অন্তরালে দাঁড়াইল এবং কাঁদ কাঁদ হইয়া সইয়ের উপর মৃদু মন্দ তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে শপথ করিল,—"ঠাকুরের দিব্বি" তোর সঙ্গে আর কোন দিনই কাপড় কাচ্তে যাব না। মা যে বলিয়াছিলেন, "ছেলেকে

বাপের অবাধ্য হতে শেখাতে নেই” সে কথা ফুলের মনে জাগিতেছিল। সই মার উপদেশ তুচ্ছ করিয়া ভারি অন্যায় করিয়াছে ভাবিয়াও তাহার ক্ষোভের সীমা রহিল না।

কালী মহা অপ্রস্তুতে পড়িল। সইয়ের শপথ ও রোদনে তাহার হাসি খুসী সব উড়িয়া গিয়াছিল——ওদিকে পুরো দাদার সে ভাব দেখিয়াও সশঙ্কিত হইল। এমন সঙ্কটে সে আর কখন পড়ে নাই।

ধীরে ধীরে কালী সইয়ের কাছে গেল। ফুল তাহার হাসি তামাসা ভরা মুখ দেখিয়া জ্বলিয়া যাইতে প্রস্তুত ছিল, তাহার বদলে বিষণ্ণ মলিন মূর্ত্তি দেখিয়া সেও নূতন করিয়া বিস্মিত হইল। কাজেই কালী যখন বলিল, “সত্যি সত্যি সে জানিত না যে পুরোদাদা এখানে এসেছে” তখন আর অবিশ্বাসের স্থান রহিল না। তাহাতে সইয়ের উপর গোসা দূর হইল বটে, কিন্তু উদ্বেগ কমিল না। বলিল “সই এখুনি কে দেখ্‌বে, বলবে বেহায়া মেয়ে দেখ, বরকে এয়েচে লুকিয়ে দেখ্‌তে!” কালীরও সেই ভাবনা কিন্তু সইকে আশা ভরসা না দিয়া সেও যদি অবসন্ন হয়, তা হলে ফুলের কি দশা হবে! স্বাভাবিক প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলে কালী উপেক্ষার হাসি হাসিল, বলিল “সব তাতেই তোর ভয়—কে আসবে এখানে”? ফুল আবার বলিল “কিন্তু মা যে বলেছিলেন, মা বাপের অবাধ্য হতে শেখাতে নেই”।

ঠিক্ এই কথাটা একই মুহূর্ত্তে কালীরও মনে উদয় হইয়াছিল, কিন্তু ঠাকুরাণীটি তাহাও অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দিলেন, সইকে বুঝাইলেন, একটু অপেক্ষা করুক, পুরোদাদাকে দুটা কথা সে বলে আসবে।

ফুল এ প্রস্তাবে সম্মত হইল, কিন্তু এই সর্ত্তে যে সই বেশী কথা কবে না, আর বেশী দেরি করবে না।

বিয়ের পর থেকে পুরোদাদাকে কালী একটু একটু “সমিহ” করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সাক্ষাতে তেমন ছুটাছুটি করিতে তাহার কেমন বাধ বাধ ঠেকিত। অতএব ধীরে ধীরে গেল।

পুরন্দরের মূর্ত্তি বিষাদ ভরা, কিন্তু কালীকে কাছে আসিতে দেখিয়া সে ভাবটা লুকাইতে চেষ্টা করিয়া অপ্রতিভের হাসি হাসিল। বলিল, “বোনটি, তুই যা ভেবে হাসছিলি সত্যি সত্যি কিন্তু তা নয়। তোরা যে এখানে আস্‌বি, আমি তার কিছুই জানিনে—সত্যি”!

এমন বিদ্রূপের সুযোগ কালী অনায়াসে উপেক্ষা করিল। আগেকার মত প্রশান্ত দৃষ্টিতে পুরন্দরের দিকে চাহিতেও পারিল না। মুখ নত করিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল—"আমরাও জান্‌তাম না দাদা, তুমি এখানে আস্‌বে। তা হলে আসতাম না। সইমা বলেচে, মা বাপের অবাধ্য হতে শেখাতে নেই। সইয়ের তাই ভাবনা হয়েচে, আমরা তোমায় বাপের অবাধ্য হতে শেখালাম।"

কথাটা পুরন্দরের হৃদয়ে গিয়া লাগিল। একটু আগে সে স্থির করিয়াছিল, পিতার কথা শুনিবে না। সহসা মনে একটা অভাবনীয় দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। অনেকক্ষণ পরে কালীর মুখের দিকে কোমল করুণ দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া পুরন বলিল—"আচ্ছা বোনটি বলিস্‌, আমি আর বাবার অবাধ্য হব না।"

বেগে পুরন্দর তালপুকুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। কালী ধীরে ধীরে সইয়ের কাছে ফিরিয়া আসিল। তখন দুই সইয়ে ভয়ে ভয়ে কাপড় কাচিল এবং ভয়ে ভয়ে ঘরে ফিরিয়া চলিল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

নিসিন্দা পরগণার কাছারী বিলাসপুর গ্রামে—ঘোষ মহাশয় এই পরগণার নায়েব। কাছারীর নীচে খড়িয়া নদী বহিয়া চলিয়াছে—তীরে আম কাঁঠাল, অশ্বথ বটের বাগান। কাছারীর অতি নিকটে সেই বাগানের ভিতর নায়েব মহাশয়ের বাসা।

বৎসরাধিক হইল পুরন্দর বাপের সঙ্গে এখানে আসিয়াছে। প্রথম প্রথম মন টিকিত না, কিন্তু অভ্যাসে সব সহিয়া গেল। খেলা ধূলায় যে আনন্দ বাড়ীতেই তাহা বিসর্জ্জন করিয়া আসিয়াছিল, এখানে আসিয়া সঙ্গীও জোটে নাই, কাজেই "আতালিক" মৌলভী সাহেবের সংসর্গে পুরন ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়া উঠিল। মৌলভী দেখিলেন লেখা পড়ায় নায়েব পুত্রের দিব্য বুদ্ধি। এক বছরেই ফারসীতে তার একরূপ দখল হইল। প্রায় দেড় বৎসরে পুরন্দর "আলিফ্ বে" হইতে "জহুরি" ও "খাকানি" শেষ করিয়া ফেলিল। এরূপ শিষ্যের প্রতি কোন্ শিক্ষকের না স্নেহ জন্মে? পুরন ওস্তাদজীর ঘন ঘন নিষ্ঠীবন ত্যাগ এবং তাঁর শরীর সম্ভূত লস্থন পলাণ্ডু গন্ধ তেমন হৃষ্টচিত্তে সহিতে পারিত না বটে, কিন্তু ক্রমে তাঁহার উপর একটা ভক্তির ভাব পোষণ করিতে শিক্ষা করিল। মৌলভী সাহেব একটু বেশী মাত্রায় কবিতা-প্রিয়। কথায় কথায় বিস্তর "বয়েৎ" তিনি সাকৃরেদের কাছে আবৃত্তি করিতেন। হাফেজের মর্ম্মস্পর্শী তত্ত্ব-কথা বলিতে বলিতে নিজে তিনি "দেওয়ানা" হইতেন না বটে, কিন্তু তাঁহার আবৃত্তিতে একটা মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য ছিল, যাহাতে শ্রোতাকে মুগ্ধ করিত। ক্রমে ফারসী ভাষায় অধিকার জন্মিলে পুরন্দর সে অমূল্য-রত্নরাজি কেবল মাত্র কণ্ঠস্থ করিয়াই ক্ষান্ত হইল না—হৃদয়ে ধারণ করিল।

নায়েব মহাশয় বিষয় কর্ম্মে সমাচ্ছন্ন—গোমস্তা, পাইক, রাইয়ৎদের সঙ্গে আদায় তহশীলের কচকচিতে তাঁহার অবসর মাত্র থাকে না। আহা-

রের সময় মাত্র ছেলের সঙ্গে একবার দেখা হয়, তাও রোজ নহে। মৌলভী সাহেব তাহাকে কি শিখাইতেছেন না শিখাইতেছেন, তার বড় খোঁজ খবর রাখেন না। ওস্তাদজী মাঝে মাঝে আসিয়া নায়েব সাহেবকে সেলাম বাজাইয়া সাক্‌রেদের "তারিফ্" সুরু করিলে তাঁর মনে হয়, মৌলভী "ইনামের" ফিকিরে আছে। হাসিয়া বলেন "সাহাব, বাপ্‌কে বেটা, সিপাহীকা ঘোড়া!" এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজে যৌবন কালে অল্প দিনের ভিতর ফারসীতে কিরূপ "লায়েক" হইয়াছিলেন, তার লম্বা চৌড়া গল্প করিয়া শ্বেত শ্মশ্রু মৌলভী সাহেবকে অতি মাত্র বিস্মিত করেন। নায়েব সাহেবের "খুসী হাসিলের" প্রত্যাশায় বছর দেড়েক পরে একদিন মৌলভী সাহেব কথায় কথায় পরম আপ্যায়িত ভাবে পুরন্দরের হাফেজ প্রিয়তা এবং তাহাতে তার সুন্দর ব্যুৎপত্তির প্রসঙ্গ করিলেন। ঘোষ মহাশয়ের ফারসী ভাষা জ্ঞান সম্প্রতি দরবারের আদব কায়দায় এবং জমীদারী শাসনে পরিণত হইয়াছিল—প্রথমে মৌলভীর কথা বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু নিজের অজ্ঞতা জাহির করিবার পাত্র তিনি নহেন। ক্ষণেক এম্‌নি ভাণ করিলেন, কথাটা যেন তিনি ভাল শোনেন নাই। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেব কখন কখন "হাফেজ" আওড়াইতেন, আর বলিতেন "হাফেজ" শুনিলে "দেওয়ানা" হয়। অতএব চকিতে আত্ম-সম্বরণ করিয়া নায়েব মহাশয় "হাঁ হাঁ" করিয়া উঠিলেন। "আরে কও কি মৌলভী, ছেলেটাকে দেওয়ানা কর্‌বার যোগাড়ে আছো!" ইনামের বদলে বদনাম অর্জ্জন করিয়া মৌলভীকে কাজেই ক্ষুণ্ণ মনে বাসায় ফিরিতে হইল।

হরমোহন ভট্টাচার্য্য ইহার পর একদিন আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়া ঘোষ মহাশয়কে বলিলেন, "নায়েব মশায়, দিব্য ছেলে আপনার। হবে না কেন পিতার পুত্র, শাস্ত্রে বলে আত্মা বৈ জায়তে পুত্র! ছেলেটি আমার কাছে একটু একটু সংস্কৃত পড়্‌তে ইচ্ছুক, কিন্তু আপনকার অভিপ্রায় জানতে ইচ্ছা করে। বেশ ত, তাতে আপত্তি কি?" ভট্টাচার্য্য শাস্ত্র হইতে শ্লোক এবং উপন্যাস সংগ্রহ করিয়া আপনার বচন প্রমাণ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, কিন্তু বুঝিলেন নায়েব অসন্তুষ্ট হইতেছেন। মহেশ্বর কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন—"খেপেচেন ভট্‌চাজ্ মশায়! কায়েতের ছেলের কি পণ্ডিতি চলে?"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

ঘোষ মহাশয় ভাবিলেন, মৌলভীতে পণ্ডিতে একজোট হইয়া তাঁহার ছেলেটির মাথা খাইতে বসিয়াছে। পাণ্ডিত্যসুলভ সরলতা এবং বিষয় বৈরাগ্যের প্রতি চিরদিন তাঁর বিতৃষ্ণা—ছেলেকে সে আপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বরাবর তাঁহার আন্তরিক চেষ্টা। এত কষ্ট করিয়া তিনি বিষয় সম্পদ উপার্জ্জন করিতেছেন; তাঁহার অবর্ত্তমানে ছেলেটিকে সিধালোক পাইয়া, তাঁহারই মত ঝানু লোক কেহ, যে তার মাথায় হাত বুলাইয়া সে সব আত্মসাৎ করিবে, এ কথাটা নায়েব মহাশয়ের বিশ্রাম কালে অনেক সময় মনে হইত। মানস-চক্ষে তিনি দেখিতেন, যাহাকে যাহাকে বঞ্চিৎ ও সর্ব্বস্বান্ত করিয়া তিনি আত্মোদর পূর্ণ করিয়াছেন, তাঁহার ইহকালের লীলা খেলা সাঙ্গ হইলে, তাহাদের সকলেই স্ব স্ব প্রাপ্য মায় সুদ পুরনের কাছ হইতে আদায় করিতেছে। ভাবিতে ভাবিতে বড় যন্ত্রণায় ঘোষজার একটু অবসাদময় তন্দ্রা আসিত—এমন সময়ে সফরসীসজ্জিত তাম্রকূট হস্তে দুঃখীরাম ডাকিত—"বাবু, তামাক ইৎসা করুন!"

অতএব নায়েব মহাশয় স্থির করিলেন, ইহার একটা প্রতিবিধান করিতে হইবে। তাঁহার বিবেচনায় দেড় বৎসরে ছেলের যে বিদ্যা হইয়াছে, তাই ঢের। এখন দিন কতক তাঁর কাছে তায়িদি করিলে, এক দিন পুরন মনিব সরকারে কোন্ একটা মুৎসুদ্দি হইতে না পারিবে! কিন্তু ছেলে এখন বড় হইয়াছে, আন্তরিক না হইলেও লৌকিক ব্যবহারে এখন তাহার সঙ্গে মিত্রবৎ ব্যবহার করা চাই। কি উপায়ে পুত্রকে আপনার অভিপ্রায় জানাইবেন, এই চিন্তায় ঘোষজার দুই চারিটা অশান্তিময় রাত্রি কাটিয়া গেল। তার পর এক দিন আপনাআপনি এক সুযোগ উপস্থিত হইল।

প্রাতে একদিন নায়েব মহাশয় গস্তিতে বাহির হইয়াছেন। কথা ছিল, সে দিন সম্ভবতঃ দেহাত হইতে ফিরিবেন না। কর্ত্তা নাই, কিন্তু তবু কাজ আটকায় না। আদায় তহশীলের কাজ দুঃখীরাম অনেক করিত, আজও করিতেছিল। মনিব অনুপস্থিত, অত্যাচার অনাচার সচরাচর যেরূপ চলে, তার চেয়ে কিছু বেশী মাত্রায় আজ চলিতেছিল। আর্ত্তের

ক্রন্দন এবং দাওয়া দোহাই রবে কাছারী-বাড়ী সরগরম—ক্রমে পুরন্দর পাঠাগারে যেথায় একমনে পড়া শুনায় রত, সেথায় তাহার প্রতিধ্বনি পৌঁছিতে লাগিল। সহসা দুঃখীরাম দেখিল, ছোট বাবু তাহার সম্মুখে, ক্রোধে বিস্ময়ে বিস্ফারিত মূর্ত্তি, চিত্তের আবেগে অবাক্ এবং নিশ্চল। যে ছোট বাবুকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে বলিলে হয়, আজ তাহার নবযৌবন দৃপ্ত, এই রোষ-নিশ্চল মূর্ত্তি দেখিয়া, দুঃখীরামের হৃৎকম্প হইল। প্রজারা ছোট বাবুর দোহাই দিতে লাগিল।

যে কালের কথা আমরা বলিতে বসিয়াছি, তখন অত্যাচারেরই রাজ্য। সকল প্রকার অরাজকতা বঙ্গের উর্ব্বর ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া, আলোক-লতার মত সমাজ ধর্ম্মনীতির কিসলয় শোভা আচ্ছন্ন করিতেছিল। মুরশীদাবাদের দরবারে দিন দিন যে অভূতপূর্ব্ব অবিচারের অভিনয় হইত, দেশের রাজা জমীদারগণ আপন আপন আয়ত্তের মধ্যে তাহারই পুনরাভিনয় করিতেন, এবং রক্তবীজের রক্তকণার মত পুনঃ পৌনে তাহা সর্ব্বত্র ক্ষুদ্র নবাব শ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছিল। এই হিসাবে মনিবের চেয়ে দেওয়ান, তাঁর চেয়ে নায়েব, ক্রমশঃ পাইক পর্য্যন্ত পদ-গৌরবের ক্রম যত নিম্ন, অত্যাচার-শক্তি তত বিকশিত হইয়া উঠিত। সে দিন ও যে আসন্ন মৃত্যু কয়েদী খালাস পাইয়া জজ্ সাহেবকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল, "সাহেব তুমি দারোগা হও," সে কথাটা অর্থহীন নহে।

পুরন্দর কাছারী বাড়ীতে আসিয়া অত্যাচারের যে চিত্র দেখিল, তাহা ভয়ানক। আঙ্গিনায় হাত পা পিছমোড়া করিয়া বাঁধা, ৮।১০ জন রাইয়ৎ পড়িয়া—দুঃখীরাম তাঁর উপর স্বহস্তে তাহাদের বেত্রাঘাত করিতেছে। কোথাও কোন লালপাগড়ী পাইক কোন রাইয়তের বুকে বাঁশ দিয়া দলিবার উদ্যোগ করিতেছে!

ছোট বাবুকে হঠাৎ রুদ্রমূর্ত্তিতে আসিতে দেখিয়া, দুঃখীরামের হুকুম-বরদার পাইকগণ সরিয়া পড়িল। স্বয়ং দুঃখীর হৃৎকম্প হইয়াছিল। যথা সম্ভব সত্বর পুরন্দর স্বহস্তে রাইয়ৎদিগকে বন্ধন-মুক্ত করিলেন, গাঢ়স্বরে তাহাদের বলিলেন, "তোমরা ঘরে যাও, তোমাদের খাজানার জবাবদিহি আমার!"

ধীরে ধীরে পুরন্দর আপনার শয়নাগারে গিয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া শয়ন করিল। স্নানাহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, কেহ তাহাকে ডাকিতে সাহস করিল না।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

অপরাহ্ণে নায়েব মহাশয় ফিরিয়া আসিলেন। শুনিলেন, পুরন রাগ করিয়া স্নানাহার করে নাই, সমস্ত দিন শয়নাগার হইতে বাহির হয় নাই। কি জন্য রাগ, তাহাও শুনিলেন। মনে মনে পুত্রের উপর বড়ই চটিয়া গেলেন, এবং মৌলভী সাহেবের মুণ্ডপাত করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন। এ দিকে কিন্তু অপত্য-স্নেহও প্রবল হইয়া উঠিল—দ্রুতপদে পুরনের শয়নাগারে গেলেন। মহাশঙ্কিত হইয়া দেখিলেন, দ্বার জানালা সব বন্ধ।

রুদ্ধ নিশ্বাসে ঘোষ মহাশয় দ্বারে করাঘাত করিলেন। ডাকিলেন,—"পুরু!" পুরন্দর বুঝিল পিতা, উঠিয়া ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া দিল। বাপকে দেখিয়া লজ্জিত হইল, এবং নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। মহেশ্বর বুঝিলেন, ছেলে সমস্ত দিন কাঁদিয়াছে—চখের পাতা তখনও ভাল করিয়া শুকায় নাই। উদ্দীপ্ত ক্রোধ বাৎসল্য রসে নিভিয়া গিয়াছিল। কাজেই যখন বলিলেন, "ছেলেমি করে একি রাগ বাপু—সমস্ত দিন খাওয়া দাওয়া বন্ধ! সবই ত তোমার!" তখন আর খল কপট ছিল না।

পুরন্দর পিতার কাছে এ স্নেহ কোমল ব্যবহার প্রত্যাশা করে নাই। প্রজাদিগকে যুগপৎ বন্ধন ও ঋণ-মুক্ত করিয়া যদি কিছু অপরাধ হইয়া থাকে, পিতার চক্ষে তাহার মার্জ্জনা নাই, এইরূপ তাহার ধারণা। কিন্তু নিজ কৃতকার্য্যের ফলাফলের জন্য তাহার উদ্বেগ মাত্র ছিল না। তাহার মনঃকষ্ট গরিব প্রজাদের উপর সেই লোমহর্ষণ অত্যাচার দেখিয়া। সে কথা মনে করিতে সমস্ত দিন তাহার চক্ষে জল পড়িয়াছে। আর জ্ঞাতে হউক অজ্ঞাতে হউক, পিতা যে সে অধর্ম্মের ভাগী, এবং সেই অধর্ম্মার্জ্জিত অর্থে তাহারা প্রতিপালিত হইতেছে, এ চিন্তা অনেকবার তাহার সংসারজ্ঞানশূন্য কোমল হৃদয়ে দারুণ আঘাত করিয়াছিল। পুরন ভাবিল, অজ্ঞাতেই বা কেন? এত যে অত্যাচার অনাচার সবই পিতার আদেশে অনুষ্ঠিত হয়। ভাবের আবেশে স্থির করিল, পিতার চরণে ধরিয়া তাঁহাকে মিনতি করিবে, এ কাজ ত্যাগ করিয়া তিনি গৃহে চলুন, নিজে সে বিদেশে গিয়া চাকরী করিয়া তাঁহার সহায়তা করিবে। এই ভাবনায় অত কষ্টের ভিতরও তার

মনে একটা আনন্দের হিল্লোল উঠিতেছিল, এমন সময়ে পিতা দ্বারে করাঘাত করিলেন এবং ডাকিলেন, "পুরু!"

পিতার কণ্ঠস্বর শুনিয়া পুরন ভাবিল, এখনি তাঁহাকে আপন মনোভাব জানাইবে। কিন্তু সাক্ষাতে সব গোলমাল হইয়া গেল,—কিছুই বলিতে পারিল না। লজ্জানম্রমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

কিন্তু পিতা ভাবিলেন, অন্যরূপ। তাঁহার বিবেচনায় যতটা দোষ, সব সেই মৌলভী আর তার হাফেজের! ছেলে "দেওয়ানা" হওয়ার আর বাকী কি? আদায় তহশীলের কাজে কোথায় গায় হাত বুলাইয়া, বাপু বাছা করিয়া কে কবে কর্য্যোদ্ধার করিতে পারে? আর গরিবের উপর অত্যাচারটা এ দুনিয়ায় নায়েব মহাশয়ের মতে এমনি স্বতঃসিদ্ধ কথা, যে তার জন্য কাহারও ক্লেশ বা ক্রোধ হইতে পারে, এমত তাঁহার বিশ্বাস হইল না। বুদ্ধিমতী গৃহিণী যা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, পরিণামে তাই ঘটিল ভাবিয়া মহেশ্বর অধীর হইলেন। পরে ছেলেকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া স্নানাহার করাইলেন।

সেই রাত্রে দুঃখীরামের সঙ্গে নায়েব মহাশয়ের অনেক পরামর্শ হইল। দুঃখী ছোট বাবুর ক্রোধ এবং অভিমানের যেরূপ বর্ণনা মনিবের কাছে করিল, তাহাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণ হইল যে, উন্মাদের লক্ষণ বটে! তবেই বুড়া ঘোষ মহাশয় যে বলিতেন যে, "হাফেজ্" পড়িলে "দেওয়ানা" হয়, সেটা হাতে হাতে ফলিতে বসিয়াছে। নায়েব মহাশয় তখন স্বর্গীয় পিতাকে স্মরণ করিয়া ভক্তিভরে মনে মনে প্রণাম করিলেন, এবং কাতর ভাবে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন—পুরন যেন "দেওয়ানা" না হয়!

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

---*০*---

প্রিয় ভৃত্য দুঃখীরাম হাজরার সঙ্গে নায়েব মহাশয়ের মনের কথা অনেক চলিত বটে, কিন্তু সব চলিত না। বিশ্বসংসারে কাহারও উপর তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু যত দিন নায়েবি, তত দিন দুঃখীরাম। সে মনিবের দেহযষ্টি ভুঁড়িতে এবং তাঁর আঁবকাঠের বাক্স ক্রমে লোহার সিন্দুকে পরিণত হইতে দেখিল, তাঁর ছায়া দেখিলে মনের কথা বলিয়া দিতে পারিত। এমন অনেকবার হইয়াছে যে, মনিব একটা কথার বার আনা আন্দাজ বলিয়া চারি আনা হাতে রাখিয়াছেন, এবং সেই বার আনা কার্য্যে পরিণত করিতে ভৃত্যের প্রতি আদেশ করিয়াছেন। দুঃখীরাম তাহার প্রতিবাদ করিয়া ষোল আনা ত পূর্ণ করিতই, সম্ভব হইলে তার উপর দু আনা আরও চড়াইয়া দিয়া বিষমকে বিষমতর করিয়া তুলিত। রহস্য করিয়া ঘোষ মহাশয় কতবার বলিতেন, "ব্যাটা যেন মুৎসুদ্দি।"

ঘটনার পরদিন সন্ধ্যার পর নায়েব মহাশয় অর্দ্ধশয়ানাবস্থায় গুড়গুড়ি টানিতেছিলেন, দুঃখী তাঁর পদসেবা করিতেছিল। অনেক ভাবিয়া মনিব বলিলেন—"দুঃখী, যত নষ্টের গোড়া ঐ মৌলভীটে, তাকে আগে তাড়াতে হবে। কিন্তু পুরন কিছু বুঝ্‌তে না পারে—কি বলিস্?"

দুঃখী। তার আর কি? আমি এখুনি গিয়ে বলে আসি যে, সকাল বেলা আর যেন বিলাসপুরে তার চিহ্নৎ না থাকে! নইলে প্যাঁজ পয়জার কিছুই বাকী রবে না।

না। তুই ব্যাটা, সব কাজেই যেন উগ্রচণ্ডা, তা নয়। কৌশল করে তাড়াতে হবে। উছিলা করে সদরে পাঠিয়ে দি, ঘোষজা মশায়কে লিখি, সেইখানে সেরেস্তায় একটু কাজ করে দ্যান যেন।

দুঃখী। ছোট বাবুকে পাগল করে দিয়ে হাজার লোকের সাম্‌নে আমাকে যে বেইজ্জৎ করালে মোছলমানটা, তার কি বিচের কর্‌লেন? হুকুম হয় ত এই রাত্রেই আমি ওর ভিটে মাটী খড়ের জলে সাফ্ করে দি। সদরে পেটিয়ে দিলে ওর শাস্তি হলো কই?

নায়েব মহাশয় কেবল বলিলেন—"থাম্ ব্যাটা!" দুঃখী বলিল—"তবে

সেই ভাল। তার পর ছোট বাবুকে দিন কতক সেরেস্তায় বসিয়ে দিন, দেখুক একবার আদায় তশীলের কি হাঙ্গামা!”

ঠিক এই মুহূর্ত্তে নায়েব মহাশয়ের মনে এই সলাটার অঙ্কুর উঠিতেছিল, অতএব তিনি মনে মনে ভৃত্যের মুৎসুদ্দিআনার “তারিফ্” না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। প্রকাশ্যে মৌন হইয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ ধরিয়া টানিতে টানিতে মনিবের বদনযন্ত্র যখন যথেষ্ট ধূমোদ্গার করিতেছিল না, তখন সময় বুঝিয়া তাঁহার বুদ্ধির মূল পোষণ জন্য ভৃত্যকে সুতরাং উঠিতে হইল। সে কলিকা লইয়া চলিয়া গেল। ততক্ষণ নায়েব মহাশয়ের মাথায় দু চারিটা নূতন রকমের সলা জমিয়া গেল। দুঃখীরাম কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে ফিরিয়া আসিলে তিনি স্মিতমুখে বলিলেন, “ওরে ছোট বাবুকে দিন কতকের জন্যে একবার বাড়ী নিয়ে যা, মনটা এলো মেলো হয়েচে! ছুটী পেলে আমি নিজে নিয়ে যেতাম!” দুঃখী ঘাড় নাড়িল। “ছোট বাবুর যত গোসা আমার ওপর। তাঁর সঙ্গে নৌকয় পাইকরা কেউ যাক্!”

ঘোষজা এ যুক্তিটা মানিলেন। সাহস পাইয়া দুঃখী আবার বলিল “আমি শুকোপথে আগে যাই! মা ঠাক্রুণকে বলে কয়ে রাখিগে এই বেলা। নইলে এর উপর মাউই ঠাক্রুণ আবার যদি মন্তর তন্তর করেন, তবে আর রক্ষে থাক্‌বে না।” নায়েব মহাশয় নীরবে শুনিয়া গেলেন, কেবল বলিলেন “বেহান কি ঠকানটাই ঠকালে দুঃখী!” বিশ্বাসী ভৃত্য প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিল। সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল “সে জন্যেও একবার বাড়ী যাওয়ার ইৎসা।” তার পরও দুজনের কিছু কিছু গোপনীয় কথা হইয়াছিল। দুঃখীরাম দুই চারি দিন পরে পদব্রজে বাড়ী গেল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রায় দুই বৎসর হইতে চলিল, পুরন্দর "ষোড়শ বর্ষ প্রাপ্ত" হইয়াছে, কিন্তু পুত্রের প্রতি পিতার "মিত্রবদাচরণ" এতদিন কার্য্যে তেমন পরিণত হইতে পায় নাই। সে দিনকার ঘটনার পর ঘোষ মহাশয় দেখিলেন, দুটো বছর মিছামিছি গিয়াছে—ফারসী ও মৌলভীর হাতে ছেলের "তালিম" সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তিনি ভাল করেন নাই। পুরনকে বাড়ী পাঠাইয়া তাহার বিকাশোন্মুখ "দেওয়ানা" প্রবৃত্তিকে দমন করাই বিহিত বিবেচনা করিলেন বটে, কিন্তু সহসা সে প্রস্তাব নিজে বা কাহারও দ্বারা তাহার নিকট উপস্থিত করিতে সাহস হইল না। ইহার প্রধান কারণ, বাড়ীর কথা কেহ তুলিলে পুরন নিজে কোন কথা বলে না, এবং আপনা হইতে কখন আগ্রহের সহিত কোন কথা জিজ্ঞাসাও করে না। বিজ্ঞ ঘোষ মহাশয় বুঝিতে পারিতেন যে, বেহাইনের সঙ্গে তাঁহার অনর্থক অকৌশল করায় এটি ঘটিয়াছে। ছেলে এখন যোগ্য হইয়া উঠিল, বাড়ী গেলে জগদ্ধাত্রী যে বধূমাতাকে গৃহে আনিবেন, সে সম্ভাবনাও বড় নাই। অথচ এ দিকে পুরন্দরকে একবার হরিশপুরে না পাঠাইলেও নহে। হঠাৎ পড়াশুনা ছাড়াইয়া তাহাকে সেরেস্তায় ভর্ত্তি করিলে হিতে বিপরীত ঘটিতে পারে। সাত পাঁচ ভাবিয়া মৌলভীকে সদরে রওনা করার পর, দুই চারি দিন পরে যথাযোগ্য উপদেশ দিয়া নায়েব মহাশয় দুঃখীরামকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

মৌলভী গেলেন বটে, কিন্তু "দেওয়ানার" প্রেতাত্মা তাঁহার সঙ্গে গেল না। বরং ঘোষ মহাশয় দেখিলেন, মৌলভী থাকিতে সে দুই জনের স্কন্ধে ভাগাভাগি করিয়া বাস করিত, আজ কাল পুরনের উপর তাহার একাধিপত্য। লেখা পড়ায় তাহার মনোযোগ আরও বাড়িয়া উঠিল, দিবা রাত্রি পুরন একাকী নির্জ্জনে ফারসী কোবিদবর্গের সহবাস সার করিয়াছে। তাহার উপর আর এক উপসর্গ জুটিল। নৈয়ায়িক হরমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের টোল কাছারী হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ মাত্র ব্যবধান, রোজ প্রাতে একবার করিয়া সেখানে না গেলে পুরনের চলে না। কোন কোন দিন সেখান হইতে ফিরিতে তাহার স্নানাহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়, পিতা

কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নতমুখে মৃদু হাসিয়া পুরন বলে, "আজ্ঞে ন্যায় শাস্ত্রের তর্ক শুন্‌ছিলাম।" গভীর রাত্রে একদিন পুরন্দরের শয়নাগার হইতে সংস্কৃত অধ্যয়নের রব আসিতেছিল, বিস্মিত হইয়া নায়েব মহাশয় সে দিকে গেলেন। কণ্ঠস্বরে বুঝিলেন পাঠক স্বয়ং পুরন্দর। হর্ষ ও ক্ষোভে তাঁহার হৃদয় মথিত হইল। পুত্রের শাস্ত্রচর্চ্চায় অনুরাগ দেখিয়া মনুষ্যপ্রকৃতিসুলভ যে আনন্দ, তাহা তাঁহার অজ্ঞাতসারে হৃদয় প্লাবিত করিল। কিন্তু সে ভাব নিমেষ মাত্রের জন্য। পুত্র যে তাঁহার অবাধ্য হইয়া গোপনে শাস্ত্র চর্চ্চা করিতেছে, এবং পরিণামে পাণ্ডিত্যসুলভ বিষয়বুদ্ধিহীন হইয়া সর্ব্বস্ব খোয়াইবে এই চিন্তা তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল। হরমোহন ভট্টাচার্য্যের উপর তিনি জাতক্রোধ হইলেন—স্থির করিলেন, তাঁহাকে একবার দেখিবেন। বাপ যে তাহার সংস্কৃত শিক্ষার কথা জানিলেন, সে দিন পুরন তাহা বুঝিতে পারিল না।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ঘোষ মহাশয় দেখিলেন, হাতের চেয়ে আম বড় হইয়াছে, ছলে কৌশলে ছেলেকে শাস্ত্রচর্চ্চা হইতে বিরত করিয়া তিনি যে তাহাকে "বিষয়ী" করিতে চান, সেটা আর সম্ভবপর নহে। বুঝিলেন, ছেলে যদি সত্য সত্যই "দেওয়ানা" হইয়া থাকে, মুষ্টিযোগে সারিবে না, রীতিমত চিকিৎসার প্রয়োজন। তখন তিনি প্রকাশ্যে পুরন্দরকে সকল কথা বলিতে অভিলাষী হইলেন।

প্রাতে এক দিন ঘোষ মহাশয় কাছারী না গিয়া পুরন্দরের পাঠগৃহে—যেথায় সে পুঁথির সাগরে ডুবিয়া আছে—সেখানে গেলেন। নায়েব মহাশয়ের অর্দ্ধেক কেশ এবং গুম্ফেরও কিয়দংশ এই দুই বৎসরে পাকিয়া গিয়াছে, এবার দেখা হইলে গৃহিণীসম্ভাষণকালে অন্যান্য নানা বিশেষণের উপর বয়োধর্ম্মের এই যে অপরিহার্য্য পরিণতি, ইহারও উল্লেখ করিবেন, ইহা ভাবিতে সময়ে সময়ে তাঁহার মনে ইদানীন্তন কেমন একটা অসুখ জন্মিত। কিন্তু আজিকার এই প্রভাতে নবযৌবনপ্রফুল্ল আত্মজ সম্মুখে

একটা বিমল আনন্দ অনুভব করিলেন।—পুত্রের জ্ঞানদৃপ্ত আয়ত চক্ষু যুগলে, তাহার উদার প্রশান্ত ললাটতলে এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞাসূচক অধরোষ্ঠে, তিনি যেন আত্মরূপের উন্নত প্রতিকৃতি অনুভব করিলেন। অনেক কথা বলিব বলিয়া আসিয়াছিলেন, কিছুই বলিতে পারিলেন না। মুগ্ধচিত্তে পুত্রের আনত আননের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

পুরন্দর সে সময়ে পিতাকে নিকটে আসিতে দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল—কেন না, পিতা পুত্র উভয়ের পক্ষেই ইহা নূতন।

বিস্ময়ের প্রথম মুহূর্ত্ত অতীত হইলে পুরন্দর সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিল—বাপ বলিলেন, "বস বস, উঠ্‌তে হবে না বাবা! কি পড়া হচ্ছে?"

পুরন একটু আগে হাফেজের অনুকরণে, একটি বয়েৎ লিখিয়াছিল, লেখা সম্মুখেই পড়িয়াছিল, তখনও তাহার কালী শুকায় নাই। অতএব একটু চিন্তা করিয়া অপ্রতিভ হইয়া নতমুখে বলিল—"একটু লিখ্‌ছিলাম।"

"দেখি" বলিয়া ঘোষ মহাশয় লিপিখণ্ড চাহিয়া লইলেন, এবং সযত্নে পড়িতে চেষ্টা করিলেন। দেখিলেন দিব্য হস্তাক্ষর, কিন্তু পড়াশুনার অভ্যাস ঘোষজার অনেক কাল নাই, কাজেই তাঁহার আবৃত্তিমুখে বয়েৎটি মাঠে মারা যাইবার উপক্রম হইল। বলিলেন "পড় ত বাবা পুরু, তুমিই পড়।"

কম্পিত কণ্ঠে এবং গাঢ়স্বরে পুরন্দর আপনার রচিত কবিতাটি পিতৃ-সমীপে আবৃত্তি করিল, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ ঃ——

সৌন্দর্য্যের সার তুমি প্রকৃতি জীবন,
তৃষিত পরাণ চাহে তোমার মিলন।

এই কবিতায় হাফেজের মত মধুর রসে নবীন কবি আপনার উন্মেষোন্মুখ ভক্তহৃদয় সেই সর্ব্বসৌন্দর্য্যসারের চরণতলে উপহার দিয়াছিল, কিন্তু বিষয়ী শ্রোতা ইহার সঙ্গে বধূমাতার সুন্দর মুখখানি জড়িত দেখিলেন। অমনি ভাবিলেন, ছেলেকে বাড়ী পাঠানই ঠিক্, কিন্তু তার আগে বেহাইনের সঙ্গে বিবাদ মিটাইতে হইবে। প্রকাশ্যে আহ্লাদ করিয়া চাহিয়া লইলেন, এবং বলিলেন, মনিব বড় বাবুর কাছে পাঠাইয়া দিবেন। সে যে আনন্দ, সেটা স্বধু মৌখিক নহে। যে সকল দার্শনিক "পুনর্জ্জন্ম" এবং "পরকাল"কে বংশ-ক্রমের বাস্তব ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চান, তাঁহাদের কথা হাসিয়া উড়াইবার নহে।

সুযোগ পাইয়া ঘোষ মহাশয় বলিলেন, "দেখ বাবা পুরু, আমরা এখন

বুড় হতে চল্লাম, তুমি উপযুক্ত হয়েচ, আমার ইচ্ছা এখন সর্ব্বদা শাস্ত্রালোচনা না করে, একটু একটু জমীদারী কাজ কর্ম্ম তুমি দেখ। অনেক দিন বাড়ী থেকে এসেছ, দিন কতক ঘুরে এসো, তার পর আমার এখানকার কাজকর্ম্ম তোমাকেই সব দেখ্‌তে শুন্‌তে হবে।” কথা গুলি বলিতে বলিতে নায়েব মহাশয় বারম্বার পুত্রের মনোভাব তাহার বহিরাকৃতিতে অনুভব করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু তাহার বিনত মুখে সম্ভ্রম ও বিনয়ের লজ্জা ছাড়া আর কিছু দেখা গেল না। পুরন কোন উত্তর দিল না দেখিয়া পিতা আবার বলিলেন,

“কি বল বাবা!”

“যে আজ্ঞা” বলিয়া পুত্র পিতৃ আজ্ঞা পালনে সম্মত হইল। নিজের কোন কথা বলিতে পারিল না।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শিশুরা প্রায় সব কাজে বাপ মার অনুকরণ করে, এবং পিতা মাতার জীবনেও এমন দিন আসিয়া থাকে যখন তাঁহাদিগকে সন্তানের মুখ চাহিয়া সসম্ভ্রমে আত্মজীবন নিয়মিত করিতে হয়। ধীরে ধীরে ঘোষ মহাশয়ের জীবনে একটু একটু পরিবর্ত্তন ঘটিল—আর তিনি তেমন অবাধে গরিবের উপর অত্যাচার করিয়া অর্থসঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত নন। দেখিয়া লোকে আশ্চর্য্য হইল। অনেকে বলিল—“বুড় হতে চল্ল, চিরদিন কি এক ভাবে যায়? পরকালের ভাবনা ত ভাব্‌তে হচ্চে!” শমন এবং বৃদ্ধ বয়সের দোহাই দিয়া আমরা মনুষ্যপ্রকৃতির অনেক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া থাকি, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে পরিবর্ত্তন অধিকাংশ স্থলে পরিণত ঘটনাবলীর ফল—অবস্থাবশে বিশেষ জীবনে বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে।

দুঃখীরামকে বাড়ী পাঠাইয়া নায়েব মহাশয় সঙ্গে সঙ্গে পুত্রকেও রওনা করিবার ফিকিরে ছিলেন, কিন্তু ঘটনাধীনে দেখিতে দেখিতে চারি মাস চলিয়া গেল। এই সময় মধ্যে ধীরে ধীরে তাঁহার জীবনে একটা অনি-

বার্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল—পুরনের প্রতি বাৎসল্য-স্নেহ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতেছিল, তাহার শাস্ত্রচর্চ্চার প্রতি অনুরাগ আর অসহনীয় মনে হয় না। হরমোহন ভট্টাচার্য্যের সংস্কৃত অধ্যাপনার উপর যে জাতক্রোধ, তার তীব্রতাও কমিয়া আসিল। সকলের উপর, এতদিনের পর ঘোষজা বেহাইনের প্রতি যে অভদ্রাচরণ করিয়াছিলেন, তাহা মনে করিতে লজ্জিত হইতে লাগিলেন।

বাপের সঙ্গে সে দিন কথা বার্ত্তার পর, পুরন আপনা হইতে সেরেস্তায় আসিয়া বসিতে লাগিল। নীরবে কাজ কর্ম্ম শিখিত, কাহারও সঙ্গে বড় একটা আলাপ করিত না। তাহার অভিনিবেশ এবং শিক্ষাতৎপরতা দেখিয়া, নায়েব মহাশয় আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হইতেন বটে, কিন্তু ছেলে যে সর্ব্বদা ম্রিয়মাণ থাকে, তাহার বয়সসুলভ আমোদ আহ্লাদ করে না—অধিকাংশ সময় নির্জ্জনে একাকী থাকিতে ভাল বাসে, ইহাতে ক্রমে তিনি উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন।

দিনের পর যত দিন যাইতে লাগিল, ঘোষ মহাশয়ও তত অনুতপ্ত হইতে লাগিলেন। ছেলের মানসিক অসুখ যে তাঁহাদের দুজনের তার শ্বশুরালয়ের প্রতি কুব্যবহারজনিত, ইহা তাঁহার স্থির ধারণা হইল। পুরনকে নিজে বাটী লইয়া গিয়া বেহাইনের সঙ্গে ঝগড়া মিটাইয়া আসিবেন, এই আশ্বাসে মনিবের কাছে ছুটীর দরখাস্ত করিলেন। যথা সময়ে দুই মাসের ছুটী মঞ্জুর হইয়া আসিল।

তখন শুভ দিন দেখিবার জন্য হরমোহন ভট্টাচার্য্যের নিমন্ত্রণ হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় একাধারে নৈয়ায়িক, স্মার্ত্ত, দার্শনিক এবং দৈবজ্ঞ। পাণ্ডিত্য যতটা, নামটা তার চেয়ে অনেক বেশী, শাস্ত্রের কথা ছাড়া তখনকার রাজনৈতিক অনেক কথাও তাঁহার কাছে শুনা যাইত। অন্য সময় নায়েব মহাশয়ের কাছে আসিয়া তিনি বড় আমল পাইতেন না, আজ আসিয়া আসর জমকাইয়া বসিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসিলে, নায়েব মহাশয় মহা সমাদরে তাঁহাকে বসাইলেন, এবং পদধূলি গ্রহণ করিলেন। হরমোহন একটু বিস্মিত, একটু কৌতূহলী হইলেন—কেন না, ঘোষজার পক্ষে অতিভক্তিটা যে চোরের লক্ষণ, তাহা তাঁহার নিশ্চিত ধারণা ছিল। দেখা শুনাও অনেক দিন পরে—অতএব ইহার ভিতর যে নায়েবের শনৈঃ শনৈঃ মানসিক পরিবর্ত্তন, সেটা লক্ষ্য করিবার সুযোগ তাঁহার ঘটে নাই। ভট্টাচার্য্য একটু শঙ্কিত হইলেন—কি জানি কূটবুদ্ধি নায়েবটার মনে কি আছে! কিন্তু তিনি অতি চতুর, গল্পে সল্পে ঘোষ মহাশয়ের মনোভাব জানিয়া লইবেন, সে ভরসা রাখিতেন।

সম্প্রতি ভট্টাচার্য্য মহাশয় নদীয়া শান্তিপুর অঞ্চল ঘুরিয়া আসিয়াছেন, অতএব গল্পের বিষয় খুঁজিতে হইল না। শান্তিপুরের কুলকামিনীরা সাধারণতঃ একটু নাগরিক-ভাব-সম্পন্না, এবং ঊর্ণনাভের সূত্রবৎ সূক্ষ্ম বস্ত্রে লজ্জা রক্ষা করে, এটা তাঁহার শোনা ছিল। গঙ্গাস্নানে গিয়া এবার প্রত্যক্ষ দেখিয়া আসিয়াছেন, শাস্ত্রের বচন দিয়া এবং সমাসবহুল ভদ্র ভাষায় হৃদয়ের কলুষ আবৃত করিয়া, প্রথমেই পণ্ডিতপ্রবর সে গল্প করিলেন। তার পর নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর পালা! হরমোহন শিরোমণির মতে তাঁহাদের ভিতর পনর আনা তিন পাই অসার এবং পল্লবগ্রাহী—স্মার্ত্ত হইতে সাহিত্যজীবি, সবাই কেবল ব্যবস্থা এবং বিদায় লইয়া আছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। পরনিন্দার এই প্রবাহ-মুখে শিরোমণি ঠাকুর তাঁহার প্রশংসাপাত্র স্বরূপ যে দুই চারি জনের নাম করিয়া ফেলিলেন, তাঁহারাও তৃণবৎ ভাসিয়া যান,—এমন সময়ে নায়েব মহাশয় এক জনকে একটু আশ্রয় দিলেন। নবদ্বীপে স্মার্ত্ত শিরোমণির আলয়ে হরিশপুরের সেই চন্দ্রনাথ সার্ব্বভৌমের সঙ্গে ভট্টাচার্য্যের সম্প্রতি পরিচয় হইয়াছিল—তাঁহার পাণ্ডিত্যের একটু প্রশংসা করিলেন। ঘোষজা সাগ্রহে সার্ব্বভৌমের নবদ্বীপ যাত্রার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, বেচারী কন্যাদায়ে বিব্রত, আজিও মনোমত পাত্র খুঁজিয়া পান নাই।

নায়েব মহাশয় একটু আশ্চর্য্য হইলেন। প্রায় দুই বৎসর হইতে চলিল, তিনি বাটী হইতে আসিয়াছেন, তখনি সার্ব্বভৌমের কন্যাটির অরক্ষণীয়া-

বস্থা—এখনও সে অবিবাহিতা! হইলেনই বা সার্ব্বভৌম মহাকুলীন? নায়েব মনের তীব্রভাব ভাষায় তেমন প্রকাশ করিলেন না বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ আত্ম-সম্বরণও করিতে পারিলেন না। প্রকাশ্যে বলিলেন—"সার্ব্বভৌম ভায়াটী লোক দিব্য, পাণ্ডিত্যও দেশ-বিখ্যাত, কিন্তু ভায়ার একটু ছিট বরাবর থেকে গেল। তিনি যেমন জামাতাটি চান,—পণ্ডিত এবং কুলীন হবে, অথচ একাধিক বিবাহ কর্‌বে না, তাঁর বিঘা কতক লাখেরাজে ভুলে যাবে,—আজকালকার দিনে এমনটি কি ঘটে ওঠে? কি বলেন শিরোমণি মশায়?"

শিরোমণি। দুষ্প্রাপ্য বটে, কিন্তু দুর্ল্লভ নয়। আমি প্রতিশ্রুত হয়ে এসেছি, তাঁর মনোমত জামাতা স্থির করে দেব। আমারই একটি পড়ো, নিবাস কালীগ্রামে, দিব্য ছেলেটি।

না। কে সে?

শি। কেন ব্রজনাথকে আপনি চেনেন না? পুরন্দরের সে যে পরম বন্ধু। তারই কাছে পুরন্দর অধ্যয়ন করেন।

না। বটে! আমি ভেবেছিলাম, আপনার কাছেই পুরন সংস্কৃত পড়ে।

ভট্টাচার্য্য যুগপৎ জিহ্বা দংশন ও নস্য গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, "নায়েব মশায়, আপনার অনুমতি ব্যতীত কি আমি আপনার পুত্রের অধ্যাপনা করাতে পারি! তবে ছেলেটি বড় ম্রিয়মাণ হবে বলে মশায়ের অনভিমতটা তাকে আমি জান্‌তে দিই নি। জিজ্ঞাসা করলেও সদুত্তর দিই নি—তা দিব্য ছেলে পুরন্দর। নিজের যত্নে এর ভেতর ব্যাকরণে তার মোটামোটি বুৎপত্তি হয়েচে। ব্রজনাথ বলেন, আশ্চর্য্য তার মেধা! কৌশল করে আপনার আপত্তি তার গোচর হতে দিইনি—সেটা কি মন্দ হয়েচে নায়েব মহাশয়? নইলে যেমন ছেলে আপনার, সে কখন পিতার অবাধ্য হবার নয়।"

নায়েব মহাশয় অপ্রসন্ন হইলেন না।—উভয়ে বেশ প্রফুল্লভাবে আরও নানা কথা কহিলেন। তখন গৃহযাত্রার শুভদিন স্থির হইল।

শিরোমণি উঠিবার সময় ঘোষজা আবার তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন, এবং দুইটি মুদ্রা বিদায় স্বরূপ দিলেন। এতক্ষণে ভট্টাচার্য্য দেখিলেন, যথার্থই নায়েবের শুদ্ধা ভক্তির উদ্রেক হইয়াছে। হায় রৌপ্য চক্র, চিরকালই তুমি ভক্তি প্রীতির তুলাদণ্ড!

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পুরন শুনিল, ব্রজনাথের সঙ্গে কালীর বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে। ইহাতে তাহার আহ্লাদ হইল। কিন্তু আহ্লাদ ক্ষণেকের জন্য। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে যে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল, তার গতি এবং প্রকৃতি বিষাদের দিকে—মানুষসংসারে, যে কারণেই হউক দুঃখ কষ্ট সহিতে আসিয়াছে, এই রকম তাহার মনের ভাব। আত্ম-জীবনের একটা লক্ষ্য তাহার তখনও স্থির হয় নাই, কিন্তু আপনার বিষয়ে ভাবিতে বসিলেই তাহার মনে হইত, অতি ঘোর আঁধারে তাহার ভবিষ্যৎ সমাচ্ছন্ন! মনের এই অবস্থায় আনন্দের ভিতরেও সে মনশ্চক্ষে দেখিত, যেকেহ তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ বিশিষ্ট, সকলেরই জীবন অল্প বিস্তর দুঃখ যন্ত্রণাময়। অতএব, ব্রজকেও পুরন আহ্লাদের কথা কিছু বলিল না।

ব্রজ জানিত না, তাহার ভাবী পত্নী পুরন্দরের স্নেহের পাত্রী। পরম্পরায় যখন শুনিল, অধ্যপক নায়েব মহাশয়ের বাসগ্রামে তাহার এক সম্বন্ধ স্থির করিতেছেন, তখন স্বভাবতঃই পুরনকে সব জিজ্ঞাসা করিতে তার প্রবল ইচ্ছা হইল। কিন্তু সে কালের ছেলে এ কালের মত নয়, বিয়ের কথা হইলে প্রাণের বন্ধুর কাছেও তার লজ্জার সীমা থাকিত না। বলি বলি করিয়াও ব্রজ দুদিন পুরনকে কিছু বলিতে পারিল না। শেষে এক দিন ফুলের কথা পাড়িল।

আপনা হইতে পুরন্দর নিজের বিবাহসংক্রান্ত কোন কথা কখন তুলিত না—ব্রজ জিজ্ঞাসা করিলেও কখন সদুত্তর দিত না, হয় হাসিয়া উড়াইত, নয় অন্য একটা কথা তুলিয়া সে প্রসঙ্গ চাপা দিত। আজ্ ব্রজ হাসিয়া বলিল, "পুরন বাড়ী যাবে, ফুল তোমার জন্য ফুটে আছে!"

পুরন বিষাদের হাসি হাসিল—অতি ক্ষীণ ঈষৎ হাসি। একটু ভাবিয়া বলিল—"তোমারও প্রজাপতি উড়্‌চে, ফুল ফোটে আর কি!"

"ইস্—কিন্তু সে যা হোক্, ফুলের নামটাও ত আজ্ মুখে এনেছ!"

নিকটে এক মসীপাত্র ছিল—পুরন বলিল, "বল ত ওতে কি আছে?"

ব্রজ। (অতর্কিত ভাবে) কেন মসী—ভাষায় বলে কালী!

পু। ব্রাহ্মণী হতে না হতে নাম করলে—ব্রজ!

ব্রজ একটু অপ্রস্তুত হইল। বলিল, "ঢিলটি খেলে পাটকেলটি খেতে হয়—তা বেশ! শুন্‌চি নাকি সার্থক নাম?

পু। একটু কালো বল্‌চো! তা তেমন কালো—সংসারে বেশী হ'লে সবই আলো হত!

ব্রজ। কি রকম? সত্যি পুরন, আজ্ কাল তুমি অলঙ্কার ছাড়া কথা কও না যে!

কালীর সেই হাসিখুসি মূর্ত্তিখানি পুরনের মনে পড়িতেছিল। আর বিবাহের আগে সেই সরোবরতীরে স্নেহময়ী বালিকা যে পুরনকে নিষ্ঠুরতা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য অতি ধীর স্থির কোমলকণ্ঠে বলিয়াছিল—"দাদা! কাকের ছানা মেরো না," সে কথা আজ্ মনে পড়িয়া গেল! বিবাহের পর যে দিন ফুলের সঙ্গে শেষ দেখা হইয়াছিল, সে দিন কালীর বিষণ্ণ, ছলছল চক্ষু যেন সেই নব দম্পতির চিরবিরহসূচনায় উদ্বিগ্ন—স্নেহময়ী বালিকার সে কমনীয় মূর্ত্তি অনেক দিনের পর পুরন্দরের মনে পড়িয়া গেল! দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সাশ্রু নয়নে পুরন বলিল, "সত্যিই ব্রজ, তুমি ভাগ্যবান্, তাই অমন স্ত্রী তোমার লাভ হবে!"

তখন ব্রজর প্রশ্নে, পুরন একে একে সকল কথা বলিল। শেষে বলিল, "ভাই, তোমার মত সুপাত্রের হাতে কালী পড়ে, এই আমার চির দিনের বাসনা। সে বাসনা এত দিনে পূর্ণ হতে চল্ল, এ আমার বড় আনন্দের কথা।"

ব্রজ নীরবে সকল শুনিল। পুরন্দরের কণ্ঠে এত কারুণ্য, মূর্ত্তিতে এত বিষাদ, আর কখন সে দেখে নাই। কি জানি তারও মনটা কেমন খারাপ হইয়া গেল!

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ব্রজ বুঝিল, পুরন্দরের মনে কোনও উৎকট ব্যথা আছে। নহিলে কিসের তার দুঃখ?

প্রদোষে দুই জনে এক দিন নদীতীরে বেড়াইতে গিয়াছিল। ক্ষুদ্র খড়িয়া নদী শান্ত মৃদুসমীরে ঈষৎ মাত্র চঞ্চল, অন্য দিকে তাহার ভগ্ন পাহাড়ের গায়, যেথায় বিবর মধ্যে গাঙ্গেয় শুকেরা কুলায় নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সে দিকে হঠাৎ উভয়ের দৃষ্টি পড়িল। শুকের দল মহা গোল উঠাইয়াছিল, তাহাদের ভয়সূচক কণ্ঠে বিপদ সূচিত হইতেছিল। দুই বন্ধু অগ্রসর হইয়া দেখিল, বৃহৎ বিষধর সর্প এক বিবরে প্রবেশ করিতে উদ্যত, কিন্তু শুকদের মুহুর্ম্মুহু চঞ্চুর আঘাতে পারিতেছে না। ফণিবর মহাক্রোধে গর্জ্জন করিতেছিলেন, এবং ক্ষুদ্র পক্ষীজাতিকে এক একবার আপনার চক্রমহিমা বিস্তার করিয়া দেখাইতেছিলেন। পুরন্দর মহা উদ্বেগ ও ঔৎসুক্যের সহিত এই অহি-বিহঙ্গের যুদ্ধপরিণাম প্রতীক্ষা করিতেছিল—কেন না, সর্ব্বোপরি সেই বিবরবাসী শুক-দম্পতির ব্যাকুলতা তাহার প্রাণে বাজিতেছিল। পক্ষী পক্ষিণী এক এক বার বিবরের দ্বার রোধ করিয়া বসিতেছে, আবার প্রাণের ভয়ে উড়িয়া উড়িয়া করুণ আর্ত্ত চীৎকার করিতেছে। হায়! তাহাদের নিরীহ শাবকগুলি তখনি সর্পোদরে জীর্ণ হইয়া যাইবে। পুরন্দরের চক্ষে এক ফোঁটা জল আসিল।

অকস্মাৎ বিষধরের দর্প চূর্ণ হইয়া গেল—বিস্তৃত ফণা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া কাহার নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্র একেবারে তাহাকে নদীহৃদয়ে শায়িত করিল? ব্রজ আপনার লক্ষ্য অব্যর্থ দেখিয়া উল্লাসে করতালি দিবার পূর্ব্বে, পুরন্দর কিছু বুঝিতে পারে নাই—এম্‌নি তাহার তন্ময়ত্ব!

ব্রজর আহ্লাদের সীমা ছিল না, কিন্তু পুরন্দরের বড় একটা ভাবান্তর হইল না। নিরীহ শাবকগুলির প্রাণরক্ষার আশায় যে মানসিক তৃপ্তি, তাহা বিষধরের দুর্দ্দশাদর্শনজনিত অবসাদে বিলুপ্ত হইল। আহত সর্প নদীস্রোতের বিপরীতে উঠিতে গিয়া বারম্বার লাঞ্ছিত হইতেছিল, ব্রজ তাহার উপর আবার লোষ্ট্ররাশি বর্ষণ করিল। পুরন তাহা সহিতে পারিল না, ধীরে ধীরে ব্রজকে বারণ করিল।

ব্রজ হাসিয়া আকুল—বলিল, "তোমায় চিনিতে পারি না পুরন, তুমি বৌদ্ধ কি হিন্দু! সর্ব্বভূতে দয়া নাকি?"

রহস্যের উত্তরে রহস্য করিবার যে প্রবৃত্তি, আপাততঃ পুরন্দরের তাহা ছিল না। সে ভাবিতেছিল, খাদ্য খাদকের, অহিনকুলের যে বিষম বিদ্বেষভাব, ইহার জন্য কে দায়ী? ভগবানের সংসার প্রেমময় না হইয়া কেন এমন হিংসাদ্বেষসঙ্কুল হইল? ইচ্ছাময় কি ইচ্ছা করিলে ইহার অন্যথা করিতে পারিতেন না?

দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুরন ব্রজনাথকে সুধাইল, "ইচ্ছাময় কি ইচ্ছা করিলে সৃষ্টি হইতে এই হিংসা দ্বেষ দূর করিতে পারিতেন না?" ব্রজও তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু, হাতের ঢিল ফেলিয়া দিয়া সে বন্ধুর কাছে আসিয়া বসিল। বলিল, "পার্‌তেন বই কি, কিন্তু যখন করেন নাই, তখন বুঝিতে হইবে, ইহাই নিয়ম, এবং সংসারের মঙ্গলজনক।"

পুরন বলিল, "দেখ ব্রজ, এই ক্ষুধিত সাপও অবশ্য ভগবানকে খাদ্য প্রার্থনা করিয়াছিল। তিনি সম্মুখে ওই পক্ষীর কুলায় দেখাইয়া দিলেন। তার পর সাপ যদি পক্ষীশাবক গুলিকে ধরিতে পারিত, তাহারাও প্রাণের ভয়ে ভগবানকে ডাকিত। তখন তিনি কাহাকে রক্ষা করিতেন—খাদ্যকে, কি খাদককে? অথচ অহোরাত্র এ অনন্ত বিশ্বসংসারে এই অভিনয় চলিতেছে।"

ব্রজ সহসা কোনও উত্তর দিতে পারিল না—কিন্তু তাহার প্রিয় সুহৃদের হৃদয়ে ব্যথা কোন্ খানে, একটু একটু বুঝিতে পারিল। বুঝিল, পুরনের দুঃখ ব্যক্তিগত নহে।

চতুর্থ খণ্ড।

ষড়ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দুঃখীরাম বাড়ী পৌঁছিয়া মা ঠাকুরাণীর সঙ্গে দেখা করিল। স্পষ্টতঃ তাঁহাকে বলিতে পারিল না বটে যে, পুরন্দরের উন্মাদ লক্ষণ দেখা দিয়াছে, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে এমন সকল গল্প দিনের পর দিন করিতে লাগিল, যাহা কেবল উন্মত্তাবস্থাতেই সম্ভবে। শুনিয়া শুনিয়া জগদ্ধাত্রী রোজ মাথা খুঁড়িতে আর বেহাইনের পিতৃ মাতৃ কুলের চতুর্দ্দশ পুরুষের শ্রাদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রভুভক্ত দুঃখীরাম একটা কিছু মতলব আঁটিয়া মা ঠাকুরাণীকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাতে হিতে বিপরীত ঘটিল। শেষে জগদ্ধাত্রী এক দিন শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন, পাগল ছেলে করযোড়ে বলিতেছে, এ জন্মে আর দেখা হবে না। মার প্রাণ আর সহিতে পারিল না। পর দিনই তিনি নৌকাপথে বিলাসপুরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কন্যা শ্বশুরালয়ে, তাহাকে সম্বাদ দিলেন না।

মাহুই মার সঙ্গে দেখা করিতে দুঃখীরাম সাহস করে নাই। কিন্তু জনরবে একটু একটু গোল শুনিয়া, নিস্তারিণী আপনা হইতে তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দুই এক বার ইতস্ততঃ করিয়া শেষে দুঃখী আসিল। মা ঠাকুরাণীর কাছে যতটা নির্জ্জলা মিথ্যা বলিয়াছিল, মাহুই ঠাকুরাণীর কাছে ততটা পারিল না। নিস্তারিণী তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী, প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া বুঝিলেন, বেহাইনের অনুমান এবং আশঙ্কা অমূলক। বরং দুঃখীরামকে তিনি মৃদু ভর্ৎসনাও করিলেন যে, কেন বেহাইনকে অনর্থক তেমন ভাবাইয়াছে। একবার তাঁহার মনে হইল পূর্ব্ব বিবাদ ভুলিয়া নিজে গিয়া তিনি বেহাইনকে বুঝাইয়া ভাবনা দূর করিয়া আসিবেন। কিন্তু দুঃখীরাম বাটীর বাহির হইতে না হইতে জগদ্ধাত্রী নয়নের মাসীর মুখে শুনিলেন, বেহাইন জামাতার উন্মাদলক্ষণ শুনিয়া হাসিয়াছে—সুগুনির মা মাঝখানে থেকে তাঁর কথা দুঃখীকে বলিতেছিল—সে নাকি ডাইনী শাশুড়ীটার হাসি দেখে চক্ষের জল মুছি-

য়াছে! অতএব বিস্মিত এবং স্তম্ভিত সুশুনির মাকে পথের ধারে ধরিয়া, নয়নের মাসী, জগদ্ধাত্রী পক্ষে যে সকল বাক্যবিষ উদ্গীর্ণ করিয়াছিল, তাহা শুনিতে নিস্তারিণীর দেরি হইল না। কাজেই তিনি বেহাইন-সন্দর্শন কামনাকে মনে আর স্থান দিতে পারিলেন না।

সেই রাত্রে জগদ্ধাত্রী কুস্বপ্ন দেখিলেন। প্রাতে ঘোষ মহাশয়ের আলয়ে লোকারণ্য—এবং তাহার অধিকাংশই স্ত্রীলোক। জগদ্ধাত্রী দাসী বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছেন—"আমার দুঃখিনীর ধন ডাইনীর হাতে সমর্পণ করে তোকে হারালাম!" নয়নের মাসী এবং তাহার শিষ্যা প্রশিষ্যারা ছল ছল চক্ষে বলিতেছিল—"আহা! তাও আবার কথা গা! কি অলক্ষণে বিয়েই হয়েছিলো!" হারাধন শর্ম্মার গৃহিণী মাথায় এক রাশ সিন্দূর পরিয়া এই সময়ে আসিলেন। জগদ্ধাত্রীর হাত ধরিয়া বসাইয়া, আঁচল দিয়া চক্ষের জল মুছাইয়া দিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নয়নের মাসী নড়িল না বটে, কিন্তু তাহার দল পাতলা হইয়া গেল। পুরোহিত ঠাকুরাণীর ধমক চমকে ঘোষপত্নী বুঝিলেন, স্বপ্নে আপনার মন্দ দেখ্‌লে পরের মন্দ হয়। এই সময়ে দুঃখীরাম বাহিরের দ্বার হইতে সভয়ে উঁকি মারিল। এবং এই প্রভাতে সে কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিল বলিতে পারি না, তাহার চক্ষের উপর ঠাকুরাণীর উজ্জ্বল চক্ষু দুটি প্রতিভাত হইল। নথ ঘুরাইয়া ঠাকুরাণী ডাকিলেন, "দুখে!" দুঃখীরাম প্রমাদ গণিয়া অন্দরের উঠানে আসিতে আসিতে পীতুর মা—জনার্দ্দন শর্ম্মার বংশধরের নাম পীতাম্বর—পীতুর মা গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন।—"হতভাগা আগুরির গোঁয়ার! জানিরে জানি—তোর বাপ পিতেমহকে জানি। তা না হলে আর আমি পাকা মাথায় সিন্দূর পরি নে! তোর বাপ হলা, সে খেতে পেতো না! তোর নবাবি দেখে গায়ে আসে জ্বর। নেমকহারাম—একেই বলে বাইরে কোঁচার পত্তন, ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন!—"

দুঃখীরাম স্থান কাল পাত্রের হিসাব রাখিত। এক্ষেত্রে বুঝিল, হাসিয়া পুরুত ঠাকরুণের কথা সহিতে হইবে। এবং সে "আজ্ঞে" বলিয়া একটু কাষ্ঠ হাস্যের উদ্যোগ করিতেছিল—এমন সময়ে ঠাকুরাণী আবার আরম্ভ করিলেন,

"আমি হলে তোকে ঝাঁটা পেটা করতাম! বল্‌ত রে ড্যাকরা আমার সাক্ষাতে, কি হয়েচে ছেলের! বউমাকে একেবারে পাগল করে দিয়েচে!—" এতক্ষণে চক্ষু পড়িল নয়নের মাসীর উপর। ঠাকুরাণী অপেক্ষাকৃত নরম সুরে

আরম্ভ করিলেন—“আর তোমাকেও বলি বাছা! এমন কাজও কি কত্তে হয়। কৰ্ত্তাটি বলেন, তুমি তাঁরও চেয়ে দশ বছরের বড়। মরতে চলেছ, পরের কুচ্ছ নিয়ে, ঘর ভাঙ্গিয়ে আর কেন!”

এমন সময়ে হারাধন শৰ্ম্মা নিজে আসিলেন। মুণ্ডিত শির লোল চৰ্ম্ম, গায় নামাবলী, হাতে হরিনামের ঝুলি। তাঁহাকে দেখিয়া বউ ঝি সব পলাইয়া গেল; বধূমাতা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আসন আনিতে উঠিলেন, এবং স্বয়ং ঠাকুরাণীটি সীমন্তে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন।

ঠাকুরেতে ঠাকুরাণীতে বউমার সম্মুখে পরামর্শ হইল। ঠাকুর বিলাসপুর-গমনের প্রস্তাব প্রথমে অনুমোদন করেন নাই; কেন না, ঘোষ মহাশয়ের চিঠিতে জানিয়াছিলেন, শীঘ্র তাঁহার বাটী আসার সম্ভাবনা। বউমা অমনি ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—এ ঘরে আর থাক্‌তে পারিনে! তার পর ব্রাহ্মণী শাঁখা বাজাইয়া নথের ভিতর হইতে বুড়াকে দু কথা শুনাইয়া দিলেন। কাজেই নৌকা স্থির হইল। বেলা আড়াই প্রহরের পর, পুরোহিত ঠাকুর এবং চাকর চাকরাণী সঙ্গে জগদ্ধাত্রী স্বামী পুত্র সন্দর্শনে চলিলেন। বাড়ীতে রক্ষক রহিল, দুঃখীরাম হাজরা!

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সেই সেখ বজরুল করীম, ওরফে নায়েব মহাশয়ের খালাসীজি, অনেক দিন তাহাকে আমরা ভুলিয়া রহিয়াছি, কিন্তু এই ইতিহাসের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। দুই বছর আড়াই বছর নায়েব মহাশয় দেশ ছাড়া, খালাসীজিকে তাঁর মনে ছিল কি না, জানি না; কিন্তু সেখ করীম তাঁর সেই সেলামটুকুর জন্য চির নিমকহালাল! অতএব দুঃখীরাম বাড়ী আসার খবর পাইলে সেখজী এক দিন খাঁনসামাজীর দৌলতখানায় তসরীফ লইয়া আসিলেন। নায়েব সাহাবেঃ “খৈরিয়ৎ” ও “হালচাল” সম্বন্ধে দুজনের বিস্তর কথাবার্ত্তা হইল।

সেই দিন হইতে মাঝে মাঝে দুজনের “ভেট মোলাকাৎ” হইত—প্রথমে প্রকাশ্যে, তার পর “দোস্তি” কিঞ্চিৎ ঘনীভূত হইলে নির্জ্জনে। নির্জ্জনে কি

রকম "বাৎচিৎ" হইত, জগদ্ধাত্রীর গৃহত্যাগের কিছু পূর্ব্বে একদিনকার আলাপে বুঝা যাইবে।

সহরের অম্বুরি তামাক লইয়া খালাসীজি সন্ধ্যার সময় বাড়ী আসিয়াছেন, অতএব দোস্তকে সেলাম পাঠাইলেন। দুঃখীরাম এইমাত্র এক ছিলিম গাঁজা ফুঁকিয়া তর হইয়াছিল, এবং সেখবজরুলের কথা না ভাবিয়া সে দিন যে তার অন্দরের দ্বার পথ দিয়া দুটি উৎফুল্ল বৃহৎ চক্ষু তাহাকে গোপনে দেখিয়াছিল, তাহার অধিকারিণীকে ভাবিতেছিল। কাজেই খালাসী সাহাবের বাবুর্চ্চি এবং সম্বন্ধে ফুপা যখন আসিয়া সেলাম দিল, তখন অত্যন্ত প্রফুল্লতার সহিত তাহার বলিতে কোন বাধা বোধ হইল না যে, এই মাত্র সে দোস্তের কথাই ভাবিতেছিল। বলা বাহুল্য, তার পর নাগরা জুতা পরিয়া এবং মেরজাই কসিয়া, লাল পাগড়ী মাথায়, সে যখন সেখজীর তাম্রকূটসেবিত সুবাসিত বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল, তখনও এই কথাই পুনরুক্ত করিল।

কাজের কথা যখন আরম্ভ হইল, ফুপা তখন বাবুর্চ্চিখানায়, হুঁকা আলবোলার গরগর ঘর্ঘরও তখন নীরব হইয়াছিল। অতএব, সেই রুদ্ধ গৃহে অবরুদ্ধ ধূমরাশি তলে, এই দুই বন্ধুকে সর্ব্বনেশে পরামর্শে তন্ময় দেখিয়া কিঞ্চিৎ কবিত্বের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া যদি আমরা বলি, পাতালপুরে পিশাচ যুগল দেবতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিল, তবে বড় বাড়াবাড়ি হয় না!

সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলি হইতেছিল। পরস্পর পরস্পরের মতলব হাসিলের চেষ্টায় ছিলেন, কাজেই লুকাচুরির সীমা ছিল না। দুই জনেই মনের নিভৃতে তাহা বুঝিতেছিল, অথচ বাহিরে সরলতা এবং সৌহার্দ্দ্য প্রকাশের ত্রুটি ছিল না।

বজরুল করীম বলিল, "দোস্ত, কুছ পরওয়া নেই! আর থোড়া রোজ সবুর কর, নয়া আমল পড়ুক, গণৎকার বলেচে বুড়া নবাব ফৌত হতে দেরি নেই, তা হলেই তোমার একবাল খোল্‌বে! নাজীরকে আমি কোসিস্ করলে একটা পেয়াদাগিরি কোন ছোটা বাৎ।"

গঞ্জিকার মহিমায় ভোলা মহেশ্বর চলিত কথা হইলেও দুঃখীরাম পক্ষে সে কথা খাটে নাই। সে মাথার লাল পাগড়ী ভাল করিয়া বাঁধিয়া বলিল, "দোস্ত! পেয়াদার পোষাকে মোরে ক্যামন মানায়, তা দেখলে ত! এটাও নাজীরজীকে জানিও। আর আদায় তশীল, তা নায়েব মোশায়ের কাছে শুনে থাক্‌বে!"

খালাসী একবার দাড়ি চুমরাইয়া নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিল। পলাণ্ডুগন্ধটা হাজরাপুত্রের তেমন প্রিয় নহে, অতএব সে একটু সরিয়া বসিল। সেখজী আবার বলিল, "দোস্ত! তোমার খোসনাম জাহির আছে, ওসব আমার মালুম আছে। এখন নবাব সাহাবকে এক সগাদ দেবার বন্দোবস্ত করা চাই। জঙ্গী জোয়ান খোপ্‌সুরৎ আওরাতে তেনার বড়া সক্। তার এক ফিকির করতে পার দোস্ত?"

দোস্তের মনে তখন সেই বৈঠকখানাসংলগ্ন জানানামধ্যবর্ত্তিনী ইন্দীবরাননা, যার চক্ষু দর্শনেই হাজরা-পুত্রের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল, সেই বরবর্ণিনী মুসলমানীর কাল্পনিক মুখখানা জাগিতেছিল। অতএব তাহার প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্যই হউক, কিম্বা জাতি-বিদ্বেষবশতঃই হউক, দুঃখীরাম হাসিয়া বলিল,—

"সে ফিকির তুমি দেখ দোস্ত—হিঁদুর চেয়ে খোপ্‌সুরৎ মোছনমানে বেশী। সে দিন তোমার ঘরের কাছে কাকে যেন দেখনু, যেন পরীটি!"

সেখ বজরুল ভ্রূ কুঞ্চিত করিল,—ভাবিল, "কি আমার হাবিলীর কেউ! তা হলে কোতল করবো!"

দুঃখীরাম বুঝিয়া সামলাইয়া লইল!—"আমি ভাবনু দোস্তের কেউ বাঁদী চাকরাণী হবে! নইলে বাইরে বেরুবে কেন?"

এ কথায় সেখজীর কুঞ্চিত ভ্রূ হাস্য-প্রদীপ্ত হইল। কিন্তু কাজের কথা তখনও বলা হয় নাই, অতএব দোস্তের মন বুঝিবার জন্য আবার বলিল— "হরিশপুর কি তার আসে পাশে খোপসুরৎ লেড়্‌কী কি নেই! শুন্‌তে পাই, হেঁদুর ঘরে বড় সব খোপসুরৎ। কেন, সে দিন দোনো লেড়কী আমার সাম্‌নে পড়েছিল—তার একটি—বাহবা কি খোপসুরৎ, তার"—

দুঃখীরামকে জিহ্বা দংশন করিতে দেখিয়া সেখজী থামিয়া গেলেন এবং অপ্রতিভ হইলেন। পরে যখন দোস্তের মুখে শুনিলেন যে, সে বালিকা নায়েব মহাশয়ের পুত্রবধূ, তখন সেখজীর আপ্‌সোসই বা কত! "খোদা কি কসম্ দোস্ত, তোমরা কসম, নায়েব সাহাব কি ভি কসম্—তা জান্‌লে কোন্ নিমক্‌হারাম এমন কথা মুখে আন্‌ত!" আরো নানা রকমের কসম ও মুখভঙ্গী করিয়া, খালাসিজী স্বয়ং তামাক সাজিতে উঠিলেন।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দোস্তের মনের কথাটা দুঃখীরাম বুঝিয়া লইল, কিন্তু তাহার আসল মতলব ঠাহর করে, সামান্য গাঙ্গেয় খালাসীর সাধ্য কি! তাহার উপর ভাল করিয়া পরীক্ষা না করিয়াই দুঃখীরামকে নায়েব সাহেবের “পুতো” সম্বন্ধে অমন একটা বে-ইজ্জতের কথা বলিয়া ফেলিয়া খালাসীজি বড় “ঘাবড়াইয়া” গেলেন। বিশেষ সেখ করীম ভাবিল, তাহার বুদ্ধিদোষে সকল ফিকির বুঝি ফাঁসিয়া যায়। অতএব, নূতন কলিকায় সাজা “অম্বরী” তামাকটুকু এবার সসম্ভ্রমে সে দোস্তকে আগে দিল। দুঃখীরাম অনেক সাপের হাঁই চিনিয়া চিনিয়া তবে বেদে হইয়াছিল, কাজেই করীমের মুখের ছায়ায় এবং তোষামোদের আকস্মিক প্রাবল্যে, তাহার মনের ভাব বুঝিয়া কষ্টে হাস্য সংযম করিল। আপনা হইতে বলিল,—

“আচ্ছা দোস্ত, এই যে হেঁদু মুসলমানের মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছ, এতে কি হবে?”

ক। (কাষ্ঠ হাসিয়া) মতলব আর কি, মনিবের খুসী হাসিল—আর আর দু দশ রোপেয়া ইনাম!”

দুঃখী মুৎসুদ্দির মত হাসিল—রোপেয়া পয়সা যেন তার চিন্তার বিষয়ীভূত নহে। “দু দশ রোপেয়া ইনামের জন্যে দোস্ত ছোট কাজ কেন করবে। এতই যদি রোপেয়ার আবশ্যক, আমায় কেন বলো নি,—কত ফিকির আছে।”

দুঃখীরামের মুরুব্বিআনায় করীম কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল। কিন্তু তথাপি সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না। বেয়াকুব সাজিয়া নিতান্ত ভাল মানুষের মত বলিল, “যেমন করে হোক্, থোড়া বহুত রূপেয়া আনা চাই। বুঝলে কি না দোস্ত। আমিই বা কেন নায়ে আর দরিয়ায় জান কবুল করিচি, তুমিই বা কেন দেহাতে থাক। আলবৎ তোমার ইজ্জতের নকরী—কিন্তু নকরী ত বটে দোস্ত। একটা ফিকির যদি ঠাওরাতে পার তবে ‘আল্লার কসম’, কালই ইস্তফা দিই।” এই শপথ প্রতিপালন করা যে তাঁর পক্ষে অতিশয় সহজ, তাহা প্রমাণার্থ সেখ বজরুল করীম তিন বার তাঁহার সেই অজস্র ভ শ্মশ্রুতে বাম হস্ত বুলাইয়া লইলেন।

এবার দুঃখীরামের পালা। কিন্তু যে কূটচক্রী বলিয়া এক দিন নায়েব মহাশয়ের প্রশংসা লাভ করিয়াছিল, বর্ণজ্ঞানহীন খালাসী তাহার মহিমা কি

বুঝিবে? দুঃখী নখদর্পণে সেখ করীমের হৃদয় দেখিতেছিল, তাহার ঘৃণিত প্রস্তাব শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিমনাও হইয়াছিল, কিন্তু তাহার নিজের গভীর অভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করার জন্য দোস্তকে হাত করার বিশেষ আবশ্যক। অতএব অতি সাবধানে সে আপন বক্তব্যের মঙ্গলাচরণ করিল।

"ভাল দোস্ত, অনেক দেশ বিদেশ ত তুমি পানসী চড়ে বেড়িয়েছ, এমন কখনও কি শোন নেই যে, পুরাণ বাড়ীতে টাকা পোঁতা থাকে।"

ক। বহুৎ কেচ্ছা আমি জানি। সহরে দরিয়া কিনারে যে সব পুরাণ মোকান আছে, ওতে কি থোড়া ধনদৌলত আছে দোস্ত। কেতনা দফে আমি পান্সী বেয়ে চলেছি, কিনার থেকে আসরফী ভরা গাগরা দু তিনটে ধপাস্ করে দরিয়ায় পড়ল। লেকেন সে সব মনিব সরকারের চিজ, আমাদের হারাম।"

দুঃখীরাম গল্প করিল, সে সন্ধান পাইয়াছে, নিকটে কোন স্থানে এইরূপ বিস্তর ধন দৌলত প্রোথিত আছে। দোস্তের সহায়তা পাইলে, সে তাহার উদ্ধার করিতে পারে। কিন্তু ২০।৩০ জন লোকের দরকার—আর তারা বিদেশী এবং সশস্ত্র হওয়া চাই। সেখ বজরুল করীম প্রতিশ্রুত হইল, গোপনে অন্যান্য খালাসীদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, ইহার উপায় স্থির করিবে।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

—∗০∗—

প্রায় তিন বৎসর হইতে চলিল, পুরন্দর প্রবাসে গিয়াছে। এই কাল মধ্যে তাহার হৃদয়ে ধীরে ধীরে যে প্রলয় ঘটিতেছে, আমরা তাহা চিত্রিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। নায়িকা অথবা তাঁহার দলবলের ভিতর কাহারও কোন সম্বাদ সম্প্রতি পাঠিকা সুন্দরীগণকে দিতে পারি নাই। ইহাতে এ পক্ষ লেখকের বিদুষীমণ্ডলে পক্ষপাতী, এবং পল্লীমহলে "একচখো" প্রভৃতি সুনাম রটনা হইতেছে। কাজেই ফুল এবং কালীর খবর না দিলে আর চলিতেছে না।

ফুলকুমারী ত্রয়োদশবর্ষ অতিক্রম করিয়াছে, অতএব বাঙ্গালীর মেয়ের যেমন হইয়া থাকে, "কৈশোরে যৌবনে মিলন ভেল।" সত্য সত্যই যে

বিয়ের জল গায়ে পড়িয়াছে বলিয়াই সে ক্ষুদ্র ফুল ইহার মধ্যে কদলী বৃক্ষের বৃদ্ধিপ্রবণতা লাভ করিয়াছে, তাহা নহে—কিন্তু লোকে তাহাকে সেই রকম বুঝাইতে চেষ্টা করিল। বাহিরের লোকের কথা ধরি না, ফুলের মাতাই ক্রমে আর কন্যাকে আগেকার মত যখন তখন কালীর সঙ্গে বাহিরে যাইতে দিতেন না। বড় শিষ্ট শান্ত হইলেও ইহাতে সে মনঃক্ষুণ্ণ হইত, কিন্তু মাকে বড় কিছু বলিত না। কিন্তু সই যখন বড় পীড়াপীড়ি করিত, নিজের ওকালতী নিষ্ফল দেখিয়া বারম্বার চোক টিপিয়া একবার মাকে বলিতে বলিত, তখন ফুল এক এক দিন ক্ষুদ্র প্রাণটুকু হাতে করিয়া ম্লান এবং নতমুখে মাতার কাছে আবদার করিত। "তা মা সইয়ের সঙ্গে একবারটি যাইনে কেন, ঝপ্ করে আস্‌ব।" মা কালীর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দুষ্ট দুষ্ট মুখে কখন হাসিয়া অনুমতি দিতেন, কখন গম্ভীর মুখে বলিতেন, "ছি মা! এখন বড় হয়েছ, বাহিরে সারা দিন যেতে নেই।" ইহাতে ফুলের মনে হইত বটে যে, কই সে কোথায় বড় হইয়াছে, বিধু আর ক্ষীরোদা বরং তার চেয়ে দেখতে বড়, কিন্তু তারা ত তালপুকুরে সাঁতার দেয় আর ছুটাছুটি করে, কিন্তু মার কথার উপর আর কথা কহিত না, নীরবে ক্ষুদ্র হৃদয়ে ক্ষুদ্র দীর্ঘ নিশ্বাসটুকু চাপিয়া রাখিত। একদিন ফুল সইয়ের শিক্ষামত মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিয়াছিল যে, বিধু আর ক্ষীরোদা বড় কি সে বড়। মা ইহাতে কালো দুষ্ট মেয়েটার মন্ত্রীত্ব বুঝিয়া বলিয়াছিলেন, "তারা তোমার চেয়ে বড় হলে কি হবে মা, তোমার যে বিয়ে হয়েচে!" সেই দিন হইতে ফুল সইয়ের শত অনুরোধ সত্ত্বেও আর কখন মাতার কাছে এ কথা তুলিবে না, মনে মনে শপথ করিল। "বিয়ে হয়েচে, কি লজ্জার কথা মা বল্লেন সই! তোর পায়ে পড়ি, তুই ভাই ও কথা আর কখন মার কাছে মুখে আনিস্ নে।" সই জেদ্ করিলে ফুলের কাছে এই জবাব পাইত।

কিন্তু এই উনবিংশতি শতাব্দীর নিতান্ত এ কালের মেয়ে না হইলেও, অপরাজিতা ক্ষুদ্র বালিকাটি আন্দোলনের মহিমা বুঝিতেন; অতএব সইকে কোন হাসি বা মনের কথা বলিতে ইচ্ছা হইলে, তিনি এক এক দিন সইমাকে সহজে পরিত্রাণ দিতেন না। "তা সইমা, তুমি বাপু আমাদের খেলা ধুলো সব ভাঙ্গিয়ে দিলে দেখচি, এক সঙ্গে নাইতে কাপড় কাচতে পাব না, এ কি বাপু!" বলিতে বলিতে সুবুদ্ধি মেয়েটি চোক ছল ছল করিতেন, এবং সইমা যখন বলিতেন যে, তাঁর সঙ্গে নাইতে কাপড় কাচতে গেলেই ত হয়,

তখন আবার হাসিয়া কুটি কুটি হইতেন। "মা বলেন, বিয়ে হলেও তাঁরা বড় পর্য্যন্ত ছুটোছুটি করতেন, গাঁয়ে শ্বশুরবাড়ী বলে তুমি সইকে বার হতে দাও না—নয় সইমা!" সইমা ইহাতে মৃদু হাসিয়া তাহার চুলের গোছা লইয়া পড়িলে নিতান্ত ভাল মানুষের মত সহাইয়া সহাইয়া বলিত—"আচ্ছা সইমা, আজ লুকিয়ে একবার কাপড় কেচে আসি—সেই মাগী নয়নের মাসী না দেখলেই ত হলো গো!" কাজেই মাঝে মাঝে নিস্তারিণীকে শাসনের আঁটাআঁটি কিঞ্চিৎ শিথিল করিতে হইত। হাসিয়া তিনি বলিতেন, "তোকে পেরে উঠিনে বাছা। আচ্ছা যা আজ্ ফুলি!" ফুল মৃদু হাসিত। সইমা কখন বলিতেন, "কালীর পায়ে এই বেড়ি পড়ে আর কি, শাশুড়ী হলে দেখবো বাছা কেমন করে সাঁতার দিস্!" সে কথা কালী শুনিয়াও শুনিত না।

——*০*——

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

——*০*——

পুরন্দরের মানসিক পীড়ার কথা যে দিন গ্রামে রাষ্ট্র হইল, সে দিন কালী সইমার সঙ্গে এম্‌নি কৌশল করিয়া বেলা থাকিতে সইকে লইয়া তালপুকুরে চলিল। আগেকার মত সত্য সত্য কালীর ততটা ছুটাছুটি ছিল না, কতক মাতার শাসনে, কতকটা বা বিবাহের সম্বন্ধের কথা শুনিয়া—এবং সকলের উপর সইয়ের কাকুতি মিনতিতে বাধ্য হইয়া, দুষ্ট মেয়েটিকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে সভ্য ভব্য হইতে হইয়াছে। অতএব লোক দেখিলে ভব্যতার একটা ভেকধারণের মতি গতি, এক বছর হইতে তাহার হইয়াছিল। ইহার ফলে কালী এখন অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন-পথে সইকে লইয়া স্নান করিতে এবং কাপড় কাচিতে যাইত, এবং এ দিক্ ও দিক্ চাহিয়া যখন জন মানবের সমাগমের লেশমাত্র সম্ভাবনা নাই বুঝিত, তখন সইকে রাগাইবার ও কাঁদাইবার জন্য ছুটাছুটি লাফালাফি করিত। কিন্তু আজ সে সবের কিছুই ছিল না। "পুরোদাদা পাগল হয়ে গিয়েছে" ভাবিতে কালীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছিল, সইয়ের কি দশা হবে, ভাবিতে সে অধীর হইতেছিল! কাজেই

নতমুখে সইয়ের আগে ধীরে ধীরে যাইতেছিল। জনমানবশূন্য ক্ষুদ্র প্রান্তর, কেবল পাখীরা আহারান্বেষণে ব্যস্ত! এ অবস্থায় কালীর ততটা ধীরভাব ফুলকুমারীর ভারি অস্বাভাবিক মনে হইতেছিল। কিন্তু ঘাটে না পৌঁছা পর্য্যন্ত সেও কোন কথা কহিল না।

এই সেই তালপুকুরের ঘাট। তিন বৎসর পূর্ব্বে বিবাহের আগে এক দিন যে পুরন্দর বালিকা দুটিকে চমকিত করিবার জন্য বটগাছ হইতে দীর্ঘিকা-হৃদয়ে লাফাইয়া পড়িয়াছিল, সে কথা কেহ ভুলে নাই। যে তাল-গাছের অন্তরালে লুকাইয়া ফুল ভাবী স্বামীর দৃষ্টিপথ হইতে পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল—এখন শঙ্খচীলের বাসা দেখিবার ছল করিয়া মাঝে মাঝে তাহার তলে গিয়া দাঁড়াইত, কালী তাহাতে হাসিয়া কুটি কুটি হইত! পুরনকে মনে করিয়া ফুল আজও সেইখানে দাঁড়াইল,—দেখিয়া ছল ছল চোকে কালী মুখ ফিরাইল।

ফুল ইহা লক্ষ্য করিল। পরে সইয়ের কাছে আসিয়া তাহার গলা ধরিয়া আদর করিয়া সুধাইল যে, তার উপর সই রাগ করেচে কি না?

কালী প্রথমে মাথা নাড়িয়া জানাইল—না, রাগ করে নাই! পলকে অশ্রু-সম্বরণ করিয়া বলিল, "সই! একটা বড় কুখবর আছে! তাই বোল্‌তে তোকে এখানে এনেচি! কিন্তু বোল্‌তে আমার বুক ফেটে যাবে!"

ভয়ে, কৌতূহলে মুহূর্ত্তে ফুল শুকাইয়া উঠিল! দুই তিন বার ঢোক গিলিয়া সভয়ে বলিল, "কি সই!" কালী ফুলের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না, সেই তালগাছের দিকে চাহিয়া চাহিয়া শূন্যমনে আপনার অজ্ঞাতে যেন বলিল, "পুরোদাদা, পাগল হয়ে গিয়েচে!"

ধীরে ধীরে সেই ক্ষুদ্র ফুল সেইখানে বসিয়া পড়িল। তাহার রক্তিমাভ গণ্ড হইতে শোণিতকণা মাত্র অন্তর্হিত হইয়া গেল—সুঠাম কপোলযুগলে বিন্দু বিন্দু স্বেদসঞ্চার হইল। শূন্যে পিতার গম্ভীর-কণ্ঠে ফুল যেন শুনিল—"তখনই বলেছিলাম, এ বিয়ে সুখের হবে না!"

কতক্ষণ এ ভাবে গেল, ফুলের তা জ্ঞান ছিল না। যখন প্রকৃতিস্থ হইল, দেখিল, তার সব চুল ভিজিয়া গিয়াছে—সই গামছা ভিজাইয়া তাহার মাথায় জলসেক করিতেছে!

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

যে বলবান্, যে ক্রূর, ছল বল কৌশলে প্রকৃতি তাহাকে অমিতবলশালী করিয়াছেন; আর সেই সমপাতে অক্ষম এবং দুর্ব্বলকে তাহার পদানত হইতে হইয়াছে। ক্ষুদ্র মক্ষিকাটিকে উদরস্থ করিতে পারিবে বলিয়া, উর্ণনাভের কি সহজ আয়োজন! তার অগণিত পদ, অতর্কিত ক্ষিপ্রগতি, তার আত্মগোপ-নের শক্তি, এবং সর্ব্বোপরি তার জালবিস্তার—মনে হয়, তাহার শারীরিক এবং মানসিক শক্তি যেন দুর্ব্বলের পেষণ জন্যই পরদায় পরদায় উঠিয়াছে। তাই অনেক সময় মনে হয়, যিনি অনন্ত করুণাময় বিশ্ববিধাতা, তিনি স্রষ্টা মাত্র—এ পক্ষপাতের নির্ম্মাতা নহেন।

যে বটবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া পুরন্দর বালিকাদ্বয়ের জলক্রীড়া দেখিয়া-ছিল, দুই ব্যক্তি চোরের মত তাহারই ঘন পত্রান্তরালে লুকাইয়া আজ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছিল। উভয়েই শ্মশ্রুগুম্ফধারী এবং উভয়েই বিকট-মূর্ত্তি। সেই স্থান এবং কালে বালিকারা তাহাদের দেখিতে পাইলে ভয়ে মূর্চ্ছা যাইত, সন্দেহ নাই। সেখ বজরুল করীম অনেকক্ষণ সে ভাবে বসিয়া বসিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, অনেকক্ষণ তাম্রকূটসেবন বন্দ থাকায় তাহার হাই উঠিতেছিল, বিশেষ তাহার সহযোগীর অতিসাবধান তাহার আর সহ্য হইতেছিল না। কাসিতে বা নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতেও তার নিষেধ। অত-এব ফুলের চেতনা হইলে দুই সইয়ে কাপড় কাচিয়া ধীরে ধীরে যখন বাড়ী ফিরিয়া চলিল, তখন খালাসীজীর সখের প্রাণটা কাজেই বেশ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বিশেষ বজরুলের মনে পড়িল, নাজীরজী প্রতিশ্রুত হইয়াছেন যে; সেখ দেয়ানৎকে একবার "লেড়কী ঠো" দেখাইতে পারিলেই বক্‌শিসের কিয়দংশ তাহার অগ্রিম মিলিবে। অপর ব্যক্তির কিন্তু আপসোসের সীমা ছিল না। সেখ করীমের উপর মহা খাপা হইয়া চাপরাসী দেয়ানৎ আপনার শ্মশ্রু ত উৎপাটন করিলই, তার উপর এমন কি, সহযাত্রীকে "বেকুফ্" বলিয়া গালি দিতেও তার দ্বিধা বোধ হইল না। কেন সে কোনও সওয়ারি আনিতে মানা করিয়াছিল? তা হলে কি এমন শীকার হাতছাড়া হয়?

নিতান্ত "তাঁবেদার আদমী" হইলেও এ অপমান করীম সহিয়া থাকিল

না। সহজেই হরিশপুরের মাটীতে পা দিবামাত্র তাহার শরীরে ইজ্জতের একটা বিদ্যুৎ তরঙ্গ বহিত, আজ গাছে বসিয়া আছে বলিয়াই যে তাহার ইতর বিশেষ হইবে, এমন কথা নহে। আর আস্‌মানে জমীনে যত ফারাক, পেরে জমীনে কিছু ততটা নহে। খালাসীপ্রবর সেই "বেকুফ্" গালটি মায় কিঞ্চিৎ স্তুদ তৎক্ষণাৎ সেখ দেয়ানৎকে ফিরাইয়া দিল। দু জনে হাতাহাতি হইবার যোগাড় হইল।

তখন যদি উভয়ে স্থান কাল পাত্র ভুলিয়া কলহে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সকল যোগাড় যন্ত্র মাটি হইয়া যায়। ইহা ভাবিয়া দেয়ানৎ তাহার উদ্দীপ্ত ক্রোধ নিবারণ করিল এবং মনে মনে একটা বাঁধাবাঁধি রকমের "কসম" লইলেও মৃদু হাসিয়া মিষ্ট কথায় খালাসীকে ঠাণ্ডা করিতে ব্যস্ত হইল। বজরুল করীম ভাল মানুষ এবং ভাল মানুষির যম,—সে তত গর্জ্জন এবং আস্ফালন করিতে লাগিল। হইলই বা দেয়ানৎ নাজীরের প্রিয়পাত্র, সে ত আর তার "অপসর্" নহে যে, গালি দিয়া পার পাইবে! এই কথাটাই খালাসী নানা ভঙ্গীতে অনেকবার বলিল।

বজরুল একটু ঠাণ্ডা হইতে না হইতে দেয়ানৎ বলিল—বজরুল যদি সাহায্য করে, এখনই সে সেই খোপসুরৎ লেড়কীটাকে ধরিয়া, মুখ বাঁধিয়া লইয়া পলাইতে পারে!

খালাসী ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। এত "মেহনৎ" এবং "কোসিস্" করিয়া সে সত্য সত্যই বেকুফ্ বনিয়া যাবে—আর কোথা হতে দেয়ানৎ আসিয়া মাঝ-খান থেকে তাহার বক্‌সিসে ভাগ বসাইবে এবং বাহবা নেবে! বড় মজার কথাই বটে! বজরুল মুৎসুদ্দির মত বিজ্ঞ শুষ্ক হাসিটুকু কৃষ্ণ অধর প্রান্তে মাখিয়া, দুই বার ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। কোনও জবাব দিল না।

দেয়ানৎ তবু ছাড়ে না। বজরুল ব্যঙ্গ করিয়া বলিল—বক্‌সিসে সে আছে বটে, কিন্তু পেঁয়াজ পয়জারে নহে। কাজটা এতই সহজ হইলে সেখ হারুর পোতা এবং সেখ উমেদের পুত্র বজরুল করীম কাহারও অপেক্ষা রাখিত না। লেড়কী যে সে ঘরণাওয়ালী নহে। ঘুণাক্ষরে এ অভিসন্ধি প্রকাশ পাইলে, লাঠিয়ালের দল চাই কি নবাব-দেউড়ী পর্য্যন্ত হল্লা করিতে পারে।

দেয়ানৎ চুপ করিয়া গেল। সন্ধ্যার অন্ধকারে উভয়ে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিল।

পঞ্চম খণ্ড।

দ্বাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মাস দুয়েকের ছুটী লইয়া নায়েব মহাশয় নৌকা-পথে বাটী চলিয়াছেন। নৌকা-পথে সে অনেক দূর—পাঁচ দিনের পথ। নৌকা মন্থরগতি, কিন্তু যাহাকে সে বহন করিয়া লইয়া যায়, তাহার মনের গতি তুলনারহিত। নৌকায় উঠিতে না উঠিতে নায়েব মহাশয় আপনাকে গৃহে অধিষ্ঠিত জ্ঞান করিয়া, গৃহের সুখকল্পনায় তন্ময় হইতেছিলেন, কিন্তু সন্ধ্যার সময় হিসাব করিয়া দেখা গেল—বিলাসপুর হইতে মোটে তাঁহারা সাত ক্রোশ আসিয়াছেন।

নায়েব মহাশয়ের চরিত্রে ইদানীং ধীরে ধীরে একটা পরিবর্ত্তন ঘটিতে-ছিল বটে, কিন্তু নিতান্ত অন্তরঙ্গ ছাড়া সেটা বাহিরের লোকে তেমন বুঝিতে পারিত না। আদায় তহশীলের সময় উত্তীর্ণ হইয়াছিল, কাজেই প্রজারা তাঁহাতে ইতর বিশেষ কিছু অনুভব করিতে পারে নাই। অতএব তিনি গৃহে যাইতেছেন শুনিয়া তাহারা খুসী হইল—অনেকে কামনা করিল, আর যেন তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে না হয়! জন কয়েক প্রজার উপর দুঃখীরাম একবার বড় অত্যাচার করিয়াছিল, তাহারা নায়েব মহাশয়ের কাছে নালিশ করিলেও তিনি তাহার কোন প্রতীকার করেন নাই, বরং প্রশ্রয় পাইয়া তাহারা মাথায় উঠিবে ভাবিয়া, তিনি উল্‌টা তাহাদিগকে "তম্বী" করিয়া-ছিলেন। বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল—কিন্তু এ মর্ম্মান্তিক অপমান তাহারা ভুলিতে পারিল না। নায়েব মহাশয়ের ছুটী মঞ্জুর হইয়া আসিলে কোথা হইতে তাহারা শুনিল, সত্য সত্যই তিনি নিজে আর ফিরিবেন না, এবং এবার ছেলেকে নায়েবি করিতে পাঠাইবেন। মাস খানেক ধরিয়া বাটীগমনের উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছিল, নৌকাও এবার কিছু বেশী মাত্রায় বোঝাই হইয়াছিল, অতএব প্রজারা যে জনরব শুনিয়াছিল, তাহা যথার্থ বলিয়াই তাহাদের বিশ্বাস হইল। এইরূপে ঘোষ মহাশয়ের মহা বিপদ সূচিত হইল।

জিনিসপত্রে নৌকার অষ্টাঙ্গ পূর্ণ—তিলধারণের স্থান ছিল না। ঘোষ

মহাশয়ের তাহাতে বড় এসে যায় না, কিন্তু পুরন্দর একটু মুক্ত স্থান এবং বায়ুর অনুরাগী। তাহার উপর প্রথম আষাঢ়ের গরম সেই রুদ্ধ নৌ-গৃহে তাহার অসহনীয় হইয়াছিল। বেলা পড়িতে না পড়িতে পুরন সেই যে নৌকার ছাদে গিয়া বসিয়াছিল, আহারাদির সময় না হইলে আর সেখান হইতে উঠিল না। রাত্রে ভাল রকম নিদ্রা হইতেছিল না—অনেক বার উঠিয়া উঠিয়া তাহাকে "ছইয়ের" আশ্রয় লইতে হইল। কৃষ্ণ ত্রয়োদশীর রাত্রি, নদী-হৃদয়ে বর্ষার নূতন ঢল পড়িয়া জলরাশি কূলে কূলে পূরিয়া উঠিতেছিল। নক্ষত্র-খচিত নীলাকাশতলে ক্বচিৎ নবজলধরের ছায়া পড়িতেছিল।

নায়েব মহাশয়েরও সুনিদ্রা হয় নাই, বিশেষ পথে ঘাটে তিনি স্বভাবতঃ সতর্ক থাকিতেন। পুরনকে বারম্বার উঠিতে দেখিয়া তিনি দুই এক বার স্নেহের অনুযোগ করিলেন—বর্ষাকাল, রাত্রির আর্দ্র বায়ু লাগিয়া অসুখ করিবে! কিন্তু তাঁহার নাসিকাগর্জ্জন ক্রমে তাঁহার অজ্ঞাতসারে জাগ্রত জীবমাত্রকেই জানাইয়া দিল যে, তাঁহার নিদ্রা আসিয়াছে। এমন সময়ে পুরন্দর আর এক বার বাহিরে আসিল। তখন মাঝি মাল্লা পাইক সকলেই সুষুপ্ত—রজনী ঘোরান্ধকারময়ী হইলেও নক্ষত্রালোকে নদীহৃদয় প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। ক্ষীণালোকে পুরনের মনে হইল, তীরে দাঁড়াইয়া ৪।৫ জন লোক চকিতভাবে নৌকা লক্ষ্য করিতেছে—স্পষ্ট বোধ হইল, তাহার মধ্যে কেহ কেহ সশস্ত্র! তখনকার দিনে চোর ডাকাতের ভয় সর্ব্বত্র হইলেও পরগণার এত কাছে থাকিয়া নায়েব মহাশয় সে আশঙ্কা করেন নাই। অতএব অস্ত্র শস্ত্র যথাস্থানে রাখা হয় নাই, পাইক দুইজনও নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছিল। পুরন প্রথমতঃ পিতাকে জাগাইয়া, পরে নৌকার অন্যান্য লোকজনকে সতর্ক করাই বিহিত জ্ঞান করিল। নায়েব মহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র তিনি একেবারে বাহিরে আসিলেন, এবং তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র যে কেহ থাকুক, ভয়ে পলাইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া নায়েবী সুলভ তারস্বরে উদ্দেশে গালিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। পুরন্দর ততক্ষণ পাইক ও মাঝি প্রভৃতির নিদ্রাভঙ্গ করিয়া একটা আলোর বন্দোবস্ত করিতে ব্যস্ত হইল। হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ হইল—সঙ্গে সঙ্গে মস্তকে আহত হইয়া সশব্দে নায়েব মহাশয় নৌকার খোলে পড়িয়া গেলেন।

লাঠিমাত্র সম্বল পাইকেরা তীরে লাফাইয়া পড়িতে না পড়িতে আহতকারীরা ছুটিয়া পলাইয়া গেল। আঁধারে তাহাদের অনুসরণ করার কোন

সম্ভাবনা ছিল না। তখন প্রদীপ জ্বালিয়া সকলে নায়েব মহাশয়ের শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল। আঘাত অতি গুরুতর, কিন্তু প্রাণ বাহির হয় নাই।

ত্রয়শ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

পুরন্দরের জীবনে এমন বিপদ আর কখন ঘটে নাই। এ বিপদে তাহার ন্যায় সংসারানভিজ্ঞ যুবকের বিহ্বল হওয়ারই কথা, কিন্তু আত্ম ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সে একরূপ কৃতনিশ্চয়, বিপদের উপর বিপদ তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, এইরূপ তাহার মনে হইত। চিত্ত স্থির করিয়া, পুরন যথাসম্ভব ইহার প্রতীকার করিতে প্রবৃত্ত হইল।

পিতার ক্ষতস্থান ধুইয়া বাঁধিয়া পুরন্দর নিকটস্থ গ্রামে চিকিৎসকের অনুসন্ধানে লোক পাঠাইল। সুচিকিৎসক কাহাকেও পাওয়া গেল না। দশ ক্রোশ দূরে কৃষ্ণনগর, সেখানে পৌঁছিতে পারিলে চিকিৎসার কোন ত্রুটি হইবে না, কিন্তু তাহার চেয়ে বিলাসপুরে ফিরিয়া যাওয়াই ত অপেক্ষাকৃত সহজ! নৌকার লোকে এইরূপ পরামর্শ দিল। পুরন্দর ভাবিয়া দেখিল যে, ফিরিয়া যাওয়া বিধেয় নহে। যদি পিতা কৃষ্ণনগর পৌঁছা পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন, চিকিৎসা হইতে পারিবে। আর যদি ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ হয়, তাহা হইলেও গঙ্গাতীরে তাঁহার সদ্গতির উপায় হইবে। তখনও প্রভাত হয় নাই, পুরস্কারের লোভ পাইয়া মাঝিরা নৌকা ছাড়িয়া চলিল। ঘোষ মহাশয় অজ্ঞান—পুত্রের শুশ্রূষায় অজস্র শোণিতপাত বন্ধ হইলেও তাঁহার চৈতন্যোদয় হয় নাই। অতি ধীরে ধীরে জীবন-স্রোত চলিতেছিল। সূর্য্যোদয় হইলে পুরন্দর গোদুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া রোগীকে পান করাইবার চেষ্টা করিল। বৃথা চেষ্টা! এই ভাবে মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হইল। কৃষ্ণনগর অদূরবর্ত্তী।

দইয়েহাটার বাজারে আর একখানা "সওয়ারি" নৌকা যাত্রীদের আহারাদির অনুরোধে বাঁধা ছিল। পুরোহিত হারাধন শর্ম্মা বাহিরে বসিয়া কাসিতে কাসিতে ডাবা হুঁকায় তাম্রকূট সেবনে গুরু আহারের পর গিলিত চর্ব্বণ করিতেছিলেন—কৌতূহলবশতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথাকার নৌকা,

কোথায় যাইবে?” পরিচিত কণ্ঠ শুনিয়া পুরন্দর বাহিরে আসিল, এবং স্বয়ং পুরোহিত ঠাকুরকে দেখিতে পাইয়া, এ বিপদে যেন আশ্বাসবাণী শুনিতে পাইল। আদেশ মতে মাঝি নৌকা তীরে বাঁধিল।

জগদ্ধাত্রী হারানিধি পাইলেন বটে, কিন্তু স্বামীকে সে অবস্থায় দেখিয়া হতজ্ঞান হইলেন। হারাধন শর্ম্মা ঘোষ মহাশয়ের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, জীবনের আশা বড় নাই। তথাপি তিনি মুখে মাতা পুত্রকে আশ্বস্ত করিলেন। দুগ্ধ গরম করিয়া রোগীর কণ্ঠে অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে সেচন করিলেন—কতক কতক গলাধঃকরণ হইল। তখন কবিরাজ ভোলা-নাথের কাছে বল্লালদীঘিতে লোক পাঠাইলেন। বলিয়া দিলেন, কবিরাজ মহাশয় যেন প্রস্তুত হইয়া থাকেন, নবদ্বীপ পর্য্যন্ত সঙ্গে যাইতে হইবে।

পুরোহিত মহাশয়ের অনুরোধে পুরন কোনরূপে স্নানাহার শেষ করিল। তাঁহার সান্ত্বনায় জগদ্ধাত্রীর মনে আশা ভরসা হইতেছিল—কিন্তু পুরন বুঝিয়াছিল পিতার সেই অন্তিম শয্যা। স্বরূপগঞ্জের কাছাকাছি নৌকা যখন পৌঁছিল, তখন অপরাহ্ণ হইয়াছে, ভোলানাথ কবিরাজ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কবিরাজ মহাশয় বহুদর্শী এবং বিজ্ঞ। দেখিলেন, রোগীর বাঁচিবার কোন আশা নাই। তথাপি স্বহস্তে বিশেষ যত্নের সহিত একবার ঔষধ সেবন করাইলেন। সঙ্গে যাইতে স্বীকার হইলেন না—পুরন পুরস্কার দিতে গেলে, গ্রহণ করিলেন না। বলিলেন “বাপু, তোমার গৃহ হইলে লইতাম, এখানে আমার গৃহ, তোমরা আমার অতিথি বলিলে হয়!” বিদায়কালে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পদধূলি লইয়া গোপনে বলিয়া গেলেন, আজ রাত্রি উত্তীর্ণ হইবে না।

তাহাই হইল। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর ঘোষ মহাশয়ের একবার চেতনা হইল—চক্ষুরুন্মীলন করিয়া ডাকিলেন—“পুরু!” পুরন কাছে বসিয়াছিল। পিতা আবার কষ্টে বলিলেন—“স্বপনে দেখ্‌ছিলাম তোমার গর্ভধারিণী কাঁদ্‌চেন!” জগদ্ধাত্রী কাঁদিয়া উঠিলেন। তখন সেই যন্ত্রণাময় মূর্ত্তিতে ক্ষণে-কের জন্য আনন্দ ফুটিয়া উঠিল। পুরোহিতের পদধূলি লইয়া বলিলেন—“অনেক পাপ করে ধনসঞ্চয় করেছি, দেখ্‌বেন, পুরু যেন তার সদ্ব্যয় করে।” পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, “একমাত্র সুহৃদ ধর্ম্ম, এ কথা কখন ভুলো না!” এই শেষ কথা। আর চেতনা হইল না। শেষ রাত্রে গঙ্গাগর্ভে মহেশ্বর ঘোষ ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মৃতকল্প স্বামীর পতদলে বসিয়া বসিয়া প্রায় সমস্ত দিন জগদ্ধাত্রী অশ্রুমোচন করিতেছিলেন। হিন্দুর মেয়ের কাছে বৈধব্যের বাড়া আর গালি নাই। চির দিন তাঁর বিশ্বাস ছিল, স্বামীর আগে তিনি যাইবেন—সাধ ছিল স্বামীর ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া পুত্র কন্যার মুখ দেখিতে দেখিতে এ সংসার ত্যাগ করিবেন। আজ্ হঠাৎ সে বিশ্বাসে আঘাত লাগিয়াছে—পুরোহিত ঠাকুরের আশ্বাসবাক্যে আশ্বস্ত হইয়াও মাঝে মাঝে জগদ্ধাত্রী ভাবিয়াছিলেন, যদি বৈধব্য ঘটে! তাহার ফলে হৃদয়ে তাঁর বিপরীত তরঙ্গ উঠিতেছিল। তার পর রাত্রি যত অধিক হইতে লাগিল, বুঝিলেন বৈধব্য অবশ্যম্ভাবী। স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শোকে দুঃখে তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন।

চেতনা হইলে জগদ্ধাত্রী দেখিলেন, পুত্রের ক্রোড়ে তাঁর মস্তক,—তাঁর স্নেহের পুত্তলি, ইহজীবনের সকল আশা ভরসার ধন দীনহীন বেশে অশ্রুপাত করিতেছে। জগদ্ধাত্রীর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু পলকে তিনি আত্ম-সম্বরণ করিলেন। পুরোহিত ঠাকুরকে ডাকিয়া স্থির অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—"উদ্যোগ করুন, আমি সহমরণে যাব!"

এখন হারাধন শর্ম্মার মনোগতও তাই। তিনি ঘোর অদৃষ্টবাদী, ভাবিতে-ছিলেন, নিয়তি এই জন্যই তাঁহাদের বাটী হইতে লইয়া আসিয়াছে! কিন্তু মুখে কিছু ভাঙ্গিলেন না, বরং বধূমাতাকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন। পুরন কেবল কাঁদিল—কিছুতে মার সংকল্প টলিল না। মা বলিলেন, "পুরু, আমার কালপূর্ণ হয়েছে, তোদের উপর আর আমার মায়া নেই বাবা! চোখে চোখে আমি কেবল দেখ্‌ছি, ঐ তিনি আমায় ডাক্‌চেন। এখন আর অবাধ্য হব না। এখন পুত্রের কাজ কর্, আর দেরি করিস্ নে।"

অগত্যা সহমরণের উদ্যোগ হইতে লাগিল। সেই শুক্লকেশ, লোলচর্ম্ম, অশীতিপর বৃদ্ধ একাই সকল আয়োজন করিলেন। নবদ্বীপে তাঁর আত্মীয় বন্ধুর অভাব ছিল না, দেখিতে দেখিতে ইন্ধনে চন্দনকাষ্ঠে, ঘৃতভারে, পুষ্পে নববস্ত্রে গঙ্গাতীর পূর্ণ হইল। লোকে লোকারণ্য হইল। স্বয়ং ফাঁড়িদার,

সিপাহী চৌকীদার সঙ্গে অবতীর্ণ হইলেন। দলে দলে কণ্ঠীধারী বৈরাগীর দল নাম সংকীর্ত্তনের মহিমায় সে স্থান মাতাইয়া তুলিল। মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হইল।

তখন যথাস্থানে বৃহৎ চিতা রচিত হইল। পুরন্দর যথাশাস্ত্র অর্চ্চনাদি করিয়া পিতার মুখাগ্নি প্রক্রিয়া শেষ করিল। তখন জগদ্ধাত্রী—স্নাতা, পট্ট-বস্ত্রপরিহিতা, সীমন্তে সিন্দূরচর্চ্চিতা সাধ্বী জগদ্ধাত্রী অনুরাগভরে পুত্রের শির আঘ্রাণ করিলেন—বলিলেন, "বাপ্ না বুঝে বেহাইনের সঙ্গে অনেক কুব্যাভার করেচি, তিনি সতী সাধ্বী, মৃত বেহাইয়ের খড়ম পুজা না করে কেন জল গ্রহণ করেন না, আজ্ বুঝ্‌তে পার্‌চি। আজ্ দেখা পেলে তাঁর পা ধরে ক্ষমা চাইতাম—আমার হয়ে তুই ক্ষমা চাস্। বউমাকে ঘরে এন, কখন একটি কটু কথা বলো না। মোক্ষকে বলো, আমারি মত যেন বউমাকে আত্তি শ্রদ্ধা করে। দুই ভাই বোনে ভাব করে থেকো বাবা!" দরদরিত অশ্রু-ধারায় স্নেহময়ী মাতার গণ্ড ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তখনই চমকিয়া আত্মসম্বরণ করিলেন।—তখন পুরোহিত ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করিলেন, করযোড়ে দর্শক ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে প্রণাম করিয়া, আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন। জনসমুদ্র হইতে সাধুবাদের সঙ্গে সঙ্গে হরিধ্বনি উঠিতে লাগিল। স্বহস্তে সাধ্বী ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত এবং দরিদ্রদিগকে প্রচুর অর্থদান করিলেন—সঙ্গে নৌকায় যা কিছু ছিল, সকলই বিতরিত হইল।

তখন দর্শার্থিনী সধবা প্রৌঢ়া যুবতী বালিকারা দলে দলে আসিয়া সতী সাধ্বীকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল—অনেকে তাঁহাকে বন্দনা করিয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিল—পতির আগে যেন আয়ু শেষ হয়। স্বহস্তে সকলকেই নববস্ত্র এবং সিঁদুর পরাইয়া দিলেন। পুরনকে ডাকিয়া অবশিষ্ট সিন্দূর এবং পরিহিত পট্টবস্ত্রের অঞ্চল ছিঁড়িয়া দিলেন—পুরন বউমাকে আর মোক্ষকে মার সেই শেষ আশীষ বাণী বলিবে! সেই দুর্ল্লভ "লক্ষণ" চিহ্ন উপহার দিবে!

তখন জগদ্ধাত্রী সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া দৃঢ়পদে চিতারোহণ করিলেন। এবং স্বামীর মৃতদেহ ক্রোড়ে করিয়া দুর্গা কালী হরি নাম উচ্চারণ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। হরিধ্বনিতে আর সব শব্দ ডুবিয়া গিয়াছিল। চিতায় আগুন দিবার সময় পুরনের জ্ঞান ছিল না। চিতাগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলে, একবার "কি করিলাম" বলিয়া ছুটিয়া সে দিকে ধাবিত হইয়াছিল, কিন্তু শত জনের দ্বারা প্রতিনিবৃত্ত হইল। তখন চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইল, সহজে সে মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল না।

ষষ্ঠ খণ্ড।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

এই ক্ষুদ্র উপন্যাসের সঙ্গে তখনকার সমসাময়িক ইতিহাসের একটু সম্বন্ধ আছে। নবাব সিরাজুদ্দৌলা তখন সবে মাত্র বাঙ্গলার মসনদে বসিয়াছেন। বঙ্গের রাজনৈতিক আকাশ-প্রান্তে অকাল জলদরাশির অঙ্কুর সবে মাত্র দেখা দিয়াছে—আলীবর্দ্দি খাঁর পাপসঞ্চিত সিংহাসন ধীরে ধীরে তিলে তিলে অধঃপাতে যাইতেছে।

যাঁহারা প্রচলিত ইতিহাস সকলের উপর নির্ভর করিয়া নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে সাক্ষাৎ পাপ বলিয়া জানেন, তাঁহারা অলীক কিছু না শিখিলেও খাঁটি সত্য শিক্ষা করেন, এরূপ বলিতে পারি না। নৃশংস, কৃতঘ্ন, লোভী আলীবর্দ্দির স্নেহের দৌহিত্র—নাতিগণের কোমল মুণ্ডভক্ষক ঠাকুরদাদা মহাশয়দের এই দেশে, লোকে নবাব সিরাজের গোড়ার খবরটা আমলে আনে না, এ বড় আশ্চর্য্য। কিন্তু খাঁটি সত্য ইহাই। বৃদ্ধ আলীবর্দ্দিকে যে ভাল করিয়া না চিনিয়াছে, সিরাজকে সেই বেশী দোষী মনে করে। কেহ না মনে করেন, আমরা তাঁহাকে নির্দ্দোষী বা স্বল্প-দোষী প্রমাণ করিতে ব্যস্ত হইয়াছি। আমাদের বক্তব্য এই যে, এই উচ্ছৃঙ্খল লক্ষ্যভ্রষ্ট নবীন-যুবক ঘটনা রাশির অনিবার্য্য ফল। লোকে যাই বলুক, পরকালে সিরাজের জন্য কিন্তু আলীবর্দ্দিকে "আল্লা আকবরের" কাছে জবাবদিহি করিতে হইয়াছে।

কোমল বয়সেই সিরাজের শারীরিক ও মানসিক নিকৃষ্ট বৃত্তি সকল অকাল-পক্কতা লাভ করিয়াছিল। মিষ্টান্নের ঘ্রাণ পাইলে সোণালি রূপালি বিচিত্র মাছির দল যেমন নানা দিক্ হইতে সমাগত হয়, পাপিষ্ঠ নীচ প্রকৃতির কতকগুলি লোক তেমনি এই বয়সে ক্ষুদ্র নবাবটিকে ঘিরিয়া বসিল। রাজনীতিজ্ঞ সুতীক্ষ্ণ-বুদ্ধি আলীবর্দ্দি বংশধর দৌহিত্রের তরিবৎ শিক্ষায় উদাসীন ছিলেন, সহসা এমন মনে হয় না, কিন্তু তাঁহার আদরের মাত্রা দিনে দিনে

অসম্ভব বাড়িয়া চলিয়াছিল। কঠোর রাজনীতি, অবিশ্বাস এবং নিষ্ঠুরতায় মণ্ডিত হইয়া তাঁহার কাছে কঠোরতর হইয়াছিল—বিজয়শ্রী প্রতি পদে সহায় হইলেও হৃদয়ে শান্তি ছিল না। অতএব দৌহিত্রের প্রতি স্নেহরসের সঞ্চার হইলে পাষাণ হৃদয় একবার যখন গলিল, তখন তাহার সকল বল সকল আশা সেই এক খাতে প্রবাহিত হইল। বিশ্রামকালের সেই এক মাত্র অবলম্বন, রাজকার্য্যের একমাত্র লক্ষ্য সিরাজ, বৃদ্ধ নবাবের জীবন-সর্ব্বস্ব হইয়া উঠিল। কিছুই তাহাকে অদেয় ছিল না, তাহার সকল ইচ্ছা পূর্ণ করিতে, সকল জেদ বজায় রাখিতে তাঁহার মহা আনন্দ বোধ হইত। এইরূপে বালকের কোমল হৃদয়ে যে যথেচ্ছাচারিতার বীজ উপ্ত হইল, কালে তাহাই তাহার সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছিল।

এই যথেচ্ছাচারিতা দিনে দিনে এরূপ প্রশ্রয় পাইল, যে শুনা যায়, আলীবর্দ্দির জীবিতকালে কিশোর সিরাজ সদলবলে যখন তখন রাজপথে বাহির হইতেন, এবং যে কোন শ্রেণীর স্ত্রীপুরুষ সম্মুখে পড়িত, তাহাদের লাঞ্ছিত অবমানিত করিয়া আমোদ-তৃষ্ণা নিবারিত করিতেন। বাধা দিবার কেহ ছিল না—বৃদ্ধ নবাবকে কেহ কোন কথা এত্তালা করিতে সাহস করিত না। শেষ এমন হইল যে, পাপিষ্ঠ সঙ্গীদের কুপরামর্শে ভুলিয়া সিরাজ স্বয়ং মাতামহকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিল।

ইতিহাসজ্ঞ জানেন, এই বিদ্রোহাগ্নি আলীবর্দ্দির অশ্রুজলে নিবারিত হইয়াছিল। স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে আলীবর্দ্দির এ সংসারে অকরণীয় কিছুই ছিল না, দৌহিত্র স্নেহে তাঁহাকে অভিভূত হইতে হইয়াছিল। বিদ্রোহ দমন জন্য নিতান্ত বাধ্য হইয়া যখন সেনা সমাবেশের আদেশ দিতে হইল, তখন বৃদ্ধের একমাত্র চেষ্টা, কিসে সিরাজকে নিরাপদে অক্ষত শরীরে ফিরিয়া পাইবেন! অকৃতজ্ঞ যুবক মাতামহের স্নেহ যত্ন ভুলিয়া পাপিষ্ঠ সঙ্গীদের পরামর্শে দূতের দ্বারা কত অপমানের, কত কঠোর কথা তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইয়াছিল, তাহাতেও নিমেষের জন্য তিনি বিরক্ত হন নাই। তার পর বিদ্রোহ দমিত হইল বটে, কিন্তু বিদ্রোহীর খাতির বাড়িয়া গেল।

এই সময়ে আলীবর্দ্দি যে ভ্রম করিলেন, কখন আর তাহার অপনোদন হইল না। সিরাজের অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তিনি যদি তাহার অনুচরগণকে শাস্তি দিতেন, তাহা হইলে আর জন্মের মত তাহার মাথা খাওয়া হইত না। কিন্তু সকল বুঝিয়াও বৃদ্ধ তাহা করিলেন না—অতি স্নেহে তাঁহার

মানসিক দুর্দ্দম বল টুটিয়া গিয়াছিল। এ দিকে অনুচরেরা সিরাজকে বুঝাইয়া দিল, এখন প্রকাশ্যে সকল প্রকার যথেচ্ছাচারিতা অনায়াসে আচরিত হইতে পারে। হইলও তাই। তখন হইতে বঙ্গে যে পাপের আগুন জ্বলিয়াছিল, পলাশী-ক্ষেত্রে তাহা নিবিল।

আমরা সিরাজুদ্দৌলার চরিত্রের কলঙ্ক-কালিমা মুছিবার চেষ্টা করিতেছি না। আমাদের কথা এই যে, কালিমা যে এত ঘনকৃষ্ণ, বৃদ্ধ নবাব আলীবর্দ্দি এবং সিরাজের নরাধম অনুচরবর্গ তাহার প্রধান কারণ।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

যে ষড়রিপু বিষয় এবং বিষয়ীর কাল, নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে অতি অল্প বয়সেই তাহাদের সর্ব্বতোমুখী প্রভুত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা প্রথম রিপুটির সঙ্গেই তাঁহার নাম অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে। তাহারই বশে রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ জগৎ শেঠাদির তিনি মর্ম্মান্তিক বিরাগভাজন হইয়াছিলেন, অমিতবল সৈন্যাধ্যক্ষ আলি-নাকি-খাঁর নিষ্কোশিত তরবারি এক দিন তাঁহার প্রতি উদ্যত হইয়াছিল।

ইহার ফলে বাঙ্গলা বেহার উড়িষ্যায় লোকের মানসম্ভ্রম রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিল। বড় ঘরে সুন্দরী যুবতীর সন্ধান পাইলেই ছলে বলে কৌশলে তাহাকে আয়ত্ত করা হইত—কেহ বাধা দিলে তাহার আর রক্ষা ছিল না। মধ্যবিত্ত বা সামান্য গৃহস্থ ঘরের কথা হইলে ত কোন উৎপাতই ছিল না। এ সকল নবাবের খাস অত্যাচার সম্পর্কিত। ইহা ছাড়া তাঁহার পামর অনুচরদের জুলুম ছিল—অনেক স্থলে তাহা মনিবের জবরদস্তি ছাড়াইয়া উঠিত। নবাবকে খুসী করিবার জন্য তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ঘোর প্রতিযোগিতা চলিত—তাঁহার ভেট সওগাদ সংগ্রহের জন্য তাহারা যে হীন উপায় সকলের আশ্রয় লইত, যে নারকী অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিত, নবাব সিরাজুদ্দৌলার আমল বলিলেই আজিও তাহার বিভীষিকা মানসপটে ফুটিয়া উঠে। এক এক জন অনুচরের তাঁবে বিস্তর গোয়েন্দা থাকিত,

গ্রামে গ্রামে তাহাদের চর ঘুরিত। তাহার কতক কতক পরিচয় এই ক্ষুদ্র ইতিহাসে আমরা দিয়াছি।

এইরূপে যে দুর্ভাগিনীগণকে কুলত্যাগিনী করান হইত, সহসা তাহারা নবাব অন্তঃপুরে স্থান পাইত না। অন্তঃপুরসংলগ্ন বৃহৎ বাটীতে কিছু কাল রাখিয়া সচরাচর তাহাদের অধিকাংশকে যবন-অন্তঃপুরিকা-সুলভ আদব কায়দা এবং হাবভাব বিলাস শিখিতে হইত। ইহার মধ্যে যে পারিত, সে আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইত। খোজাগণ ছাড়া পুরুষান্তরের এখানেও প্রবেশের সম্ভাবনা ছিল না। স্ত্রী প্রহরীও বিস্তর থাকিত।

সাধারণতঃ নবাবগণ যে শত শত মহিলা মধ্যবর্ত্তী হইয়া কাল কাটাইতেন, তাহাদের অধিকাংশ এইরূপে সংগৃহীত হইত। সে বিষয়ে নবাব সিরাজুদ্দৌলার বিশেষ নূতনত্ব ছিল না। তবে তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগ্রাসী ইন্দ্রিয়পরায়ণতা নবাব মহলেও বেশী শুনা যায় না।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।
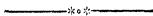
পিতৃ মাতৃ সৎকার শেষে সেই যে পুরন্দর মূর্চ্ছিত হইয়াছিল, সহজে তাহা ভাঙ্গিল না। তাহার উপর গুরুতর জ্বর হইল। সেই অবস্থায় তাহাকে গৃহে লইয়া যাওয়া বৈধ বলিয়া বৃদ্ধ পুরোহিতের বোধ হইল না। চিকিৎসকেরাও সে ব্যবস্থা দিলেন না। অগত্যা গঙ্গাতীরে এক প্রশস্ত দ্বিতল গৃহে বাসস্থান স্থির করিয়া হারাধন শর্ম্মা গৃহে লোক পাঠাইলেন। সকল শুনিয়া নিস্তারিণী আপনা হইতে দুঃখীরামকে ডাকাইলেন, এবং অবিলম্বে মোক্ষদাকে পত্র লেখাইলেন। এমন সময় ছিল না যে, মোক্ষদা হরিশপুরে আসিয়া ফুলকুমারীর সঙ্গে নবদ্বীপ যাত্রা করেন। নিস্তারিণী স্বয়ং কন্যাকে লইয়া স্থলপথে রওনা হইলেন। পথে মোক্ষদার সঙ্গে দেখা হইল। নবদ্বীপ পৌছিতে তাঁহাদের দুই দিন লাগিল।

নিস্তারিণী সকলই শুনিয়াছিলেন—কিন্তু মোক্ষদা সকল কথা জানিত না। বাটী আসিতে, পথে পুরন্দর বড় পীড়িত হইয়াছে, এইরূপ সংক্ষেপে

তাহাকে সম্বাদ দেওয়া হইয়াছিল—সাক্ষাতেও সে মাছইমার কাছে বিশেষ কিছু জানিতে পারিল না। অতএব নবদ্বীপ পৌঁছিয়া সে একেবারে শোকাভিভূত হইল। পুরন্দর অজ্ঞান—এ সবের কিছুই জানিল না। বিকারের ঘোরে অহর্নিশি কেবল দেখিত, গঙ্গাতীরের সেই চিতাগ্নি সংসারময় ব্যাপ্ত হইয়াছে—জলে স্থলে সর্ব্বত্র অগ্নি শিখা বিকীর্ণ করিয়া আকাশমার্গে উঠিতেছে। কখন দেখিত, জ্যোতির্ম্ময় দিব্যরথে পিতামাতার যুগলমূর্ত্তি। অপূর্ব্ব সুন্দর পুষ্পরচিত দিব্যরথ বিমান-পথে চলিয়াছে—কোথা হইতে মধুর কোমল গীতিলহরী উঠিয়া তাঁহাদের জয় গান গাহিতেছে—স্নিগ্ধ নীল আকাশতলে পলকে পলকে নক্ষত্রবৃষ্টি হইতেছে!

চিকিৎসা চলিতে লাগিল। তাহার শয্যা পার্শ্বে বসিয়া চিরদুঃখিনী শ্বশ্রূঠাকুরাণী ধীর গম্ভীরভাবে নিশিদিন বীজন করিতেছেন, তাঁহার সতর্কতায় ঔষধসেবনে মুহূর্ত্তের অনিয়ম ঘটিতে পাইতেছে না—স্নেহের ভগিনী পদতলে বসিয়া বসিয়া আহার নিদ্রা ভুলিয়া, শিশু পুত্র কন্যাকে ভুলিয়া কেবল শুশ্রূষা করিতেছেন, নীরবে তপ্ত শোকাশ্রু তাঁহার গণ্ড বহিয়া পড়িতেছে—এ সকলের কিছুই রোগী জানিল না। আর প্রকোষ্ঠান্তরে বসিয়া বালিকাবধূ অনন্তগামিনী জাহ্নবীকে প্রণাম করিতে করিতে অন্তঃকরণের নিভৃতে স্বামীর আরোগ্যকামনায় যে প্রার্থনা করিত, মা কালী দুর্গা ভগবতী জগন্নাথ সিদ্ধেশ্বরকে কাতর প্রাণে ডাকিত, তাহা কেবল অন্তর্যামীই জানিতেন। ফুলের ভারি ইচ্ছা করিত, পুরনের পায়ের কাছে বসিয়া বসিয়া তাঁহাকে বাতাস করে, আর তাঁর মুখখানি দেখিতে দেখিতে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া মনের যাতনা লাঘব করে, কিন্তু লজ্জায় সে সাধ ক্ষুদ্র হৃদয়ে উঠিয়াই বিলীন হইত। শেষে মোক্ষদা ধরিয়া আনিয়া বউকে দাদার রুগ্ন শয্যায় বসাইত—ফুলের ভারি লজ্জা করিত। মা বলিতেন, "ছি মা, এ বিপদের দিনে আবার লজ্জা কি? তুমি বসে স্বামীর সেবা কর। ভগবান তোমার মুখ চেয়ে পুরুকে ভাল করবেন।" কথা বলিতে নিস্তারিণীর মর্ম্মতল হইতে রোদন উথলিয়া উঠিত, কিন্তু তিনি অশ্রুপ্রবাহ রোধ করিতেন। কাজেই ক্রমে ফুল মাতা এবং ননদের সম্মুখে স্বামীর পদতলে বসিতে অভ্যস্ত হইল। কিন্তু লজ্জায় ঘোমটা টানিয়া মুখ নত করিয়া থাকিত।

সাত দিনের দিন প্রাতে পুরন্দরের জ্ঞান হইল। নিস্তারিণী তখন

কার্য্যান্তরে ছিলেন, ফুল এই মাত্র উঠিয়া গিয়াছে, কেবল মোক্ষদা শয্যা পার্শ্বে বসিয়া নীরবে অশ্রুমোচন করিতেছিলেন। পুরন বড় দুর্ব্বল, ছায়াবৎ সকল কথা মনে পড়িতেছিল। সপ্তাহ পরে এই তাহার প্রথম জ্ঞান— চিতাগ্নিবিবিক্ষু মাতৃরূপ মনে পড়িয়া গেল। ক্ষীণ-কাতরকণ্ঠে ডাকিল, "মা!"

পুরন আবার বাঁচিয়া উঠিবে, সে আশা মোক্ষদা করে নাই। ভ্রাতার জীবনের আশঙ্কায় দুর্ব্বিষহ পিতৃ মাতৃ শোক সে সম্বরণ করিয়াছিল, আজ পুরন্দরের মুখে করুণ "মা" ডাক শুনিয়া তাহার শোক উছলিয়া উঠিল। সকল ভুলিয়া সে বিবশ বিহ্বল হইয়া ভ্রাতার শয্যা পার্শ্বে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিল। দিদিকে সান্ত্বনার কথা বলে, সে সামর্থ্য পুরনের ছিল না। অলঙ্কারের শব্দে চক্ষু মেলিয়া দেখিল, পার্শ্বের গৃহ হইতে অবগুণ্ঠনবতী কিশোরী ধীর কুণ্ঠিত পদে আসিয়া দিদির মাথা কোলে তুলিয়া লইল। চিনিল—ফুল! আবার স্মৃতি মথিত হইল—মার অন্তিম অনুরোধ মনে পড়িয়া গেল। কম্পিত ক্ষীণ কণ্ঠে আবার পুরন ডাকিল, "মা!"

রোদন শুনিয়া নিস্তারিণী দ্রুতপদে আসিলেন, এবং স্নেহের অনুযোগ করিয়া মোক্ষদাকে সান্ত্বনা করিলেন। তার পর পুরনের সম্পূর্ণ জ্ঞান সঞ্চার হইল।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

দিনে দিনে পুরন্দর আরোগ্য লাভ করিল। ইহার পর নিস্তারিণী বা মোক্ষদার সর্ব্বদা তাঁহার কাছে বসিবার আবশ্যক হইত না, তাঁহারা একত্রে গঙ্গা-স্নানাদিতে গেলে ফুলকে স্বামীর শয্যা পার্শ্বে আসিয়া বসিতে হইত। ফুলের ভারি লজ্জা করিত, কিন্তু না আসিলে একে মাতা ও ননদের অনুযোগের ভয়, তার উপর পুরন ব্যঙ্গ করিয়া যথেচ্ছ নামকরণ করিত। ফুলরাণী, ফুলি, ফোলা, ফিলু, ফুলু! তাতেও বড় ক্ষতি ছিল না, কিন্তু আসিতে দেরী করিলে স্বামী যে অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে ঐ সব নামে ডাকিতেন, তাতে মা বা ঠাকুরঝি পাছে শোনে, এই ভয়টাই ফুলকুমারীর বেশী হইত। কাছে আসিয়া বসিলে

তাহার ক্ষুদ্র সুন্দর হাত দুখানি লইয়া পুরন্দর আপনার প্রকোষ্ঠে রাখিত, এবং ফুলের সঙ্গে গল্প করিবার চেষ্টা করিত। সহজে মুখ ফুটিত না। কালীর আর ছেলে বেলাকার গল্পই বেশী হইত। গল্পের সময় পুরন্দর আবার সেই ছেলে বেলাকার "পুরো" হইয়া বসিত—কখন ফুলের নাকটা ধরিয়া মৃদু দোলাইয়া দিত, কখন তাহার চুল লইয়া টানিত। কিন্তু তখনই কি ভাবিয়া আবার গম্ভীর হইত। সে গাম্ভীর্য্য এবং নিরানন্দ ফুলের ভাল লাগিত না। অপেক্ষাকৃত মুখ ফুটিলে ব্যস্ত হইয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিত, অসুখ করেছে কি না? পুরন কখন উত্তর দিত, কখন অন্য-মনস্ক হইত।

এইরূপে এই নব দম্পতির মধ্যে ধীরে ধীরে প্রেম সঞ্চার হইল। বাল্য প্রণয় বল কি প্রেম বল—যাহাই হউক, এইরূপে সংসার বন্ধনের যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ভিত্তি, তাহার প্রতিষ্ঠা হইল। পুরন্দরের মনে বিষাদের ভাব বড় প্রবল—পিতৃ মাতৃ বিয়োগের পর সে ভাব আরও দৃঢ় হইয়াছিল—কেন না ইহারই মধ্যে জীবনে অনেক শোক দুঃখ পাইতে হইল। অতএব বালিকা পত্নীর উন্মেষোন্মুখ মধুর হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া একরূপ বিষাদমাখা আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। ফুলকে দেখিতে, তাহার সঙ্গে ছেলে বেলাকার ছাই ভস্ম গল্প করিতে ভাল লাগিত। আবার যখন মনে হইত, সে অনিন্দ্য সুন্দর মূর্ত্তি, মধুর দিব্য সরল হৃদয় তাহার সংস্পর্শে যখন আসিয়াছে, তখন তাহার অনিবার্য্য পরিণাম কেবল দুঃখ, তখন ভারি অন্য-মনস্ক হইত।

নবদ্বীপে প্রায় একমাস কাটিয়া গেল। পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ পুরনকে সেই-খানেই সম্পন্ন করিতে হইল।

—*০*—

ঊনপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

—*০*—

ফলাহারপ্রিয় পাঠক পাঠিকার কাছে আমার একটা কৈফিয়ৎ দিবার আছে। শ্রাদ্ধটা না হয় নবদ্বীপেই হইল, কিন্তু তার পরের ব্যাপারটা? নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া বাড়ী আসিয়া পুরন্দর আত্মীয় কুটুম্ব, এবং "ইতরে জনাকে" ধুমধাম করিয়া খাওয়াইয়াছিল বই কি! কিন্তু এই সুসভ্য বার শত

নিরনব্বই সালের প্রথমে ওরফে উনিশ শতাব্দীর অন্তিমে, এই গুরু ভোজনে অপাক সুতরাং গুরুভোজীর নিগ্রহ দিনে, সে কথাটা তত বিশেষ করিয়া না-ই বলিলাম!

তা না-ই বলি, কিন্তু সত্যের খাতিরে বলিতে হইতেছে যে, কৃপণ বলিয়া স্বর্গীয় নায়েব মহাশয়ের যে কুখ্যাতি ছিল, এই মহোৎসবে লোকে তাহা ভুলিয়া গেল। কেন না, কাঙ্গালী বিদায়ের দিনে দীন দুঃখী যে আসিয়াছিল, স্বহস্তে পুরন্দর তাহাদের নববস্ত্র দান করিয়াছিল। সেই কাপড় পরিয়া পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিয়া অপরাহ্নে কাঙ্গালীরা দাতার জয়-গান করিতে করিতে গৃহে ফিরিল।

বাড়ী আসিয়া এই সকল কার্য্য শেষ করিয়া পুরন্দর পিতৃত্যক্ত বিষয় আশয় বুঝিয়া লইল। দেখিল বিস্তর টাকা ভয়ানক বেশী সুদে খাটিতেছে—তাহার জন্য অধমর্ণদের বিষয় আশয় বন্ধক আছে। সে সুদ কেহ দিয়া উঠিতে পারিত না, অতএব পরিণামে বিষয় উত্তমর্ণের হস্তগত হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। কূটবুদ্ধি বিষয়ী ঘোষ মহাশয় এইরূপ স্থল বুঝিয়া টাকা কর্জ্জ দিতেন। পুরন্দর এ সকলের প্রতিকার করিল—সুদের হার যথাসম্ভব কমাইয়া দিল। নিতান্ত "অসমর্থ পক্ষে" সম্পূর্ণ রেহাই দিল। ইহাতে অনেকগুলি ঘর রক্ষা হইল। রুগ্ন-শয্যায় পড়িয়া পড়িয়া পুরন্দর স্থির করিয়াছিল, এইরূপে যথাসম্ভব পিতার অধর্ম্মার্জ্জিত ধনের সদ্গতি করিবে। কার্য্যেও তাহা পরিণত করিল।

এই সকল সৎকার্য্যে সকলেই মন খুলিয়া পুরন্দরের সাধুবাদ করিত, কেবল পুরাতন ভৃত্য দুঃখীরাম ইহাতে বড় অসুখী। কিন্তু দুঃখীরাম পুরনকে চিনিত, মুখ ফুটিয়া কখন কিছু বলিতে সাহস করিত না। তবে বড় অসহ্য হইলে, "মোক্ষ দিদির" কাছে এক আধ দিন ইঙ্গিতে দুঃখ জানাইত। যে দিন পুরন বল্লভপুরের গোস্বামীদের নাবালক দুটিকে ঋণমুক্ত করিয়াছিল, সে দিন দুঃখীরাম দুঃখে আহার করিল না। মুখভার করিয়া মোক্ষদার কাছে গেল। বলিল, "দিদি ঠাক্‌রুণ, তোমার শ্বশুর বাড়ীতে শেষ কালটা কাটাতে চাই, একটু জায়গা যদি দাও। এখানে আর না!"

মোক্ষদা জানিতেন, পুরন্দর দুঃখীরামকে দেখিতে পারে না। তবে কুব্যবহার কিছু করিত না। কিন্তু তাহার ভার ভার মুখখানা দেখিয়া, আর তার কথা শুনিয়া তাঁর মনে হইল, হয় ত পুরু কোন অপমানের কথা

বলিয়াছে। প্রকাশ্যে দিদি বলিলেন—"কি হয়েছে দুঃখে দাদা! পুরু ত কিছু অন্যায় বলে নি? বলেই যদি থাকে, সেটা তুমি মনে করো না! ছেলে মানুষ, তোমার মানুষ করা!"

দুঃখী। ছোট বাবু আমায় দু-ঘা মেলেও আমার দুক্ষু নেই দিদি ঠাক্‌রুণ, কিন্তু বিষয়টা নিয়ে যে নক্‌ড়া ছক্‌ড়া কর্‌চেন, সেটা দেখ্‌তে পারি নে। কত দুক্ষের বিষয়—নায়েব মোশাইয়ের মুখে রক্ত ওঠা ধন, আমি ত সবই জানি গো দিদি ঠাক্‌রুণ। তা আমরা এখন হলাম পর। মাথার উপর কেউ নেই, তুমি কিছু বলো না, মাহুই-মা ত ভজন পূজোন নিয়েই আছেন। এর পর পথের ভিখিরী হতে হবে! হায় হায় পাগল আর কাকে বলে?

এই কথার পর মোক্ষদা দুঃখীরামের নালিশটা কি, একে একে সকল জানিয়া লইলেন। তাহার মুখে বর্ণনাটা যে রকম শুনিলেন, তাহাতে মোক্ষদার মনে হইল যে, সত্য সত্যই পুরু পিতার কষ্টার্জ্জিত ধনসম্পত্তি উড়াইতে বসিয়াছে। বড় উদ্বিগ্ন হইলেন। সেইদিন আহারের পর ভাই বোনে কথা হইল।

দিদি বলিলেন, "পুরু তুই নাকি দাতাকর্ণ হয়ে যাকে তাকে বিষয় ছেড়ে দিচ্ছিস্? তা আমাকে বুজি একবার জিজ্ঞেস্ কর্‌তেও নেই!"

দিদির কাছে পুরন্দরের সেই বাল্যভাবটা একেবারে লোপ পায় নাই। হাসিয়া বলিল—"দাতাকর্ণের দিদি ছিল না, তাই তোমায় বলিনি দিদি! কিন্তু বউ অবিশ্যি জানে, সে দিন ছেলে কেটে এক বুড়ো বামুনকে খাইয়েছি!"

কাজেই দিদি হাসিলেন—বউ কক্ষান্তরে বসিয়া শুনিতেছিল, সেও মনে মনে হাসিল।

তখন মোক্ষদা সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। পুরন্দরের সঙ্গে অনেক তর্ক বিতর্ক করিলেন। যে মহাভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ভাই আপনার স্বার্থ বলি দিয়াছিল, বোন্ সে উদারতার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। কাজেই পুরনকে শেষে বলিতে হইল, "দিদি বাবার শেষ কথা এই—অনেক পাপ করে ধন সঞ্চয় করেছি—পুরু যেন তার সদ্ব্যয় করে।"

দিদি আর কিছু বলিলেন না—চক্ষু ছল ছল হইল! সে দিন হইতে দুঃখীরাম তাঁহাকে কিছু বলিতে আসিলে, বলিতেন—"তা পুরু কি কর্‌বে দুখে দাদা—বাবার শেষ আজ্ঞাই ত পালন করেচে!"

-*০*-

পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

ফুলের কাছেই কালী শুনিয়াছিল, তার ভাবী স্বামী পুরন্দরের পরিচিত এবং পরম বন্ধু, অতএব পুরো দাদাকে এবার সেই যে প্রথম দিন দেখা দিয়াছিল, তারপর পলাইয়া পলাইয়া বেড়াইত। প্রথম দিন যখন সাক্ষাৎ হয়, তখনও পুরন্দর বড় দুর্ব্বল, তার উপর পিতৃ মাতৃ শোকচ্ছায়া তাহার সমগ্র মূর্ত্তিকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। দেখিয়া কালীর চোক ছল ছল করিতেছিল, পুরন্দর কেবল জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "কালী কেমন আছে?" কালী উত্তর দিতে পারে নাই—মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

ইহার পর পুরন্দর কতবার আগ্রহ করিত, কিন্তু কালী লজ্জায় তার সম্মুখে আসিত না। সে লুকাইয়া লুকাইয়া সইকে দেখিয়া যাইত—কখন্ আসিত কখন্ যাইত পুরন জানিতে পারিত না। ফুল হাসি তামাসা করিতে জানিত না, নহিলে সইয়ের উপর প্রতিশোধ লইবার দিব্য অবসর উপস্থিত। সে কথা বুঝিয়া কালীও হাসিত।

সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সঙ্গে ব্রজনাথ সম্বন্ধে পুরন্দরের অনেক কথা হইল। পুরন সংস্কৃত শিখিয়াছে দেখিয়াও সার্ব্বভৌম বড় সুখী হইলেন এবং অবসর মত তাহাকে দর্শন শাস্ত্রের পাঠ দিতে স্বীকার করিলেন। স্থির হইল অগ্রহায়ণ মাসে কালীর বিবাহ হইবে।

পুরন্দরের দিন একরূপ সুখে কাটিতে লাগিল। তাহার প্রবল এবং সুমার্জ্জিত জ্ঞানতৃষ্ণা সর্ব্বত্র তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু—অধ্যাপক পণ্ডিত এবং মৌলভীগণ সন্ধান পাইয়া পরিমললোভী মধুকরবৎ দলে দলে আসিয়া জুটিতে লাগিলেন। এইরূপে আশ্বিন মাস আসিল।

শারদীয়া পূজার কিছু পূর্ব্বে পুরন্দর পিতার মনিব বাড়ীর এক চিঠি পাইলেন, বড় বাবু লিখিতেছেন—"তোমার পিতৃবিয়োগের পর হইতে পরগণা একরূপ খালি আছে। কার্য্য ক্ষতি হইতেছে। পূজার পর তুমি পরগণায় গিয়া পিতৃ কার্য্য গ্রহণ করিবে। হিসাব নিকাশ অনেক কাল হয় নাই—তাহারও ব্যবস্থা হওয়া চাই।"

ইহার পর শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী একদিন পুরন্দরকে ডাকিয়া বলিলেন—ঈশ্ব-

রেচ্ছায় তুমি জ্ঞানবান এবং ধার্ম্মিক হয়েছ। আমার বরাবর সাধ ছিল, তুমি মানুষ হলে ফুলকে তোমার কাছে রেখে আমি একবার তীর্থদর্শনে যাব। সে দিন এসেছে, বিজয়া দশমীর পর আমি যাত্রা করিব, স্থির করেছি। তোমার শ্বশুরের যা কিছু আছে, সকল বুঝে লও—যদিই আমি না ফির্‌তে পারি!"

পুরন বৈষয়িক পরামর্শ কাহারও সহিত বড় করিত না, মাঝে মাঝে দুই একটা কথা শাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা করিত। বড় বাবুর চিঠির কথা পাড়িল। শুনিয়া নিস্তারিণী বলিলেন, "চাকরী করা আর কর্ত্তব্য হয় না। ঈশ্বরেচ্ছায় তোমার পিতার এবং শ্বশুরের যা আছে, তাই তোমার যথেষ্ট। তবে হিসাব নিকাশ করা উচিত বটে। সেই কথা তুমি উত্তরে লিখে দাও।"

পুরন্দর তখন আর বড় বাবুর পত্রোত্তর দিল না বটে, কিন্তু মনে মনে শাশুড়ীর পরামর্শই ঠিক্ বলিয়া বুঝিল।

একপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে পূজা আসিল। সুজলা শস্য-শ্যামলা বাঙ্গলার পূর্ণপরিণতি শরতে—দুর্গোৎসব সেই মহা সৌন্দর্য্যের উৎসব। শ্রাবণের আবিল জল স্বচ্ছ হইয়াছে, ঘনাচ্ছন্ন আকাশ উজ্জ্বল নীলে নক্ষত্র হার পরিয়াছে, জলে কুমুদ কহ্লার কোকনদ, স্থলে শেফালিকা মৃদু সমীর এবং মধুর জ্যোৎস্না স্পর্শে ফুটিয়া ফুটিয়া শষ্পশয্যায় ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। ঘনশ্যাম ধান্য-ক্ষেত্রে অনন্ত তরঙ্গায়িত হরিৎসৌন্দর্য্যের মেলা—গ্রামে গ্রামে রসনচৌকীতে ললিত রাগিণী উথলিয়া উঠিতেছে। এমন দিনে বাৎসল্যের, স্নেহের, প্রেমের বাঁশী যদি মনুষ্য-হৃদয়ে না বাজিবে, তবে আর বাজিবে কবে? তাই প্রবাসী সম্বৎসর পরে আবেশে গৃহে ছুটিয়া আসিতেছে।

নায়েব মহাশয়ের গৃহে প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব হইয়া থাকে—এবারও হইল। লোকে ভাবিয়াছিল, পুরন্দর এবার বেশী জাঁকজমক করিবেন, কিন্তু তাহার কিছুই হইল না। শোকের নিরানন্দের গৃহে যেমন পূজা হইয়া থাকে—তেমনি হইল। মোক্ষদা পূজার কয়টা দিন কাঁদিয়াই কাটাইলেন,

পুরন্দরেরও মন ভাল ছিল না। এ সকলের উপর মাতার তীর্থ-যাত্রার দিন আসন্ন জানিয়া, ফুলও বড় বিমর্ষ ছিল। কালীর হাসিখুসী এবং ব্যঙ্গ বিদ্রূপেও তাহার মনের আঁধার কাটিল না। পুরন আদর করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, "কি জানি কেন মনে হচ্চে, আর মার সঙ্গে দেখা হবে না!"

বিজয়ার নিশি-শেষে নিস্তারিণী নৌকা পথে তীর্থ-যাত্রা করিলেন। দেশের নানা স্থান হইতে অনেক যাত্রী তাঁহার সঙ্গে গেল। পাঁচ ছয় খানি নৌকা একত্রে চলিল।

সে দিন নিস্তারিণী কন্যা জামাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। গভীর রাত্রে উভয়কে আপনার আহ্নিকের ঘরে লইয়া গেলেন। যে ক্ষুদ্র প্রস্তর বেদীর উপর স্বামীর খড়ম রাখিতেন, দেখা গেল, তাহার এক খানি বড় পাথর, ইচ্ছামত স্থানান্তরিত হইতে পারে। পাথর সরাইয়া বর্ত্তিকালোক-সহায়ে নিস্তারিণী গৃহ হর্ম্ম্যতলস্থ গুপ্তদ্বারপথে কন্যা জামাতাকে এক বিজন প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন। পুরন্দর বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, গৃহটি মাটির নীচে হইলেও নির্ম্মাণ-কৌশলে তথায় বায়ু চলাচলের বেশ ব্যবস্থা আছে। নিস্তারিণী দৃঢ় হস্তে কন্যা জামাতা সম্মুখে স্বামীর কষ্টার্জ্জিত ধনরাশি উন্মুক্ত করিলেন। কষ্টে অশ্রুপ্রবাহ রোধ করিয়া, উভয়কে সম্বোধন করিয়া বলি-লেন, "এ সব তোমাদের। অতি যত্নে আজ চৌদ্দ বৎসর বুকে করে রেখেছি, নিজে কখন ইহাতে হাত দিই নাই। আমি হয় ত আর ফির্‌ব না। তোমরা এর সদ্ব্যয় করো। উপার্জ্জক যিনি, আমায় তিনি সে ভার দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর কষ্টের ধন, আমি প্রাণ ধরে খরচ কর্‌তে পারি নি।" তখন মাতা কন্যা জামাতাকে সেই গুপ্ত প্রস্তরদ্বারের আবরণ ও উন্মোচন প্রণালী দেখাইয়া দিলেন।

ফুল মার বুকে মাথা রাখিয়া দিনমান কাঁদিয়াছিল। মাতা সান্ত্বনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "বিধাতার ইচ্ছায় তুমি গুণবান ধার্ম্মিক পতি লাভ করেছ। নারী জন্মে এর বাড়া আর ভাগ্য নেই। কখন তাঁর অন্যথাচরণ করো না। শোকে দুঃখে কখন অভিভূত হইও না। বাপ মা, কারু চিরদিন থাকে না।"

তার পর একমাত্র কন্যার মায়া ভুলিয়া নিস্তারিণী গৃহ ত্যাগ করিয়া গেলেন। ইহসংসারে কেবল একটি পদার্থের মায়া কখন ভুলিতে পারেন নাই—স্বামীর ত্যক্ত খড়ম জোড়াটি! সযত্নে সাধ্বী দেবশীলবৎ তাহা সঙ্গে লইয়া গেলেন।

দ্বিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

পূজার পর পুরন্দর বড় বাবুর আর এক চিঠি পাইলেন। তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত যে, তাঁহার বিশ্বাস স্বর্গীয় নায়েব মহাশয় পরগণার বিস্তর তহবিল তছরূপাত করিয়া গিয়াছেন। অতএব পুরন্দর যদি চাকরী না করেন, পিতার হিসাব নিকাশ করিতে তিনি বাধ্য।

বৃদ্ধ পুরোহিত হারাধন শর্ম্মা পত্র দেখিয়া বলিলেন, "বাবুদের অভিসন্ধি ভাল নহে। লইয়া গিয়া তোমাকে বিপদগ্রস্ত করা তাঁহাদের মতলব। নায়েব মহাশয় তহবিল ভাঙ্গিয়া থাকেন, তার মোকদ্দমা হউক। তখন জবাব দিও।" পুরন্দর এ পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিলেন না। যাঁহাদের অন্নে পিতা চিরদিন প্রতিপালিত, সহসা তাঁহাদের সহিত অকৌশল করা, তাঁহার মতে অতি গর্হিত কার্য্য। বিশেষ পিতা যে বৈধ উপায়ে সম্পত্তি অর্জ্জন করেন নাই, এবং সেই অর্থে তিনি নিজে জীবন ধারণ করিতেছেন, ইহা ভাবিতে মাঝে মাঝে পুরন্দরের অনুশোচনা উপস্থিত হইত। হিসাব নিকাশ উপলক্ষে যদি অধর্ম্মের সে ঋণ কতক শোধ হয়, তবে সে মন্দ কি? পুরন যাওয়াই স্থির করিলেন।

ফুলকে ছাড়িয়া যাইতে বড় কষ্ট বোধ হইল। পুরন্দর আত্মদর্শী, অল্প বয়সেই শোক দুঃখের কঠোর শিক্ষায় আত্ম-সংযমী—কিন্তু ফুল? মাতৃবক্ষ-চ্যুত বিহঙ্গশাবকের মত তাহার অসহায়াবস্থা! বিদায়ের রাত্রে স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া ফুল কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিল—"আমায় সঙ্গে নিয়ে চল। মা গিয়েছেন, তাঁকে আর জন্মের মত দেখ্‌তে পাব না—তোমারও সঙ্গে আর বুঝি দেখা হবে না!" স্বামী সান্ত্বনা করিয়া বুঝাইয়াছিলেন, সবাই ত প্রবাসে যায়, আমি আবার শীঘ্র আস্‌ব। ফুল চক্ষের জল মুছিয়া উত্তর করিয়াছিল, "কেন জানি নে, মনে বল্‌চে যে আর কারু সঙ্গে আমার দেখা হবে না!"

বাটীর ও শ্বশুরালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য পুরন্দর যথোচিত বন্দোবস্ত করিলেন। সার্ব্বভৌম মহাশয় প্রতিবাসী—শ্বশুরবাড়ীর ভার প্রধানতঃ তাঁহার হাতে রহিল। বাবু যাইতেছেন শুনিয়া কিছু একটা মনে করিয়া

দুঃখীরাম সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু পুরন ইহাতে অমত করিলেন। তাহাতে অভিমান করিয়া দুঃখী দিদি ঠাকুরাণীর দ্বারা জানাইল, তাহাকে কিছু বৃত্তি দিয়া শেষ বয়সে বিদায় দেওয়া হউক। পুরন্দর ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া যা হয় করিবেন। দুঃখীরামের ভাব তখন কেহ বুঝিতে পারে নাই। ঊর্ণনাভবৎ সে মনে মনে গভীর অভিসন্ধির জাল বুনিতেছিল।

ত্রিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

নিসিন্দা পরগণার জমীদার বাবুদের বাড়ী রাজধানী মুর্শিদাবাদ হইতে এক দিনের পথ, পৌঁছিতে পুরন্দরের পূরা দেড় দিন লাগিল। ইদানীং পিতার কাছে পুরন মাঝে মাঝে মনিববাড়ীর অতুল ঐশ্বর্য্যের গল্প শুনিতেন,—বাবুর পিতামহ কেমন ছলে বলে কৌশলে প্রথমে সম্পত্তি অর্জ্জন করেন, তার পর তাঁর পিতা লাঠির জোরে কেমন তাহার উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন, এ সকল কাহিনী ঘোষ মহাশয় ভালরূপ জানিতেন এবং বলিতে ভাল বাসিতেন। কনকপুরের প্রশস্ত পরিখাবেষ্টিত সিংহদ্বারী-প্রাসাদ, তার ফলে ফুলে পূর্ণ উদ্যান সকল, হস্তী ঘোটক অগণিত ভৃত্যাদির যে উজ্জ্বল চিত্র পিতা পুত্রের নবীন কল্পনা পথে ধরিতেন, তাহাতে তাহার মনে একটা অলকাপুরীর ছায়া পড়িত। কিন্তু এখন প্রত্যক্ষ দেখিয়া কিছুই তেমন নূতন মনে হইল না। আমাদের প্রথম বয়সের সে শ্যাম সুন্দর স্বপ্নময় স্মৃতি ক্রমে কার্য্য কারণ সম্বদ্ধ কঠোর পীত সাংসারিকতায় পরিণত হইয়া আসে, সুখ দুঃখের "মাপকাটির" একটা অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটে। দেখিয়া শুনিয়া পুরন্দর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

নায়েব মহাশয়ের পরিচিত আমলা এবং ভৃত্যগণ প্রায় সকলেই পুরন্দরকে দেখিতে আসিল। যাহারা ছেলে বেলায় বালক পুরনকে এক আধ বার দেখিয়াছিল, তাহারা আজ্ তাঁকে যুবা দেখিয়া কত বিস্ময় প্রকাশ করিল—যেন প্রকৃতিরাজ্যের আইনে একটা কিছু "খেলাপ" ঘটিয়াছে, এবং

তাহাদের নিজের জীবনে এমনতর পরিবর্ত্তন কখন হয় নাই! নায়েব মহাশয়ের সমবয়স্ক এবং সহযোগী আমলাদের বিস্ময় মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিল—কেন না, ঘোষ মহাশয়ের যৌবনকাল তাঁহাদের বেশ মনে পড়িতেছিল।

দেওয়ান হলধর বসু নূতন লোক, নায়েব মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার জানা শুনা ছিল না, তাঁহার সঙ্গে পুরন্দর সাক্ষাৎ করিলেন। বসু মহাশয় বঙ্গজ কায়স্থ এবং জবরদস্ত লোক—তাঁহার দীর্ঘ-গুম্ফ এবং রক্তবর্ণ চক্ষুর্দ্বয়ে কাজ-হাসিলোপযোগী একটা শক্তি ছিল। দেওয়ান মহাশয় প্রজার যম হইয়া আসিয়াছিলেন—বছর খানেকের মধ্যে এক বাজে আদায়েই বিস্তর মুনাফা মনিবকে দেখাইয়া দেন। কাজেই জমীদার সংসারে তাঁর প্রতাপ অপ্রতিহত। বড় বাবু মৃত নায়েব মহাশয়কে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন, তিনি তহবিল ভাঙ্গিয়া গিয়াছেন, এ কথা বিশ্বাস করেন নাই। কিন্তু দেওয়ানজী সে কথা উঠান, অতএব দ্বিরুক্তি না করিয়া পুরন্দরের প্রতি যে চিঠি জারি হয়, তাহাতে দস্তখত করিয়াছিলেন।

নায়েব মহাশয়ের স্বপক্ষ আমলাবর্গ এ কথা জানিতেন। তাঁহারা দেওয়ানজীর জ্বালায় অস্থির হইয়াছিলেন—কিন্তু তথাপি মনসা দেবী নমোঽস্তুতে! পুরন্দরকে তাঁহারা পরামর্শ দিলেন, দেওয়ানটাকে কোন রকমে যদি হাত করিতে পারেন, তবে আর হিসাব নিকাশের দায় থাকে না। সংসারানভিজ্ঞ ধর্ম্মভীত যুবক সে কথা ভাল বুঝিল না, তবে দেওয়ানজীর সঙ্গে দেখা করিতে রাজি হইল।

প্রথম সাক্ষাতেই হলধর বসু পুরন্দরের সঙ্গে চিরপরিচিত "তাঁবেদার"-বৎ আচরণ করিয়া বসিলেন। পুরন্দর যে নিজে নায়েব নহে, মৃত নায়েবের পুত্র মাত্র, অতএব তাঁহার এক্তিয়ারের বাহির, তিন তিনটা পরগণার সরদার দেওয়ানজীর এমন ধারণা ছিল না। বৃদ্ধ পেস্‌কার বাবু পরিচয় দিয়া যেমন বলিলেন "ইনিই পুরন্দর!", অমনি দেওয়ান তাঁহার গুম্ফ কম্পিত করিয়া পুরনের দিকে জবা চক্ষু দুটি উঠাইয়া বলিয়া বসিলেন, "কেমন আক্কেল হে তোমার! পরগণায় না গিয়ে চার চার মাস বাড়ী বসে আছ, চিঠি লিখ্‌লে জবাব দাও না, আদায় তহশীল সব বন্ধ!—তুমি মানুষ না—

পুরন্দর অবাক্ হইয়া লোকটার বিচিত্র চরিত্র দেখিতেছিলেন, কিন্তু বাড়াবাড়ি দেখিয়া দৃপ্তভাবে অথচ সহাস্য মুখে উত্তর করিলেন,

"না মহাশয়, আপনার ভ্রম হয়েছে! আমি নায়েব নই, এবং নায়েবি-গ্রহণের প্রয়াসীও নই!"

আর কেহ হইলে এ উত্তরে অপ্রতিভ এবং নিরুত্তর হইত, কিন্তু আমাদের দেওয়ান মহাশয় ইহাতে আরো উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন,

"নায়েব নও, নায়েবের বেটা ত বটে! বিষয় আশয় সব ত এখান থেকেই হে!"

পু। তা হতে পারে, এবং তাই সত্য। কিন্তু আমার সঙ্গে মহাশয়ের এরূপ অযাচিত আচরণ ভদ্রতাবিরুদ্ধ।

দেওয়ানজীর এটা অসহ্য হইল। পাকে প্রকারে একটা ছোঁড়া কি না তাঁহাকে অভদ্র বলিতে সাহস করে! ধৈর্য্য হারাইয়া স্থান কাল পাত্র ভুলিয়া দেওয়ান হাঁকিলেন, "চুপ রও।"

পুরন মৃদু হাসিলেন। দাঁড়াইয়াছিলেন, বসিতে প্রবৃত্তি হয় নাই। "ওহো তুমি লাঙ্গল ছেড়ে দেওয়ানী কর্‌তে এসেছ বটে" বলিয়া ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ় পদে সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

চতুঃপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

বড় বাবুর সঙ্গে সহজে কাহারও দেখা হয় না। উপর্য্যুপরি সাত দিনের নিয়মিত দ্বৌকালীন এত্তেলার পর পুরন্দর শুনিলেন, আগামী বুধবারের দরবারে তাঁহার হাজিরি হইবে।

শুভ বুধবাসরের প্রতীক্ষায় কোনরূপে পুরনের ছয়টা দিন কাটিল। এ কয়টা দিন জীবন-স্রোত তেমন মৃদু মধুর বহে নাই। বাড়ীর জন্য একটা উৎকণ্ঠা ত ছিলই, তার উপর দেওয়ানজীর সঙ্গে কথান্তর হওয়ার জেরটুকু দিনের পর দিন নানাসূত্রে বাড়িয়া চলিয়াছিল। দেওয়ানজীর শত্রুসংখ্যা অগণিত এবং মিত্র তেমন না থাকিলেও, তাঁহার অনুগ্রহপ্রার্থী খোসামুদের অসদ্ভাব ছিল না। রাজদরবারে যেমন হইয়া থাকে, এই অদ্ভুত জীবের দল উভয় পক্ষেরই চরস্বরূপ, এবং দুই দলে ঝগড়া লাগাইয়া দিয়া তাহারা বিলক্ষণ এক হাত খেলিয়া লয়। পুরনকে তাহারা প্রাতে সন্ধ্যায় অযাচিত বিস্তর

খবর আনিয়া দিত—দেওয়ানজী শপথ করিয়াছেন, তাহার ভিটা মাটি উচ্ছেদ করিবেন, নিকাশের দায়ে সাত সমুদ্রের জল খাওয়াইবেন, ইত্যাদি। কেহ আসিয়া বলিল, বড় বাবু রোজ তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে চান, কিন্তু দেওয়ানের কৌশলে সে খবর তাঁর কাছে পৌঁছে না। কেহ বলিল, বিলাসপুরের আমলাদিগের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া নায়েব মহাশয়ের আমলের কাগজপত্র দেওয়ানজী বদলাইবার ফিকিরে আছেন। উত্তরে পুরন কখন ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিতেন, কখন বলিতেন, "নারায়ণের যা ইচ্ছা তাই হবে!" কখন কেবল নীরবে শুনিয়া যাইতেন, কোন উত্তর দিতেন না। অথচ তাঁহার নামে বিস্তর অহঙ্কার তাচ্ছিল্যের কথা দেওয়ানজীর কাছে আরোপিত হইত। হলধর বসু ক্রমে ইহাতে ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিতেছিলেন—পুরন্দরকে এক চোটে পাইলে দ্বিতীয় চোটের অপেক্ষা করেন না।

ক্রমে বুধবারের প্রভাত আসিল, রক্তিম সূর্য্য ক্রমে সুবর্ণোজ্জ্বল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। প্রহর উত্তীর্ণ হইল, দেড় প্রহরও যায় যায়, আশার উৎকণ্ঠায় পুরন্দর দরবারের পোষাক আঁটিয়া বাসায় বসিয়া আছেন, ক্রমে বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন—এমন সময়ে গজকচ্ছপগতি সুবর্ণ-দণ্ডধারী চোপদারজী আসিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে সেলাম করিল। পূর্ব্বে কখন দেখা সাক্ষাৎ না থাকিলেও চোপদার চিরপরিচিতের ন্যায় বাবুর স্বাগত কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিল। মৃত নায়েব সাহেবের বিরহজনিত অসহ্য দুঃখ ও তাহার জন্য তাহার বার্ষিক মারা যাওয়ার কথাটা একটু বিস্তৃত করিয়া বলিবার জন্য চোপদারজী বেলা দেড় প্রহরের পরও কোন্ আর এক দণ্ড পুরন্দরের কাছে না বসিত, কিন্তু বেগতিক দেখিয়া নায়েবপুত্র সহসা উঠিয়া পড়িলেন। আর বসা হইল না। রাস্তায় যাইতে যাইতে তথাপি চোপদার বড় বাবুর "আমিরীর" দুইটা গল্প না করিয়া ছাড়িল না। শুনিয়া পুরন্দর বুঝিলেন যে, জন্মে বড় বাবু কখন সূর্য্যোদয় দেখেন নাই, এবং অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত অহিফেনধূম সেবন করার অভ্যাস থাকায়, বেলা পাঁচ দণ্ডের পর নিদ্রা ভঙ্গ হইলে সক্ষীর চিপীটকভোজনে তাঁহাকে কণ্ঠনালীর শুষ্ক জড়তা নিবারণ করিতে হয়।

দরবারগৃহে তাকিয়া বেষ্টিত উচ্চ মসনদে জমীদার রামলোচন রায় ওরফে কনকপুরের বড় বাবু বসিয়াছেন। কুণ্ডলীকৃত আলবোলা সুবর্ণমণ্ডিত ওষ্ঠাগ্র বাড়াইয়া আছে—তাহার সাগ্নিক শিরোদেশ হইতে স্নিগ্ধ কোমল

সুরভি ধূম উদ্গীর্ণ হইতেছে। বাবু বড় চাহিয়া দেখেন না, বালক ভৃত্য তাঁহার মুখের উপর চামর ব্যজন করিতেছে। দুই দিকে দুই বৃহৎ হাত পাখা চলিতেছে। আসা শোটা কোমর-বন্দ লইয়া নকীব চোপদার সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছে—আমলাগণ নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিয়া আছেন, রাইয়তেরা ভিতরে বাহিরে যেখানে স্থান পাইয়াছে, কেহ কৌতূহল নিবারণের জন্য, কেহ বা নিজের কাজের অনুরোধে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বাবুর উন্নত আসনের ঠিক নীচে, তাঁহারই মত অর্দ্ধ বিকসিত নেত্রে মোসাহেবের দল বসিয়াছে, কাছে কাছে নর্ত্তকীগণ এবং অনতিদূরে তৈলোজ্জ্বলললাট শিখা-ধারী ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের দল।

কনকপুরের দরবার অনেকটা মুর্শিদাবাদের ক্ষুদ্র সংস্করণ—সান্নিধ্যবশতঃ আদব কায়দাটা অন্ততঃ একই ধরণের। পুরন্দর দরবারে প্রবেশ করিবা-মাত্র নকীব তাঁহার হাজিরি জানাইল। তার পর আগন্তুকের পালা। "কুর্ণিস্" করিতে করিতে আদেশ হইলে বসিবার নিয়ম। পিতৃ প্রভুর প্রতি যথারীতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া, পুরন্দর একেবারে নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিলেন—দেওয়ান মুৎসুদ্দির দিকে দৃক্‌পাতও করিলেন না। ধীর দৃঢ়পদে চিরাভ্যস্তের মত যে ভাবে পুরন সেই অপরিচিত দরবারের মধ্য দিয়া চলিয়া গেলেন, তাহাতে সকলেই তাঁহার প্রতি বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া রহিল। কেবল দেওয়ানজী অস্ফুট স্বরে হাঁকিলেন—"বেয়াদব।"

কথাটা পুরন্দরের কানে গেল। অপেক্ষাকৃত উচ্চ কণ্ঠে পেস্‌কার মহা-শয়কে লক্ষ্য করিয়া তিনিও উত্তর গাহিয়া রাখিলেন—"আগন্তুক ভদ্রলোককে আপন গৃহে পেয়ে যে অপমান করে, তার কাছে আদব শেখবার স্থল নহে।" পেস্‌কার একটু অপ্রতিভ হইয়া দেওয়ানজীর মন রাখিবার জন্য বলিলেন, "দেওয়ান মনিবের প্রতিনিধি, তাঁরও সম্মান করা কর্ত্তব্য।" পুরন ব্যঙ্গমিশ্রিত হাস্যের সহিত উত্তর করিলেন, "সে প্রথা উমেদারের। আমার উদ্দেশ্য, পিতৃপ্রভুর সন্দর্শনমাত্র।"

কথা গুলা মৃদুস্বরে হইলেও, কতক শুনিয়া কতক বা ইঙ্গিতে বুঝিয়া, বড় বাবু সকলই হৃদয়ঙ্গম করিলেন। পুরন্দরের প্রতি আদেশ হইল, রাত্রে বৈঠকখানায় আবার সাক্ষাৎ হইবে।

পঞ্চপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

জমীদার রামলোচন রায় যে ছাঁচের লোক, এক কালে এদেশে তাহার অসদ্ভাব ছিল না। তাঁহাদের চরিত্রে সময়োপযোগী কিছু কিছু "আয়েব" থাকিলেও, তাঁহারা বড় অনুগত প্রতিপালক এবং সাধারণতঃ দয়ালু ছিলেন। রামলোচন কাজ কর্ম্ম এবং ফের ফাঁপর বড় বুঝিতেন না, বিষয় আশয়ের ভার দেওয়ান মুৎসুদ্দির উপর দিয়া নিজের আরাম এবং খেয়াল লইয়া থাকিতেন। কিন্তু কাহারও উপর কোনরূপ অত্যাচার হইতেছে বুঝিতে পারিলে আপনা হইতেই তাহার প্রতীকার করিতেন। বড় বাবুর যে "গরিবের মা বাপ" বলিয়া তত নাম ডাক, সে কেবল ইহারই জন্য।

পুরন্দরে আর দেওয়ানজীতে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে হইলেও তাহা বড় বাবুর কর্ণকুহর পর্য্যন্ত পৌঁছিতেছিল। বিশেষ দেওয়ান এই তেজস্বী যুবা পুরুষের সহিত আপন বাসায় যে অভদ্রাচরণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। ঘটনার দিন সন্ধ্যাকালে সে গল্প শাখা পল্লবিত হইয়া মোসাহেব মহাশয়দের মুখে মুখে বড় বাবুর শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। মনে মনে তিনি হলধর বসুর প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না, কিন্তু বসুজা খুব কাজের লোক, জমীদারী শাসনে সিদ্ধহস্ত বলিলে হয়, কাজেই বাহিরে খাতির না দেখাইলে চলিত না। দরবারে দেওয়ান-জীকে পুরন্দরের কাছে নাস্তানাবুদ হইতে দেখিয়া, সমোসাহেব বাবু যথেষ্ট আমোদিত হইয়াছিলেন।

সন্ধ্যার পর বাবু নায়েবপুত্রকে বৈঠকখানায় আহ্বান করিলেন দেখিয়া, কূটবুদ্ধি বসুজা কিছু সশঙ্কিত হইলেন। বাবুর যেরূপ মেজাজ, হয় ত ছোঁড়া-টার কথায় ভুলিয়া তাহাকে বিদায় দিবেন। তাহা হইলে তাঁহার অভি-সন্ধি ফাঁসিয়া যাইবে, এবং অপমানের প্রতিশোধ হইবে না। ইহা ভাবিয়া দেওয়ানপ্রবর অপরাহ্ণে মনিবসন্দর্শনে চলিলেন।

অন্যান্য কথার পর বসুজা মনিবকে জানাইলেন যে, যদিও নিসিন্দার মৃত নায়েব কত টাকা তছ্‌রূপাত করিয়াছে সহসা জানিবার উপায় নাই, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস বিস্তর টাকা সে লইয়াছিল। তিনি শুনিয়াছেন, বিস্তর

বিষয় আশয় সে ব্যক্তি করিয়া গিয়াছে। মনিবের সর্ব্বনাশ না করিলে কেমন করিয়া এ সব হয়!

বাবু বলিলেন—"আমি বুঝেছিলেম, তোমার সন্দেহের বিশেষ কোন কারণ আছে। কিন্তু তুমি যা এখন বল্‌চ, তাতে বেশ বোধ হচ্ছে, তোমার সন্দেহ অনুমান-মূলক। নায়েব নেমকহারাম ছিল না—আমি তাকে ভাল করে জান্‌তেম।"

দেওয়ানজী মনিবের কাছে একটু অপ্রস্তুত হইলেন। আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন—"হিসাব নিকাশ হলেই হুজুরের প্রতীতি হবে। আর পরগণা বিদ্রোহী হয়েছে—আমার শুনা আছে, নায়েবপুত্রের উপর প্রজাদের বড় বিশ্বাস, এই ছোকরা অল্পবয়স্ক হলেও এর দ্বারা বিদ্রোহ শান্তি হবে। একে নায়েব করে পাঠান হোক্।"

বড় বাবু দেওয়ানজীর অভিসন্ধিটা বুঝিলেন। অন্য ক্ষেত্রে হয় ত বুঝিতেন না, কিন্তু পুরন্দরের প্রতি দেওয়ানের অভদ্র ব্যবহারে চটিয়া গিয়াছিলেন—দর্পণবৎ তাহার হৃদয় দেখিলেন। হিসাব নিকাশের ছল করিয়া নায়েবপুত্রকে বাটী হইতে আনা হইয়াছে, এবং ছল বল কৌশলে তাহাকে পিতৃকার্য্য গ্রহণ করান বসুজার উদ্দেশ্য, মনে ইহা প্রতিভাত হইবামাত্র তিনি ঘৃণায় রোষে ভ্রূভঙ্গ করিলেন। অনেকক্ষণ দেওয়ানজীর সঙ্গে কথা কহিলেন না। হলধর প্রমাদ গণিলেন। প্রভুর প্রসাদলাভাকাঙ্ক্ষায় করযোড়ে নিবেদন করিলেন,

"ধর্ম্মাবতার বোধ করি অধীনের প্রতি রুষ্ট হয়েচেন। সরকারের সকল রকমে সুবিধে যাতে হয়, দিবা রাত্রি আমার সেই চেষ্টা। কিছু কল কৌশল না করলে জমিদারী রক্ষা হয় না।"

কিঞ্চিৎ উগ্রস্বরে বাবু বলিলেন—"আমার নামে এমন সব কল কৌশল করে আশ্রিত অনুগতদের কষ্ট দেওয়া আর জমিদারী রক্ষা করা এক কথা নয়। এই সংসারের কাজের জন্যেই বেচারী প্রাণে মারা গেছে, আজ্ কোথায় তার ছেলে পুলের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা হবে, না তাদের সামান্য সম্পত্তিটুকু কেড়ে নেওয়ার জন্য কল কৌশল! এমন অধর্ম্ম আমার সংসারে যেন না ঢোকে বসুজা!"

বসুজা দেখিলেন, আর বাড়াবাড়িতে তাঁর চাকরী লইয়া টানাটানি পড়িতে পারে। অতএব অন্য দিনের চেয়ে অধিকতর নতজানু হইয়া প্রভুকে বন্দনা করিলেন। তার পর বিদায় হইলেন।

ষট্‌পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

দেওয়ানজী পুরন্দরের অনিষ্ট করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু ফলে মহা উপকার করিয়া গেলেন। বড় বাবুর দেওয়ানের কাছে যে চক্ষুলজ্জা ছিল, অপরাহ্নের ঘটনায় তাহা দূর হইল। অতএব রাত্রে তিনি পুরন্দরকে মহা সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন।

ঘটনাপরম্পরায় কনকপুরের দরবারে কয় দিন মধ্যেই পুরন্দর বেশ পরিচিত হইয়াছিলেন। দেশী দরবার সকল কোন কালে তেজস্বিতা এবং স্পষ্টবাদিতার লীলাক্ষেত্র নহে—এখনও যে নয়, তাহা সে দিন ইঙ্গিতে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহা না হইলেও মনুষ্য হৃদয়ের উপর তাহার একটা মোহিনী শক্তি সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র অবিসম্বাদিত। পুরনের প্রতি সহজেই লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। রামলোচন রায় দরবারস্থ নানা প্রকৃতির লোকের কাছে পুরন্দর সম্বন্ধে অনেক প্রকারের গল্প শুনিয়া বুঝিলেন, অল্প বয়সেই নায়েবপুত্র দিব্য উপযুক্ত হইয়াছে।

দরবারগৃহে পুরন্দরের যে তেজোগর্ব্ব মূর্ত্তি দেখা গিয়াছিল, গৃহে বড় বাবু তাহার কিছুই দেখিলেন না। তাহার বিনয়-মধুর সরল, উদার বালকবৎ আচরণ তাঁহাকে মুগ্ধ করিল। রামলোচন তাঁহার অনুগৃহীত মৃত নায়েবকে স্মরণ করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিলেন—"আজ্ যদি মহেশ্বর জীবিত থেকে তোমায় আমার কাছে নিয়ে আস্‌তেন, তবে কি সুখের হত! তাঁর সে ইচ্ছাও ছিল, ভগবান পূর্ণ করলেন না। তোমায় দেখে বাপু আমার বড় আহ্লাদ হয়েচে। তোমার পিতা আমার অনেক দিনের বিশ্বাসী কর্ম্মচারী, এই সংসারের জন্য তিনি প্রাণ হারিয়েচেন ভাবিতে আমার বড় কষ্ট হয়। আমার ইচ্ছা, তুমি চাকরী গ্রহণ কর!"

রামলোচন রায়ের কণ্ঠ উচ্ছ্বাসপূর্ণ—প্রতি কথায় একটা মমতার আগ্রহ প্রকাশ পাইতেছিল। চাকরীর কোন প্রস্তাব উঠিলে অচিরে তাহা প্রত্যাখ্যান করিবেন বলিয়াই পুরন প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু বড় বাবুর কথায় তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল। সহসা কোন উত্তর করিতে পারিলেন না—নীরবে ভাবিতে লাগিলেন।

বড় বাবু ভাবিলেন অন্যরূপ। তিনি সহজেই ভাবিলেন, দেওয়ানের কুব্যবহারে ব্যথিত হইয়া পুরন্দর তাঁহার অধীনে কাজ করিতে অসম্মত। অতএব কোন উত্তর না পাইয়াও তিনি আবার বলিলেন,

"তোমার পিতার কাজ তুমি গ্রহণ না-ই করলে! এমন কাজ আমি তোমায় দিব, যাতে তুমি এখন আপন এক্তিয়ারে কাজ কর্ম্ম করতে পার। তার পর তুমি ঈশ্বরেচ্ছায় যেরূপ উপযুক্ত হয়েচ, আমার বিশ্বাস, কালে তুমি এই সংসারের প্রধান কর্ম্মচারী হতে পারবে!"

পুরন্দর উত্তর করিলেন—"আমরা মহাশয়ের চিরাশ্রিত এবং প্রতিপালিত। যেখানে যে ভাবে থাকি, সেই আশ্রিত প্রতিপালিত বই আর কিছুই নই। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য, কিন্তু আমার পিতা ঠাকুর যে সামান্য সম্পত্তি অর্জ্জন করেছিলেন, এখনও তা আমি ভাল করে বুঝে লইনি। তা ছাড়া আমার শ্বশুরের যৎকিঞ্চিৎ আমি পেয়েছি। এই সকলের একটা ব্যবস্থা করে কিছু দিন পড়া শুনা করতে আমার ইচ্ছা। ভাল করে কাজ কর্ম্ম চালাতে পারি, এখনও এমন কিছু শিখিনি।"

রামলোচন রায় অহিফেনধুম সেবন করিতে শিখিয়া অনেকটা কাজের বাহির হইয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিতান্ত মূর্খ ছিলেন না। ফারসী সাহিত্যে বেশ দখল ছিল, সংস্কৃত ভাল জানিতেন না বটে, কিন্তু বিদায়ার্থী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের তর্ক বিতর্ক শুনিয়া শুনিয়া মোটামুটি একটা জ্ঞান জন্মিয়া গিয়াছিল। পুরন্দরের সঙ্গে একটু শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন যে, প্রধানতঃ নিজের যত্নে সেই অল্প বয়সে সে যাহা শিখিয়াছে, তাহা তখনকার দিনে বড় সাধারণ নহে। পুরনকে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নে কৃতসংকল্প জানিয়া বড় খুসী হইলেন, বলিলেন,

"তোমার বিদ্যানুরাগ দেখে বড় আনন্দ বোধ হল। তোমার বয়সে এক দিন আমারও ঐ রকম শিক্ষানুরাগ ছিল, কিন্তু পত্নীবিয়োগের পর কুসংসর্গে পড়ে পশুবৎ হয়েছি, আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হোক। কুসংসর্গটা বাপু সাপের মত চিরদিন ত্যাগ করবে। আচ্ছা এখন তবে পড়া শুনা কর। তোমার পিতার বেতন মাসহারা স্বরূপ তোমার প্রাপ্য—চাকরী কর আর না কর। ২|৩ মাস অন্তর আমায় এক একবার দেখা দিয়ে যেও।"

মাসহরা লইতে পুরন্দরের বিশেষ আপত্তি, কিন্তু স্পষ্ট করিয়া একে

বারে সেটা প্রত্যাখ্যান করিতে কেমন বাধবাধ করিতে লাগিল। বড় বাবুর স্নেহমধুর ব্যবহারে তিনি নিরুত্তর হইয়াছিলেন। তথাপি নতমুখে বলিলেন, "আমার ক্ষুদ্র সংসার, অভাবও সামান্য। যৎসামান্য ব্যয়ে স্বচ্ছন্দে সংসার চলে। মহাশয়েরই অর্থে পিতার অর্জ্জিত বিষয়টুকু থেকে তা বেশ নির্ব্বাহ হয়। মাসহারায় কোন প্রয়োজন নেই।"

কিন্তু বড় বাবু কিছুতে শুনিলেন না। তৎক্ষণাৎ আদেশ হইয়া গেল। তার পর পরম যত্নে তিনি পুরন্দরকে আহারাদি করাইলেন। পর দিন গৃহে যাইবার সময় পুরন দেওয়ানজীকেও নমস্কার করিতে ভুলিলেন না।

সপ্তম খণ্ড।

সপ্তপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

দুঃখীরামে এবং সেখ বজরুলে মাঝখানে অনেক দিন দেখা শুনা ছিল না। দুজনে "দোস্তি" থাকিলেও বুঝিয়াছিল, তাহারা পরস্পরকে মনের সহিত বিশ্বাস করিতে পারিবে না। অতএব তাহাদের উভয়ের অভিসন্ধি এবং স্বার্থে ঘাতপ্রতিঘাত হইয়া যে মনোমালিন্য জন্মিতেছিল, নায়েব মহাশয়ের মৃত্যু ও পুরন্দরের পীড়া এবং বাটীগমন প্রভৃতি ঘটনা পরম্পরায় তাহা আর বাড়িতে পায় নাই। কিন্তু নিস্তারিণীর তীর্থগমন এবং পুরন্দরের কনকপুর যাত্রায় সহসা একটা সুযোগ উপস্থিত হইল। দুই দোস্তে আর ভেট মোলাকাৎ না হইলেও, উভয়ে এই অবসরে আপন আপন অভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিতে স্থিরসংকল্প হইল।

পুরন্দর কনকপুর গেলে মোক্ষদা দেখিলেন, দুঃখীরাম কেমন যেন আড়-আড় ছাড়-ছাড় হইয়াছে। ডাকিলে সহসা পাওয়া যায় না—সম্মুখে আসিলেও আগেকার মত তেমন আপনার ভাবিয়া কায কর্ম্ম করে না, সদাই যেন কেমন অন্যমনস্ক, অন্যমনস্ক। জিজ্ঞাসা করিলে দুঃখ করিয়া বলে—"দিদি, তুমি যা একটু ভালবাস। ছোট বাবুকে কোলে পিঠে করে মানুষ করলাম—তিনি কি না আমাকে কুকুর বিড়েলের মতন দেখেন। কনকপুরে সঙ্গে নিয়ে গেলেন না। তাই ভাবি, এত যে তোমাদের কর্লাম, শেষে ফল কি হলো? যে রকম গতিক, বুড়ো বয়সে তোমাদের দুয়রে এক মুটো খেতেও পাব না দিদি ঠাকুরুণ!" দিদি ঠাকুরাণীর জানা ছিল, দুঃখীরাম পুরনের তেমন প্রিয় নহে, কাজেই আর কিছু বলিতেন না। এ দিকে দুঃখী নানা ছলে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ায়—যত দুশ্চরিত্র লোকের সঙ্গে তার আনুগত্য।

বজরুল করীমের চাল নবাবী ধরণের। সহসা এক দিন মধ্যাহ্নে গ্রামে রাষ্ট্র হইল, একখানি বিচিত্র ময়ূরপংখী পান্সী গঙ্গার ঘাটে আসিয়া লাগিয়াছে। খালাসীজীর "তবিয়ৎ" ভাল নহে—রাজধানী হইতে ছুটী

লইয়া আসিয়াছে, কিন্তু তথাপি ময়ূরপংখীর মেরামৎ জরুরি, এ জন্য গ্রামের ঘাটে আনাইয়া সেখ বজরুল্ আপন হেপাজতে তাহার সংস্কার করাইতেছে। বিচিত্র তরণী—রামধনুর মত বিবিধ বর্ণরঞ্জিত, রৌপ্যমণ্ডিত দাঁড়শ্রেণী, নানা রংয়ের কাঁচে তাহার গবাক্ষ সকল সজ্জিত। সংস্কারছলে মাঝি মাল্লারা খালাসীজীর নির্দ্দেশানুসারে কখন তাহাকে ডাঙ্গায় তুলিত, কখন বা স্রোতে বাহিয়া লইয়া যাইত। দলে দলে পল্লীগ্রামবাসীরা আসিয়া প্রত্যহ এই অপূর্ব্ব ময়ূরপংখী দেখিয়া যাইতে লাগিল। ভদ্রঘরের মেয়েরাও গঙ্গাস্নান উপলক্ষ করিয়া নয়ন সার্থক করিয়া গেলেন।

বজরুল করীম ইহার পূর্ব্বে আর এক খেলা খেলিয়া রাখিয়াছিল। মাস খানেক হইল, হঠাৎ এক মধ্যবয়সী মুসলমানী হরিশপুরের প্রান্তে আসিয়া চুড়ি এবং খেলনার দোকান খুলিল। গ্রামস্থ শিশু বালক বালিকাদের সঙ্গে শীঘ্রই তাহার পরিচয় হইল। ক্রমে সে মধ্যাহ্নে "ফিরি" করিয়া বেড়ায়, এবং ভদ্র পরিবারের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বিকিকিনি করে। ঠাকুরাণীরা তাহার গুণে ক্রমে মোহিত হইয়া উঠিলেন—তাহার পুতুল এবং চুড়ির চেয়ে তাহার মিষ্টিমিষ্টি গল্পগুলি তাঁহাদের অধিকতর ভাল লাগিত। পনর দিনে সে গ্রামের সাড়ে পনর আনা স্ত্রীলোকের সঙ্গে সখীত্ব স্থাপন করিল।

ঘোষ মহাশয়ের গৃহেও মুসলমানীর অবারিত দ্বার, কিন্তু মোক্ষদা দিদির কাছে তেমন আমল পাইত না। পাড়ার কন্যা এবং বধূরা মতি বিবির সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠতা করে, ইহা তাঁহার ভাল লাগিত না। বসুদের বউ মতিবিবিকে "গোলাব জল" বলেন শুনিয়া মোক্ষদা একদিন বলিলেন, "ছি বউ তোমার কি প্রবৃত্তি! কোথাকার অজানা অচেনা নীচ জাতির মেয়ে, এত বাড়াবাড়ি কি ভাল!" বধূ মোক্ষ ঠাকুরঝির সম্মুখে অপ্রতিভের হাসি হাসিলেন বটে, কিন্তু মধ্যাহ্নে গোলাব জলের কানে কানে সে কথাটি না বলিয়া খোলসা হইতে পারিলেন না। মতি দেখিত, মোক্ষদা তাহাকে যত্ন আদর করেন বটে, কিন্তু বরাবরই একটু তফাৎ তফাৎ থাকেন। অন্যের কাছে সে মন খুলিয়া যথেচ্ছ গল্প করিতে পারে, তাঁহার কাছে সেটি চলে না। "বহুজী"র সঙ্গে ভাল করিয়া আলাপ পরিচয় করিতে বড় সাধ, কিন্তু ননদের সামনে ভিন্ন ফুলকে দেখিতে পাইবার যো নাই। ফুলও তাহাকে দেখা দিতে ভাল বাসিত না—মতির চক্ষু দেখিলে তাহার কেমন ভয় ভয় করিত।

অষ্টপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

ঘোষেদের বাড়ী তেমন আমল না পাইয়া মতিবিবি সার্ব্বভৌম মহাশয়ের পরিবারবর্গের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া বসিল। কালীর মাতাকে সে মাতৃ সম্বোধন করিত, কাজেই কালীর সঙ্গে ক্রমে খুব ঘনিষ্ঠতা হইল। গঙ্গার ঘাটে ময়ূরপংখী আসিয়াছে, দলে দলে লোকে তাহা দেখিতে যাইতেছে শুনিয়া, কালীও এক দিন মতি দিদির সঙ্গে গিয়া সে বিচিত্র তরণী দেখিয়া আসিল। সইয়ের মুখে গল্প শুনিয়া ফুলের বড় ইচ্ছা হইল একবার দেখে—কিন্তু ননদকে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না।

মোক্ষদাকে সকলেরই ভয়—কালীর একবার সাধ হইয়াছিল বটে যে, সইকে গঙ্গা নাইতে পাঠাইবার জন্য মোক্ষ দিদিকে এক দিন অনুরোধ করিবে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহারও সাহসে কুলাইল না। অথচ অমন সুন্দর জিনিসটি সই দেখিতে পাইবে না, এ তাহার অসহ্য। মতি দিদি তাহাকে পরামর্শ দিল, কাপড় কাচার ছল করিয়া সইকে বাড়ীর বাহির করিতে পারিলেই সে লুকাইয়া লুকাইয়া ময়ূরপংখী দেখাইয়া আনিতে পারিবে। এই মতলবটা এমন মজার বলিয়া কালীর মনে হইয়াছিল যে, মতিবিবির শিক্ষামত সইয়ের কাছেও সে কোন কথা ভাঙ্গিল না। জানিতে পারিলে সইও যে ননদের অনভিমতে এবং অজ্ঞাতসারে ইহাতে সম্মত হইবে না, কালীর তাহা বিলক্ষণ জানা ছিল।

ফুল প্রায় প্রত্যহ অপরাহ্নে ননদ ও সইয়ের সঙ্গে গা ধুইতে কাপড় কাচিতে দীঘির ঘাটে যায়। এক দিন মোক্ষদার অসুখ হওয়ায়, দুই সইয়ে তাঁহার অনুমতি লইয়া একা একাই গেল। বাটীর বাহির হইতে না হইতে কালী প্রস্তাব করিল, আজ্ তালপুকুরে যাইতে হইবে, কিন্তু ফুল সহসা তাহাতে রাজি হইল না। কালী প্রথমতঃ রাগিয়া গেল, তাহাতেও সইয়ের মন টলিল না দেখিয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিল। শেষে বলিল—"সই সেখানে গিয়ে এক মজার কথা বল্‌ব। আর যদিই দুজনে এক দিন একত্তর হয়েচি, আমোদ আহ্লাদ না কর্‌ব কেন? তোর দীঘির ঘাটে যে ভাই লোক, একটি মনের কথা বলার যো নেই!" এ অনুরোধ উপেক্ষা

করে, এমন সাধ্য ফুলের ছিল না। কিন্তু এরূপ অরক্ষিতভাবে ননদের অজ্ঞাতসারে নির্জ্জন তালপুকুরে যাইতে তাহার পা সরিতে ছিল না, মনে হইতেছিল, কি একটা ঘোর অন্যায় করিতে বসিয়াছে!

তালপুকুরে পৌঁছিয়াই ঘাটে মতিবিবির সঙ্গে দেখা হইল। কালীর আনন্দের সীমা ছিল না—কিন্তু মতির সঙ্গে চারি চক্ষুর মিলন হইতে না হইতে ফুলের সর্ব্বশরীর কণ্টকিত এবং স্বেদসিক্ত হইয়া উঠিল। বড় আহ্লাদ করিয়া সই যখন তাহাকে বলিল—"চল্ লো লুকিয়ে ময়ূরপংখী দেখে আসি—সেই জন্যে তোকে ভুলিয়ে এনেছি," তখন ফুলের মুখে রক্তবিন্দু ছিল না, তাহার নিজের গতি এবং চেষ্টা শক্তি যেন রোধ হইয়া আসিতেছিল। কালী কিছু বুঝিতে পারিল না—বিস্মিত হইয়া দেখিল, মতি দিদির পশ্চাতে সই নতমুখে চলিয়াছে, তাহার কোন কথা শুনিতেছে না। যে পথ দিয়া মতি তাহাদের লইয়া চলিল, তাহা যেমন সোজা তেমনি নির্জ্জন—গঙ্গাতীরের যেখানে তাহারা পৌঁছিল, ঘাট হইতে তাহা কিছু দূর—অদূরে ময়ূরপংখী দেখা যাইতেছিল। আশ্চর্য্য হইয়া কালী জিজ্ঞাসা করিল—"সে কি মতি দিদি—একি অপথে আঘাটায় আমাদিকে নিয়ে এলি!" সে কথার উত্তর না দিয়া মতি গেঁজে হইতে ক্ষুদ্র একটি বাঁশী বাহির করিয়া তাহাতে ফূৎকার দিল। সহসা সেই জাহ্নবীতীরে তীক্ষ্ণধ্বনি জাগ্রত হইয়া দূরে প্রতিধ্বনিত হইল এবং দেখিতে দেখিতে ময়ূরপংখী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। মতি দৃঢ়পদে তরণীতে গিয়া উঠিল। কালী অতিশয় বিস্মিত হইয়া দেখিল, সইও তাহার অনুগমন করিল। কাজেই কালীও তাহাদের মত সিঁড়ি বাহিয়া উঠিল, এবং মুক্তদ্বার প্রকোষ্ঠে সইয়ের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

একোনষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

কালী উঠিবামাত্র সহসা সিঁড়ি পড়িয়া গেল, এবং মতির ইঙ্গিত পাইবা-মাত্র তৎক্ষণাৎ খালাসীরা নৌকা ছাড়িয়া দিল। ফুল নির্ব্বাক্, মন্ত্রমুগ্ধবৎ, তাহার কাছে সবই যেন স্বপ্নের মত বোধ হইতেছিল। কিন্তু এতক্ষণে কালী বিপদ বুঝিতে পারিল। কাঁদিয়া বলিল—"একি মতি দিদি, ভুলিয়ে ভুলিয়ে কোথায় আমাদের নিয়ে চল্‌লি! এই জন্যেই কি মার সঙ্গে ধর্ম্মমা পাতিয়েছিলি তুই!"

দেখিতে দেখিতে তরণী মাঝ গঙ্গায় আসিয়া পড়িল। তখন নিরাপদ জানিয়া মতি বিবি কালীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ভয় কি বোন্, চল্ আমার কাছে থাক্‌বি। মা বাপ, বাড়ী ঘর চির দিন কারু থাকে না। তোর সই হবে নবাবের বেগম—ফুলজানি বেগম—কেমন বেশ নামটি! তোরও ভাল রকম সাদি করে দেব!"—আর বলিতে হইল না, মতি অতর্কিতভাবে জলের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সহসা সেই ক্ষুদ্র বালিকার প্রচণ্ড পদাঘাতে জাহ্নবী বক্ষে পড়িয়া গেল। "কি হইল কি হইল" বলিয়া মাঝিমাল্লারা ছুটিয়া আসিলে বুদ্ধি স্থির করিয়া কালী বলিল, "মতি বিবি পড়ে গেছে—বাঁচাও তাকে।" বলা বাহুল্য, তাহাদের মধ্যে কেহ কালীর কার্য্য দেখে নাই, এবং ক্ষুদ্র বালিকার তাহা সাধ্য বলিয়া বিশ্বাসও করে নাই।

মতির পতনশব্দে ফুলের মোহ দূর হইল। সই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অশ্রুপাত করিতেছে দেখিয়া বুঝিল, কিছু একটা বিপদ ঘটিয়াছে, কিন্তু নিজের সে অভাবনীয় অবস্থা তখনও বুঝিতে পারে নাই। কালী যখন জানিল, ফুলের জ্ঞান সঞ্চার হইয়াছে, তখন সেই ঘোর বিপদের মধ্যেও তার মনে একটা আনন্দ, উৎসাহের তরঙ্গ উঠিল। সংক্ষেপে সইকে সকল কথা বলিয়া শেষে বলিল,—"আয় দুজনে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ি, না বাঁচি ধর্ম্ম ত রক্ষে হবে! কিন্তু দেরি কর্‌লে চল্‌বে না।" বলিতে বলিতে কালী নিজের বস্ত্রাঞ্চল সইয়ের বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিতে উদ্যত হইল।

ফুলের মনে বিপরীত তরঙ্গ উঠিল। গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িলে মরণ

নিশ্চিত—কিন্তু একবার তাঁকে না দেখিয়া কেন মরিব! আমি ঘর হইতে লুকাইয়া আসিয়াছি—আজ্ যদি মরি, সে কলঙ্ক শেলের মত তাঁর বুকে বাজিবে! মরিবার আগে তাঁকে একবার বুঝাইয়া বলিব, আমি না জানিয়া সইয়ের সঙ্গে এসেছিলাম। প্রকাশ্যে সইয়ের হাত ধরিয়া বলিল—"সই! তুই সাঁতার জানিস্, ঝাঁপিয়ে পড়ে বাড়ী গিয়ে এ খবর দিস্। আমি আর একবার তাঁকে না দেখে মর্‌তে পার্‌বো না। মা দুর্গা তত দিন আমায় অবিশ্যি রক্ষে কর্‌বেন!"

কালী কাতরকণ্ঠে বলিল—"সই তুই আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছিস্। এক দিন যবনের পুরীতে তোর আপশোষ হবে, কেন আমার কথা শুনে গঙ্গায় ডুবে মরিস্ নি! ঠাকুর করুন, যেন তোর ধর্ম্ম রক্ষে হয়। আমি আর বাড়ী ফির্‌ব না—কি করে এ মুখ পুরো দাদাকে দেখাব বল্!" বলিতে বলিতে হরি দুর্গা জগদ্ধাত্রী স্মরণ করিয়া ক্ষুদ্র বালিকারূপী দেবী জাহ্নবীবক্ষে অন্তর্হিতা হইলেন। গোধূলির তরল অন্ধকারে সেই পুণ্যক্ষণে জাহ্নবী যে অমূল্য রত্ন হৃদয়ে ধারণ করিলেন, এ সংসারে হায়! অনুদিন তাহার অভিনয় চলিতেছে।

ষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

রাজধানী মুর্শিদাবাদের নবাব-অন্তঃপুর-সংলগ্ন বৃহৎ বাটীতে, যথায় সংগৃহীত বন্দীর মত অসংখ্য অপহৃতা কুলকামিনীগণ আবদ্ধ আছেন, তথায় একবার যাই। অত্যুচ্চ প্রাচীর পরিখা তাহার চারি দিক বেষ্টন করিয়া আছে—মাতা প্রকৃতির সন্তান মাত্রেরই সাধারণ সম্পত্তি যে মুক্ত বায়ুপ্রবাহ, তাহারও যেন সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। নবাব-অন্তঃপুরের সে সুখ সম্পদের কিছুই এখানে ছিল না। পঙ্কিল সরোবর, অযত্নরক্ষিত উদ্যান-বিটপীশ্রেণী—হতভাগিনীগণের ভিতর যাহার সাহসে কুলাইত, সে হয় ডুবিয়া, নয় বৃক্ষশাখায় উদ্বন্ধনে জীবনজ্বালা জুড়াইত।

যে মুহূর্ত্তে কালী জাহ্নবীগর্ভে আত্মবিসর্জ্জন করিল, বিধাতার কৃপায় ফুলেরও তখন মূর্চ্ছা হইল। গভীর রাত্রে পান্‌সী যখন মুর্শিদাবাদে গিয়া পৌঁছিল, তখনও তাহার সেই মূর্চ্ছাবস্থা। খালাসীরা অনেক যত্নে মতি-বিবিকে জল হইতে উঠাইয়াছিল। প্রকোষ্ঠান্তরে তাহারও অজ্ঞানাবস্থা।

সংবাদ পাইয়া খোজারা পাল্‌কী বেহারা লইয়া আসিল। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে চন্দ্রোদয় হইয়াছিল—খড়খড়ির অবকাশপথে সুধাংশুরশ্মি ফুলকুমারীর স্পন্দহীন দেহে, নিমীলিত চক্ষুযুগলে পড়িয়া, তাহার দিব্য সৌন্দর্য্য বিকসিত করিয়া তুলিয়াছিল। বৃদ্ধ খাজেসেরা বিবিকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লইতে আসিয়াছিল—এই কাজ সে নিত্য করে—কিন্তু আজ্ তার পা উঠিতে ছিল না। কোন্ সুখের গৃহের প্রদীপ নিভাইয়া দস্যুরা এ রত্ন চুরী করিয়াছে ভাবিয়া তাহার চোখে জল আসিল। অনেকক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া খোজা আসান্‌উল্লা ডাকিল—"বিবি, উঠ, পাল্‌কী প্রস্তত!" দুই চারি পাঁচ ডাক—কে উত্তর দিবে? ফুলকুমারী তখন মোহের ঘোরে অস্পষ্ট স্বপ্ন দেখিতেছিল। পুরন্দরে আর তাহাতে এক নৌকায় নদী পার হইতেছিল—হঠাৎ ঝড় উঠিয়া নৌকা দ্বিধা বিভিন্ন হইয়া গেল। ফুল অতল জলে ডুবিয়া গেল!

খোজা আসান্‌উল্লা বুঝিল, বালিকার মূর্চ্ছা হইয়াছে। আর এই বিপদের উপর প্রথমেই অপরিচিত পুরুষ দর্শন করিলে তাহার হৃদয়ে আঘাতের

উপর আঘাত লাগিবে। বৃদ্ধ, যুবক খোজা একজনকে ডাকিয়া তাহার কানে কানে বলিয়া দিল—“দাই হামেসাকে শীঘ্র ডাকিয়া আন—কিছু গোলাবও লইয়া এস।”

হামেসা আসিল। বৃদ্ধ খোজা তাহাকে ফুলকুমারীর প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া সেই অনিন্দ্যসুন্দর শ্বেতপ্রস্তরবৎ শয়ান মূর্ত্তি দেখাইয়া বলিল, “যতক্ষণ না ইঁহার জ্ঞান সঞ্চার হয়, তুমি শুশ্রূষা কর—মাথায় গোলাব জল দাও!” ততক্ষণ চন্দ্রালোক আরও স্পষ্টতর হইয়া বালিকা মূর্ত্তিকে মধুরতর দেখাইতেছিল—সেই অনুপম মুখশ্রীতে বিষাদের ছায়া পড়িয়া যেন সুখ দুঃখের মিলনমূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। দেখিয়া হামেসা বৃদ্ধ খোজার মত অশ্রুমোচন করিল। উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিল, “মরি মরি মা, তোমার ও রূপ তোমার এ সর্ব্বনাশের জন্যে কেন বিধাতা দিয়েছিলেন!” আসানউল্লাকে বলিল, “জনাব, অনেক হতভাগিনীকে ত এই অবস্থায় দেখেছি, কিন্তু আজ্ এত মায়া কেন হল? একে দেখে আমার আপনার মেয়েটাকে মনে পড়েচে,—মৃত্যুশয্যায় চাঁদের আলোয় এম্‌নি তাকে দেখিয়েছিল!” বলিতে বলিতে অভাগিনী সহসা লুটাইয়া পড়িল, এবং মৃতা কন্যার নাম লইয়া বিহ্বল বিবশ হইয়া রোদন করিতে লাগিল। স্থির জাহ্নবীবক্ষে সে রোদনধ্বনি সদ্য মাতৃশোকের মর্ম্মচ্ছেদকতা জাগরিত করিয়া তুলিল।

আসানউল্লা হামেসাকে সান্ত্বনা করিলেন। সেই নিশীথ চন্দ্রকরফুল্ল প্রকৃতির দিকে স্থির নেত্রে চাহিয়া তিনি আল্লা আকবরকে স্মরণ করিতেছিলেন। জাহ্নবীবক্ষে ক্ষুদ্র তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল—তাঁহারও স্মৃতি মথিত হইতেছিল!

ততক্ষণ ফুলের মূর্চ্ছা ভাঙ্গিতে ছিল। স্বপ্নে মা জগদ্ধাত্রী বলিতেছিলেন, “ভয় কি, আমি তোমায় রক্ষা করব!” চক্ষু মেলিয়া ফুল দেখিল, শিয়রে রমণীমূর্ত্তি—সেও জগদ্ধাত্রীর মত করুণ অভয়কণ্ঠে বলিতেছে, “ভয় কি মা, আমি তোকে রক্ষা করব!”

একষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা হইল, তথাপি বধূ কাপড় কাচিয়া ঘরে ফিরিল না দেখিয়া, মোক্ষদা বড় উদ্বিগ্ন হইলেন। দাসীরা সব একে একে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কালী বা বধূকে দীঘির ঘাটে সে দিন কেহ দেখে নাই—তালপুকুরেও কোন খোঁজ খবর পাওয়া গেল না। মোক্ষদার মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। আপনার অসুখ ভুলিয়া ছুটিয়া তিনি সার্ব্বভৌম ঠাকুরের বাড়ী গেলেন। পুরোহিত মহাশয়ও আসিয়া জুটিলেন। গৃহে গৃহে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল—কেহই কোন খবর দিতে পারিল না। সে রাত্রে গ্রামে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল।

অন্যত্র অনুসন্ধান নিষ্ফল বুঝিয়া, গোপনে অন্ধকার পথে হারাধন শর্ম্মা দুঃখীরামের খোঁজে গেলেন।

দুঃখীরাম দুদিন গ্রামে ছিল না—শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে ঘটনার দিন সন্ধ্যা-কালে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছিল। পথে বাড়ীর কাছে পুরোহিত মহাশয়কে দেখিয়া বিস্মিত হইল। হারাধন শর্ম্মার ক্ষীণদৃষ্টি অন্ধকারে ক্ষীণতর হইয়া ছিল, অতএব দুঃখীরাম প্রণাম ও সম্ভাষণ না করিলে তিনি সহসা তাহাকে চিনিতে পারিতেন না। "ঠাকুর যে অসময়ে ব্যস্ত হয়ে এ দিকে" বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতে না করিতে পিঠের উপর তাঁহার ধীর করস্পর্শে দুঃখী বুঝিল, ব্যাপার সহজ নহে, কোন গুরুতর কথা আছে। গৃহে প্রদীপালোকে দুঃখী দেখিল, ঠাকুরের মুখ বিষম চিন্তাক্লিষ্ট, অথচ তিনি সহজে টলিবার লোক নহেন। দুঃখী তাঁহাকে সযত্নে বসাইয়া তামাক দিল—কদলীপত্রের হুঁকা রচনা করিয়া দিল—কেন না নিজের হুঁকা ছাড়া আর কিছু তিনি ব্যবহার করেন না। ধূমপানের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখীর অজ্ঞাত-সারে ঠাকুর তাহার আপাদমস্তক দেখিয়া লইতেছিলেন—কথাটা কি ভাবে পাড়িলে কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে, তাহারও চিন্তা করিতেছিলেন। দুঃখীরাম ততক্ষণ করযোড়ে দাঁড়াইয়াছিল।

ঠাকুর বলিলেন—"দুঃখী মনিববাড়ীর সঙ্গে ত সম্বন্ধ ঘুচোবার বন্দোবস্ত করেছিস্ দেখ্‌ছি। শুনলাম দুদিন গ্রামে ছিলিনে। কোথায় গিয়েছিলি—ঠিক্ ঠিক্ বল ত।"

দুঃখীরাম ঠিক্ ঠিক্ই বলিল—পাঁচ সাতখানা গ্রাম—সাধারণতঃ উগ্র-ক্ষত্রিয় ও বাগ্দী প্রধান—তাহারই নাম করিল।

ঠাকুর দুঃখীর হাতে কলিকা দিয়া বলিলেন, "কি মতলব বাপু!"

দুঃখীরাম এবার একটু ইতস্ততঃ করিল—কষ্টে বলিল, "এই কুটুমবাড়ী যাওয়া আর কি ঠাকুর, তুমি ত চরণে ঠেলেছ, ছোট বাবুকে কোলে পিঠে করে মানুষ করলাম, তিনি ত দেখ্তেই পারেন না। আপনি একটু দয়া কর্‌লে কি এ সব হয় ঠাকুর!"

হারাধন শর্ম্মার তীক্ষ্ণদৃষ্টি এবং কূট প্রশ্ন সম্মুখে দুঃখীরাম চঞ্চল হইয়া উঠিল, বুড়াকে চিনিত। জানিত, তাঁর কাছে সকল কথা গোপন করিয়া পার পাইবার যো নাই। অতএব চেষ্টা করিল, অনুযোগ করিয়া যদি কথা-টাকে চাপা দিতে কি অন্য কিছুতে ফিরাইতে পারে।

ঠাকুর হাসিলেন। বলিলেন, "আসল কথাটা কি বল্ দুঃখী শুনি। আহ্লাদ আমোদ কর্‌তে তুই কুটুমবাড়ী কোন কালে যাস্, এ আমি পিত্তয় করিনে। মতলবটা কি বল শুনি!"

কষ্টে কাষ্ঠহাসি হাসিয়া দুঃখী এবার বলিল—"চুরী ডাকাতির ফিকিরে গো ঠাকুর মোশাই। এ দিকে যে খেতে পাইনে, তার খবর কি কিছু রাখ ঠাকুর?"

হারাধন সেই কণ্ঠ একটু উচ্চ করিয়া বলিলেন—"এ দিকে যে মনিব বাড়ীতে ডাকাতি হয়ে গেল, তার কোন খবর রাখিস্ কি? আজই না হয় একটু অনাদর হয়েছে, ছেলে বেলা থেকে যে তাদের খেয়ে মানুষ, তা কি ভুলে গেলি ব্যাটা নিমকহারাম!"

হারাধন শর্ম্মা মনুষ্যচরিত্রদর্শী—মুখের ভাবে তিনি হৃদয়ভাব অধ্যয়ন করিতে পারিতেন। দেখিলেন, যে কথার জন্য তাঁহার আয়াস, দুঃখীরাম তাহার কিছুই জানে না। সে ধীরে ধীরে বলিল, "এ অধম বেঁচে থাক্‌তে মনিববাড়ীতে ডাকাতি হবে, এ আমি পিত্তয় করিনে। ঠাকুর আপনার মুখ দেখে আমার বড় ভয় হয়েচে। এ ভাবে আপনিই বা এলেন কেন—কিছু লুকোবেন না ঠাকুর। ছোট বাবু কনকপুর গেলেন, ছেলে মানুষ, আমায় সঙ্গে নিয়ে গেলেন না। সেখানে কত রকম আপদ বিপদ হতে পারে। ঠাকুর! কোন বিপদের খবর ত আসেনি?" দুঃখীরামের কণ্ঠ কারুণ্য-জড়িত সন্দেহে পূর্ণ!

হারাধন শর্ম্মার হার হইল। দুঃখীরামের ইদানীন্তন আচরণ আলোচনা করিয়া সহসা তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল, বধূমাতার হরণব্যাপারে সে নির্লিপ্ত নহে। অতএব কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া স্বয়ং তিনি তাহার খোঁজে আসিয়াছিলেন। তাহার শেষ কথায় সন্দেহমাত্র রহিল না। ঠাকুর যুগপৎ উদ্বিগ্ন এবং অপ্রতিভ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

ততক্ষণে দুঃখীরাম আপন প্রশ্ন পুনরুক্ত করিল। এবার শেষে বলিল, "ঠাকুর, ছোট বাবু প্রাণে ত বেঁচে আছেন?"

ঠাকুর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। "ছোট বাবু বেঁচে আছেন দুঃখী, কিন্তু যে সর্ব্বনাশ ঘটেচে, তা শুন্‌লে তিনি আর বাঁচবেন না। সন্ধ্যা থেকে বউমাকে আর সার্ব্বভৌমের কন্যাকে পাওয়া যাচ্চে না, গাঁয়ের ঘরে ঘরে পাতি পাতি করে খোঁজ করা হলো—কোন খানে পাওয়া গেল না। এ কলঙ্ক কি কখন মুছবে? আমি তোর উপর অনর্থক একটু সন্দেহ করে আপনার পাপের বোঝা ভারি করিচি। যার চুরী যায়, তার ধর্ম্মও যায়। সন্দেহের বাড়া পাপ নেই! তুই কিছু মনে করিস্‌নে।"

শুনিতে শুনিতে দুঃখী দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া রোদন করিতেছিল। অনেকক্ষণ পরে হৃদয়বেগ সম্বরণ করিয়া বলিল, "ঠাকুর মোশাই গো, আমার পাপের সীমা নেই। আমি জেনে শুনেও এ সর্ব্বনেশে কাজে বাধা দিইনি—নিজের পেটের চিন্তায় ফির্‌ছিলাম!"

তখন এক দিন কথায় কথায় সেখ বজরুল করীমের মনোভাব দুঃখী-রাম যেরূপ বুঝিয়াছিল, পুরোহিত ঠাকুরকে সবিশেষ বলিল। তখন কেন সাবধান হয় নাই ভাবিয়া, কপালে বারম্বার করাঘাত করিল। ঠাকুর বলি-লেন, "সবই অদৃষ্ট দুঃখী, তুই তার কি কর্‌বি বল!"

উভয়ে পরামর্শ করিয়া তখনি বজরুলের গৃহে গেলেন; দেখিলেন, চির দিনের মত গৃহের মায়া ত্যাগ করিয়া সেখজী লেড়কা-বালা লইয়া কোথায় চম্পট দিয়াছেন। হঠাৎ হারাধন শর্ম্মার মনে হইল, খেলনাওয়ালী মতি মুসলমানী ত সেখ করীমের সহায়তার জন্য আসে নাই! দুজনে তাহারও দোকানে গেলেন। দোকানপাট বন্ধ। সেই অপরাহ্ণ হইতে সে নিরুদ্দেশ হইয়াছে। প্রতিবেশীরা তাহার কথা লইয়া কানাকানি করিতেছিল।

আর কোন সন্দেহ রহিল না। বিপদের যথার্থ সীমা প্রতীতি হইলে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বালকের ন্যায় রোদন করিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "হায়

হায়, এমন সুহৃদ কি কেহ নেই যে, মুসলমানের পুরীতে প্রবেশের আগে হতভাগিনী বালিকা দুটোকে প্রাণে মারিয়া আসে!" দুঃখীরামের প্রতি শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিতেছিল। ঠাকুরের পদধূলি লইয়া বলিল—"তা পারব কি না জানি না, কিন্তু মানুষের যা সাধ্য, তা করব। প্রাণ দিয়েও যদি নায়েব মোশাইএর কুলকলঙ্ক দূর করতে পারি, তা করব।" সশস্ত্র এবং সসম্বল হইয়া দুঃখীরাম অবিলম্বে বাহির হইয়া গেল।

অষ্টম খণ্ড।

দ্বিষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

নৌকাপথে পুরন্দর গৃহে ফিরিতেছিলেন। ঘটনার দিন অপরাহ্নে নৌকার ছাদে বসিয়া মুগ্ধনয়নে তিনি অস্তগমনোন্মুখ রবিকর সম্পাতে হেমাভ জাহ্নবীর অপূর্ব্ব শোভা দেখিতেছিলেন। পলকে পলকে নীলাকাশে বিবিধ বর্ণরাজি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল—এই সুবর্ণোজ্জ্বল নীল, তারপর রক্তিমে নীলে সংমিশ্রণ, সহসা শ্যাম সুন্দর কোমল স্নিগ্ধ বর্ণাভা—জাহ্নবীর তরল বক্ষদর্পণে মুহুর্মুহু তাহাই প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। গোধূলির তরল ছায়া আসিয়া ক্রমে দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িল। অকস্মাৎ তীরস্থ আম্র বন মধ্য হইতে পূরবী রাগিণীতে কে গাহিল—

"আশা পথ চেয়ে চেয়ে দিন ত ফুরায়ে গেল!"

ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে মুগ্ধা ফুলকুমারী মায়াবিনী যবনীর পথানুসরণ করিয়া পাল্কীতে গিয়া উঠিল। অজ্ঞাত বিপদের ছায়া মুহূর্ত্তে পুরন্দরের হৃদয় আচ্ছন্ন করিল। পুরন ভাবুক এবং আত্মদর্শী, চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, স্থান কাল এবং সঙ্গীতের যুগপৎ সমাবেশ হওয়ায় তাঁহার গৃহের জন্য উদ্বিগ্ন, উন্মুখ চিত্ত হঠাৎ এরূপ ব্যাকুল হইয়াছে। কিন্তু কিছুতেই সে সন্ধ্যাকালে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারিলেন না। ক্রমে রাত্রি যত অধিক হইতে লাগিল, তাঁহার মনের অন্ধকারও তত বাড়িয়া চলিল।

আত্মানুসন্ধান করিয়া পুরন্দর দেখিলেন, তিনি ঘোর মোহাচ্ছন্ন হইয়াছেন। যে বিষাদছায়া অনুদিন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত, ভাবিয়া দেখিলেন, একখানি সরল সুন্দর মুখের আলোকে তাহা বিলীন হইয়া গিয়াছে। আগে সব আঁধার মনে হইত, এখন সর্ব্বত্র ফুল! দুই চারি দিন ফুলকে ছাড়িয়া থাকিতেও বড় কষ্ট বোধ হয়। একবার মনে হইল, আজিকার এই চিত্তবিকৃতি হয় ত ফুলের অমঙ্গল সূচনা করিতেছে। বাড়ী গিয়া যদি দেখি, ফুল শুকাইয়া এ সংসার হইতে ঝরিয়া গিয়াছে! সে কথা ভাবিতে পুরনের হৃদয় ফাটিয়া

চতুঃষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

যবন-অন্তঃপুর-কারাগারে দুঃখিনী ফুলকুমারীর দিন কি ভাবে কাটিতেছে, একবার গিয়া দেখিয়া আসি। হরণের পর দুই দিন কাটিয়াছে, অনশনে মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছায় কোথা দিয়া তাহার দিন রাত্রি চলিয়া গেল। হামেসা অনেক যত্ন করিয়াছিল, খাজেসেরা অনেক অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু ফুলকে জলবিন্দু গ্রহণ করাইতে পারে নাই। তিন দিনের দিন অবস্থা বড় শোচনীয় দেখিয়া আসানউল্লা ফুলকে সম্বোধন করিয়া বলিল "বেটি, এখানে আমরা তোমার জাত্ মেরে দেব, সে ভয় করো না। যতক্ষণ আমার এক্তিয়ারে আছ, তা কখনই হবে না। আমি বন্দোবস্ত করে দেব, জল-আচরণীয় জাতিতে তোমার জন্যে সুড়ঙ্গপথে জল এনে দেবে।" ফুল উত্তর দিতে পারিল না—চখের জল উছলিয়া পড়িয়া তাহার উপবাস-ক্ষীণ কপোলযুগল প্লাবিত করিল। হামেসা বলিল, "বাছা এমন করে কদিন কাট্‌বে বল্? স্নানাহার কর্। খাজেসেরার কথা শোন্। উনি মনে কর্‌লে সবই পারেন!" আসানউল্লা বলিলেন—"সে সব এক্তিয়ার এখন আর নেই হামেসা, এ কুচলির দরবার হয়েচে, এখন বুড় বয়সে ইজ্জৎ বাঁচান ভার।" হামেসা ঘাড় নাড়িল, বলিল, "প্রভু এই পাপের পুরীতে তোমার দয়া নইলে আমি টিক্‌তে পার্‌তেম না! সয়তানেরা আমার সর্ব্বস্ব ধন সেই মেয়েটিকে যখন কেড়ে নিয়ে এল, বিধবা দুঃখিনী আমি নিজের জাত ধর্ম্ম সব ভুলে তোমার পায়ে এসে পড়্‌লেম্। সে দুঃখের দিনে তোমার মেহের-বাণী হয়েছিল বলেই, আমি এই দুর্গম পুরীতে ঢুকে আমার বুকচেরা ধনকে কোলে নিতে পেরেছিলেম। মায়ায় পড়ে শেষে সব তুচ্ছ করে মুসলমানী হলেম, বামুনের মেয়ে হয়ে যবনীর নাম পর্য্যন্ত নিতে হল, কিন্তু তাতেও কি বিধাতার দয়া হল! শেষে যার জন্যে এ সব, তাকে তিনি কেড়ে নিলেন! এত যে দুঃখ, এতেও পাগল হইনি, সে কেবল তোমার দয়ায়। এখনও প্রাতে সন্ধ্যায় তার গোরের ধারে গিয়ে চক্ষের জল ফেল্‌তে পাই—সেই আমার সুখ!" খাজেসেরা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "হামেসা, ও সব কথা আর বলো না। আমার ভারি কষ্ট হয়। সংসারীর কিছুই আমা-

দের নেই, তবু তোমার মাতৃস্নেহ মনে পড়লে আমি ব্যাকুল হই। আল্লার নাম কর—ও সব আর কেন?"

হামেসা নীরবে রোদন করিতেছিল। তার ফোঁটা ফোঁটা চখের জল তাহার উরু-দেশ-ন্যস্ত ফুলকুমারীর ক্ষীণ ললাটপ্রান্তে আসিয়া পড়িতেছিল। চক্ষু মেলিয়া ফুল সে স্নেহময়ী মূর্ত্তি একবার দেখিল। মুহূর্ত্তে চক্ষু নিমীলিত হইল। সেই অবস্থায় ফুল অতি ক্ষীণ কাতরকণ্ঠে বলিল—"একবার দেখা মা—তাঁকে এক বার দেখা!"

হামেসা আর্দ্রনেত্রে খাজেসেরার দিকে চাহিল। দেখিল সে মূর্ত্তি করুণাময়, আর্ত্তের ত্রাণার্থ কিছুই তাহার অকরণীয় আছে, এমন বোধ হয় না। হামেসা, আসানউল্লার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই বলিল—"উঠ মা, আমি তোর সোয়ামীর সঙ্গে তোর দেখা করাব।"

খাজেসেরা সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন। ফুল সে দিন উঠিয়া বসিল।

পঞ্চষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

আসান উল্লা হামেসাকে ডাকিয়া গোপনে বলিল, "তুমি ও বেচারীকে নাহক আশা দিয়েছ। এমন বিষম কথা মুখেও এনো না। কেমন করে ওর খসমের সঙ্গে মোলাকাৎ করাবে?" হামেসা হাসিয়া বলিল, "খাজেসেরা, পুরুষ মানুষ কবে স্ত্রীলোকের ফিকির বুঝ্‌তে পারে? এই যে সিপাহী শান্ত্রী খোজাদের পাহারা, এ ত চিরকালই চলে আস্‌চে, কিন্তু তবু বরাবর সকল দরবারেই লুকোচুরী চলে, তা কি আপনি জানেন না?" বৃদ্ধ ঘাড় নাড়িল, এবং বিস্ময়সূচক "খয়ের!" মাত্র উচ্চারণ করিয়া, হামেসার স্মিত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হামেসা আবার বলিল, "পাপের জন্যে যদি লুকোচুরী চলে, তবে একবার না হয় পুণ্যির জন্যেই চলুক। স্ত্রীর সঙ্গে স্বামী দেখা করবে, এ আর বেশী কথা কি।" আসান উল্লা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—"হুঁসিয়ার বেটি, এমন কথাও মনে করো না। তুমি কি জান না, আমাদিকে কোরাণ স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা কর্‌তে হয়, জেনে শুনে কোন পুরুষকে হাবিলীর সীমা মাড়াতে দেব না।"

খোজা গুরগণ খাঁ জোয়ান এবং গোঁড়া মুসলমীন। আসান উল্লাকে এক দিন একটু তীব্র স্বরে বলিল, "এ সাহাব, আপনি নাকি নয়া হেঁদু লেড়কীটের জন্যে হেঁদু বাঁদী মোকরর করে দেছেন, আর তার নাকি খাস্ গঙ্গার পানি নইলে চলে না?" আসান উল্লা একটু অপ্রতিভ হইয়া পদোচিত মুরুব্বি ধরণে বলিল, "আরে ভাই, ও সব অত দেখ্‌লে কি চারা আছে? লেড়কীঠো বড়াঘরানা, বেচারী মারা যায়, তা কি করি বল?" বলিয়া তিনি গুরগণের পিঠে গোটা কতক আদরের চাপড় মারিলেন। গুরগণ অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল,—"আপ্‌নি অপ্‌সর, যে আপনার মর্‌জি, কিন্তু এ রেওয়াজ ভাল নয়।" খাজেসেরা বিরলকেশ মাথা নাড়িয়া এবং দোদুল্যমান ভুঁড়ি হেলাইয়া সে কথায় খুব একচোট হাসিয়া উঠিলেন বটে, কিন্তু গোপনে হামেসাকে বলিলেন, "গুরগণের ওপর চোক রেখো! হুঁসিয়ার! সে বিপদ ঘটাতে পারে!"

বয়সে হামেসা গুরগণের মাতৃস্থানীয়া। তার সাদাসিধে কোমল ব্যবহারে সকলেই তাহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিত—গুরগণের কাছেও তার খাতির যথেষ্ট। হামেসাকে এক দিন চোখের জল ফেলিতে দেখিয়া গুরগণ বলিল, "বিবি কি তক্‌লিফ্ হয়েচে তোমার? বল, পারি যদি তার কিনারা করি।" হামেসা উত্তর দিল, "বেটা আমার যে লেড়কীর কথা তোমায় অনেকবার বলেছি, নয়া হেঁদু লেড়কীটে দেখ্‌তে অনেকটা তারই মত। আল্লা এ বুড় বয়সে আবার এক মায়া ফাঁদে ফেলেচেন, ছুঁড়িটে আবার দেওয়ানা। তোমরা যদি কিছু না বল, আমি মাঝে মাঝে দরগায় পীরের সিন্নি দিয়ে আসি।" গুরগণ হাসিল, বলিল, "এই, তা এর জন্যে আর কান্না কেন বিবি!" হামেসা বিষণ্ণ মুখে কহিল, "পাহারার সিপাহীরা যেতে আস্‌তে দিতে বড় হুজ্জত হাঙ্গামা করে।"

গুরগণ। আচ্ছা, আমি হুকুম করে দেব।

ষট্‌ষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

গৃহিণীকে প্রবোধ দিবার সময় সার্ব্বভৌম মহাশয় নিজে তেমন বিচলিত হন নাই, কিন্তু পুরন্দরের স্থির ধীর প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার শোক উছলিয়া উঠিল। তাহার উপর গম্ভীর অথচ কম্পিত কণ্ঠে পুরন্দর যখন বলিয়া উঠিল, "এক বোঁটায় তারা দুটি ফুল, ফুটিতে না ফুটিতে বিধাতা তুলে নিয়েচেন," তখন তিনি স্ত্রীলোকের ন্যায় বিবশ-বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সেই সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতের এইরূপ ধৈর্য্যচ্যুতি অবলোকন করিয়া পুরন্দর ঊর্দ্ধনেত্রে, ঊর্দ্ধ যুক্ত করে গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে ডাকিল,—"প্রভো তোমার উপর ভক্তি যেন আমার অচলা হয়। তোমার অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত দয়ার প্রতি যেন কখন অণুমাত্র অবিশ্বাস হৃদয়ে আমার স্থান না পায় প্রভু!" শুনিয়া বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় সার্ব্বভৌম উঠিয়া বসিলেন, এবং শোকাশ্রু নিবারণ করিলেন। গৃহে ফিরিবার সময় বরাবর তিনি পুরন্দরের উপর লক্ষ্য রাখিলেন। সে অবস্থায় তাহার ধীর স্থির প্রশান্ত মূর্ত্তি তাঁহার কাছে নিতান্ত অলৌকিক মনে হইতেছিল।

গৃহদ্বারে পুরন্দর বৃদ্ধ পুরোহিত মহাশয়ের সাক্ষাৎ পাইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পুরোহিত ঠাকুর বালকের ন্যায় রোদন করিয়া উঠিলেন। পুরন্দর পদধূলি গ্রহণ এবং সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—"এ আমার অদৃষ্টের ফল। এক্টা না হোক্, পরিণাম যে আমার দুঃখময়, তা আমি জানি। আপনাদের মুখ দেখে হৃদয়ে আমি বললাভ করব, কিন্তু আপনি যদি এত অধীর হন, আজ্ঞা করুন, আমি আর গৃহে প্রবেশ কর্‌ব না।" হারাধন পুরন্দরকে আলিঙ্গন করিলেন। বলিলেন, "এ তোমার যোগ্য কথা। চল অন্দরে গিয়া দুজনে মোক্ষদাকে সান্ত্বনা করি। তাহার আহার নিদ্রা নাই। বলে, কি করে পুরুকে এ মুখ দেখাবো।"

উভয়ে অন্দরে প্রবেশ করিলেন। পুরোহিত ঠাকুরাণীর উরুদেশে মাথা রাখিয়া বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া মোক্ষদা রোদন করিতেছিলেন। তাঁর শিশু পুত্র কন্যা দুটি মার কাছে বসিয়া কিছু না বুঝিয়াও কাঁদিতেছিল। পুরন্দর সযত্নে তাহাদের কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন।

* * * * * * *

দুঃখীরামের যত্ন নিষ্ফল হয় নাই। কিছু খরচ পত্র করিয়া সে সেই মতি মুসলমানীকে হাত করিয়াছিল, এবং কৌশলে তাহার দ্বারা হামেসার নিকট পরিচিত হইয়াছিল। টাকায় সব হয়—দুঃখীরাম বজরুল করীমকে স্মরণ করিয়া প্রথমেই মতির হাতে একটা আস্‌রফি গুঁজিয়া দিয়া বলিল, "একটা কথা তোমায় বলে রাখি বিবি, তোমার কাছে আমার আসার কথাটা যেন কাক কোকিলেও টের না পায়।" মতি যে নিতান্ত ক্ষীণ স্রোতের শফরী নহে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। সে দেখিল, এ এক দাঁও—আস্‌রফি কুড়োবার স্থল বটে। কাজেই জিভ্ কাটিয়া কসম লইয়া বলিল—"দিল্‌জমাই থেকো ভাই—জান্ না বেরুলে এ কথা বেরুবে না।" মতি এ শপথ পালন করিয়াছিল—মন্ত্রগুপ্তিতে তারও কার্য্যসিদ্ধি। কিন্তু প্রকাশে তার "জান্" বাহির হওয়ার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল।

পুরন্দরের গৃহে প্রত্যাগমনের তিন দিন পরে সন্ধ্যাকালে একদিন দুঃখীরাম ফিরিয়া আসিল। গোপনে হারাধন শর্ম্মার সঙ্গে দেখা করিয়া সকল কথা তাঁহাকে বলিল। শেষে বলিল, "ঠাকুর, মানুষের যা সাধ্যি, তা আমি করেছি। যা অসাধ্যি, নবাব হাবিলীতে ঢুকে বউমার সঙ্গে দেখা করা, তা পারি নি। কিন্তু হামেসার চোকের জল আর তার আত্তি দেখে আমার পিত্তয় হয়েচে যে, তার একটি কথাও মিছে নয়। বউমা মা জানকীর মত শত্রুপুরে আছেন, কোন পাপ এখনও তাঁকে ছুঁতে পারে নি। হামেসার আরও বুঝি অনেক কথা বলার ছিল, কিন্তু আমাকে অতটা পিত্তয় কর্‌তে পার্‌লে না। সে বলে, তোমার মনিবকে দু এক দিনের ভেতর অবিশ্যি অবিশ্যি একবার নিয়ে এস, নইলে সব ফেঁসে যাবে। এতেই আমার একটু আশা হয়, বউমাকে ফিরে পাওয়াও যেতে পারে।"

পুরোহিত ঠাকুর অনেক ভাবিলেন, শেষে বলিলেন,—"দুঃখী, ফিরে পেলেই কি আর তাঁকে গ্রহণ করা যায়! ভদ্র ঘরে তা হয় না। কিন্তু পুরন্দরের অবস্থা দেখে আমার বড় আশঙ্কা হচ্চে। ধীর গম্ভীর মূর্ত্তি—একটু মলিন বটে, কিন্তু মনে হয়, যেন শোক দুঃখের অতীত। শ্মশান-ঘাটে সার্ব্বভৌমের মেয়ের দাহকালে কি বাড়ীতে মোক্ষর সাম্নে, কোথাও এক ফোঁটা চোকের জল ফেলে নি। বাড়ী এসে পর্য্যন্ত পুঁথির রাশের

ভিতর ডুবে আছে—কেউ বড় কাছে যেতে পারে না। ভয় হচ্চে, পাছে বা উন্মাদ রোগ হয়। এই সব তার লক্ষণ। সহসা তুই দেখা দিস্‌নে। আজ্‌ রাত্রে কথাবার্ত্তা কয়ে দেখি, কি ভাব।”

দুঃখীরাম দিদি ঠাকুরাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াও সকল কথা বলিল। মতি মুসলমানী আর বজরুল করীমের কথা তুলিয়া দুঃখী বলিল, “দিদি, আমাদের যা হবার তা ত হয়েচে, কিন্তু এর প্রতিফল আমি তাদের দেবই দেব। সে কথা মনে করেই এসেচি। বউমাকে ফিরে একবার আন্‌তে পার্‌লে হয়—পাপিষ্ঠিদের রক্তে তোমাদের পা ধুইয়ে দেব, তবে আমার রাগ যাবে দিদি ঠাক্‌রুণ।” মোক্ষদা চোকের জল মুছিতে মুছিতে হৃদয়াবেগে বলিয়া উঠিলেন, “ভাই, তুই যদি যবনের পাপপুরীতে ঢুকে বউকে নিজের হাতে কেটে আস্‌তে পার্‌তিস্‌, তোর বড় পুণ্যি হত। পাপিষ্ঠিদের মেরে কেন পাপ কর্‌বি।” পুরোহিত ঠাকুর পরামর্শ করিতে আসিলে বলিলেন, “সর্ব্বস্ব দিয়েও যদি বউকে ফিরে আন্‌তে পারেন, তা করুন। আমরা তাকে গ্রহণ না কর্‌তে পারি, তার মার সেই যে সর্ব্বস্ব! দুঃখিনী বিধবা যখন আমায় জিজ্ঞেস্‌ কর্‌বে, তার বুকচেরা ধন কোথায়, কি উত্তর দেব ঠাকুর? লোকে নিন্দে করে করুক, পুরুর আবার না হয় বিয়ে দেব, বউকে যেমন করে হোক্‌ ফিরে আনুন।”

গভীর রাত্রে একাকী পুরন্দর অনন্য মনে চিন্তা করিতেছিলেন। তাঁর ইচ্ছামত পুরোহিত ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া মোক্ষদা সে কক্ষে উপস্থিত হইলেন। পুরন বলিলেন, “দিদি কাল আমি অনুসন্ধানে বেরুব স্থির করেচি, এতে তোমরা বাধা দিও না। যত দিন না ফিরি, যে ভাবে সব চল্‌চে, তাই চলুক। আমি জানি কোন ফল হবে না। কিন্তু তবু কর্ত্তব্য কাজ অবশ্য কর্‌তে হবে।” হারাধন শর্ম্মাকে সুতরাং সকল কথা বলিতে হইল। পুরন্দর আগ্রহে দুঃখীরামকে দেখিতে চাহিলেন। সে আসিল।

যতক্ষণ দুঃখী সবিস্তারে সব কথা বলিতেছিল, অসার নিস্পন্দবৎ তন্ময় চিত্তে পুরন্দর তাহা শুনিতেছিলেন। দুঃখীর আর্দ্র চক্ষু দেখিতে দেখিতে হঠাৎ ছেলেবেলার মত চঞ্চল হইয়া উঠিয়া তাহার কণ্ঠলগ্ন হইলেন। ছেলেবেলার মত কোমল স্বরে ডাকিলেন—দুখে দাদা! তার পর মূর্চ্ছিত হইলেন।

সপ্তষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

যে নৌকায় পুরন্দর মুর্শিদাবাদে আসিলেন, দুঃখীরামের কৌশলে অস্ত্রশস্ত্রে লোকজনে তাহা এরূপ সজ্জিত ছিল যে, সহসা বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা রহিল না। মাঝি মাল্লা সকলেই তাহার আপনার লোক—এবং বাছা বাছা সরকীবাজ খেলোয়াড়। আবশ্যক হইলে চাই কি তাহারা "মরিয়া" হইয়া নবাবদেউড়ী পর্য্যন্ত প্রবেশ করিবে। ভিতরের এই বন্দোবস্ত। পুরন্দর তাহার কিছুই জানিলেন না।

মুর্শিদাবাদে আসিয়াও বসবাস নৌকার উপর চলিতে লাগিল। প্রয়োজন মত নৌকা দুই কূলে যাতায়াত করিত। লোকে সুধাইলে দুঃখী বলিত, আরোহী বাবুটি পীড়িত, চিকিৎসার জন্য সহরে আসিয়াছেন। গঙ্গার শীতল বায়ু সেবনের ব্যবস্থা বলিয়া, নৌকা ওরূপ যাতায়াত করে। মাঝি মাল্লারাও তাই বলিত।

হামেসা যখন তখন বাহিরে আসিতে পারে না—পারিলেও সন্দেহের লেশমাত্র যাহাতে স্পর্শ না করে, সে জন্য বড় সাবধানে সে চলিত। দুঃখী-রামের সঙ্গে সন্ধ্যার প্রাক্কালে একবার মাত্র দেখা হইত—তাহাও রোজ নহে। কি উপায়ে পুরন্দর নিরাপদে সেই দুর্গমপুরে প্রবেশ করিয়া আবার নিষ্ক্রান্ত হইতে পারে, অহরহ তাহার এই চিন্তা। এ দিকে স্বামী সন্দর্শন-কামনায় ফুলকুমারী কোন মতে জীবন ধারণ করিতেছিল, কিন্তু যখন তখন আপনার সেই অভাবনীয় অবস্থা মনে করিয়া নৈরাশ্যে অভিভূত হইত—মূর্চ্ছা আসিয়া জ্ঞান হরণ করিয়া তাহার অনেক যাতনা নিবারণ করিত। পুরন্দরের জন্যও উভয়ের উদ্বেগের সীমা ছিল না। দুঃখীরাম হামেসাকে রোজ প্রায় বলিত যে, দিনের বেলায় তাঁহার মূর্ত্তিতে অধৈর্য্যমাত্র লক্ষ্য করা যায় না বটে, কিন্তু নিশীথে সকলে সুষুপ্ত হইলে, হয় নৌকার ছাদে বসিয়া, নয় গঙ্গা সৈকতে পদচারণ করিয়া তিনি সমস্ত রাত্রি যাপন করেন। দুঃখী অলক্ষ্যে জাগিয়া থাকিয়া তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখে। এক দিন সে প্রস্তাব করিয়াছিল যে, স্ত্রীবেশে তিনি নবাব অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে

পারিবেন কি না? শুনিয়া পুরন্দর চিন্তামগ্ন হইয়াছিলেন—কোন উত্তর করেন নাই।

হামেসার যত্ন কিসে একবার চির দিনের মত দুজনের শেষ দেখা হয়, কিন্তু দুঃখীর মতলব বউমার উদ্ধার সাধন। সে হামেসাকে স্পষ্ট করিয়া বলিল, অর্থ বলে যদি সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার হয়, তাহার অভাব নাই। হামেসারও মনে সে কথা অনেকবার উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা সে অসম্ভব বুঝিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিল। দুঃখীকে বলিল, "নবাব সিরাজের আমলে সে অসম্ভব কথা। তোমার প্রভুপত্নীর মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বেগম মহলেও দেখা যায় না। তাঁকে উদ্ধার করে কোন ফল হবে না—শেষে সকলকেই সঙ্গীন বিপদে পড়্‌তে হবে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমার ফুলরাণীকে অধর্ম্ম স্পর্শ কর্‌তে পার্‌বে না। কখনই না। সতী সাধ্বী সে, একবার স্বামী-দর্শন হলেই তার আয়ু শেষ হবে!"

সে দিন নৌকায় ফিরিয়া চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে দুঃখীরাম প্রভুকে হামেসার কথাগুলি অবিকল বলিল। পুরন্দর তখন কোন উত্তর করিলেন না। অটল ভাস্কর্য্য মূর্ত্তিবৎ স্থির হইয়া শুনিলেন। গভীর রাত্রে দুঃখীরামের শিরোদেশে বসিয়া গদগদ কণ্ঠে ডাকিলেন—"দুখে দাদা!" দুঃখী জাগিয়াই ছিল, শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিল। পুরন সেই কণ্ঠে বলিলেন, "ভাই, তুমি যা বল্‌বে, তাই শুন্‌ব!"

তার পর হামেসার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া দুঃখীরাম অন্দর প্রবেশের দিন নির্দ্ধারণ করিল।

অষ্টষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

কার্ত্তিকী পূর্ণিমার চতুর্দ্দশী রজনী—চন্দ্রকরে সর্ব্বত্র প্রফুল্ল। মুর্শিদাবাদের নীচে গঙ্গাবক্ষে শত শত সুসজ্জিত তরণী স্রোতস্বতীকে বিলোড়িত করিয়া "বাইচ" খেলার আমোদে মত্ত। স্বয়ং নবাব সিরাজুদ্দৌলা অপূর্ব্ব ময়ূরপংখীতে নর্ত্তকী ও পারিষদগণ পরিবৃত হইয়া সুরা সঙ্গীতে ভাসিতেছিলেন। রসন-চৌকীর সরস গান মাঝে মাঝে দাঁড়পতনের অজস্র শব্দের ভিতরেও বড়

মধুর শুনাইতেছিল। অবহিত মনে নবাব কিছুই ভোগ করিতে পারিতে-ছিলেন না। তাঁহার আদেশে নৃত্য জমিতে না জমিতে বন্ধ হইতেছিল—গায়কী আপনার কণ্ঠ সৌন্দর্য্য দেখাইতে না দেখাইতে থামিয়া যাইতে-ছিল, পারিষদেরা বসিতে না বসিতে উঠিতেছিল—কেন না "জনাব আলীর" উঠিবার বসিবার স্থিরতা নাই। চিত্তচাঞ্চল্য এবং খামখেয়াল সিরাজচরিত্রের প্রধান উপকরণ।

জনাব আলীর হুকুম মতে হঠাৎ নকীব গঙ্গাবক্ষ কম্পিত করিয়া বলিয়া দিল—"পান্সী সকল স্রোতে ভাসিয়া চলুক, কেহ দাঁড় ফেলিতে পাইবে না।" নীরবে একদণ্ডকাল শত শত তরণী আপন মনে প্রবল স্রোতে ভাসিয়া চলিল। অমনি আদেশ হইল—"মাঝিমাল্লারা চুপ করিয়া বসিয়া থাক, আরোহীরা—আমীর ওমরাও সকলেই—দাঁড় বাহিয়া পান্সী উজানে লইয়া চলুক।" প্রাণের দায়ে কি করে, সকলকেই দাঁড় ধরিতে হইল। স্বয়ং নবাব আপন ময়ূরপংখীর দাঁড়িগিরি করিতেছিলেন। দাঁড় বাহিতে বাহিতে আমীর খয়ের আলী গলদঘর্ম্ম হইয়া আপন পান্সী হইতে দাঁড়সহযোগে স্রোতে পড়িয়া গেলেন—একটা গোলমাল হইয়া উঠিল। শুনিয়া সপারিষদ নবাব হাসিয়া আকুল। সে ব্যক্তি বাঁচিল কি মরিল, তার খোঁজ করিতে কাহারও অবসর বা প্রবৃত্তি ছিল না।

পিপীলিকাশ্রেণীবৎ জনশ্রেণী গঙ্গার উভয় কূল আচ্ছন্ন করিয়া এই উৎসব দেখিতেছিল। সে দিন রাজধানীতে গৃহে বড় কেহ ছিল না, যাহাদের একান্তই গৃহ ছাড়িবার যো নাই, তাহারাই তামাসা দেখায় বঞ্চিত হইল। বাইচ খেলার শেষে বাজী পোড়ানর বন্দোবস্ত—নবাব অন্তঃপুর দেউড়ীর প্রহরীরা পর্য্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঁকি ঝুঁকি দিতেছিল। যেথায় রাজাবরোধ-সংলগ্ন বৃহৎ বাটীতে অভাগিনী ফুলকুমারী বন্দিনী, তাহার দেউড়ীতে পাহারা আজ তেমন কড়াকড় ছিল না।

* * * * * * *

কৌমুদীসম্পাতে সর্ব্বত্র প্রফুল্ল—অন্তঃপুর কারাগারেও সে শোভার ছায়া পড়িয়াছে। সরোবর পঙ্কিল হইলেও চন্দ্রকরে ম্লান হাসি হাসিতেছিল, তাহার তীরস্থ বৃক্ষরাজি অযত্ন-রক্ষিত হইলেও শুভ্রকিরণস্নাত হইয়া আদরে ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। ঘনকৃষ্ণ ছায়াতলে কোথাও বৃক্ষপত্রের অবকাশপথে, একটি মাত্র কিরণ গোপনে নামিয়া আসিয়া আলোক ছায়ার

মাধুর্য্যটুকু উপভোগ করিতেছিল। এইরূপ ছায়াতলে স্থান কাল জ্ঞানশূন্য তন্ময় প্রণয়ী-যুগল পরস্পরের নিকট চিরবিদায় লইতেছিল।

পুরন্দর বলিতেছিলেন—"তোমায় এ ভাবে ছেড়ে যাওয়া বড় কাপুরুষের কাজ—চল আমার সঙ্গে চল। বাহির হতে না পারি, দুজনে একত্রে দাঁড়াইয়া মরিব। কি ছার জীবন, একটু বিষে, ছুরীর একটু আঘাতে যা শেষ হয়, তার জন্যে ভয়ই কি আর ভাবনাই বা কি! বিনাসম্বলে আমি আসি নি।" ফুল দেখিল, স্বামী উত্তরীয় কোণে বিষের মোড়ক বাঁধিয়া রাখিয়াছেন।

ফুলকুমারী স্বামীর সঙ্গে বেশী কথা কহিতে শেখে নাই, কিন্তু আজ আর লজ্জা ছিল না। তাঁর হাতে আপনার ক্ষুদ্র কোমল হাতখানি রাখিয়া ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল, "মরণের ভয়?—তা নয় প্রভু! আমায় নিয়ে এ জীবনে তুমি কি আর সুখী হবে? নবাবের সঙ্গে বিবাদ করে কদিন আমরা বাঁচব? তোমায় দেখেছি, এখন যখন ইচ্ছে মর্‌তে পার্‌বো। কিন্তু তোমায় দেখে মর্‌তে আমার ইচ্ছে করে না।" স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া ফুল বিবশ বিহ্বল হইয়া রোদন করিল। এমন সময়ে অকস্মাৎ কাহারও দ্রুত পদশব্দ হইল। সভয় কণ্ঠে হামেসা হাঁকিল "হুঁসিয়ার!"

চকিত হরিণী দম্পতিবৎ উভয়ে বিত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। ফুল ব্যাকুল হইয়া বলিল, "আর না প্রভু!—তুমি যাও! আমার শেষ প্রার্থনা ভগবান অবিশ্যি শুন্‌বেন—তুমি নিরাপদে এ পাপপুরীর বাহির হতে পার্‌বে। আমি মর্‌তে পার্‌বো—আমার জন্যে আর কিছু ভেবো না। আজ শেষ রাত্রে স্বপ্নে সই ডাক্‌তে এসেছিল, তোমারও দেখা পেলাম—আর জন্মে আবার তোমায় পাব। মাকে বুঝিয়ে বলো। এক ভিক্ষা স্বামিন্—ঐ বিষের মোড়ক [illegible]য়া দাও!"

ভাবিবার সময় ছিল না, কিন্তু তথাপি পুরন্দর হৃদয়ের সঙ্গে বিষম যুদ্ধ করিতেছিলেন। সহসা সেই অদৃষ্ট ছবি, ফুলের প্রতি প্রণয়সঞ্চারের প্রাক্কালে অনুদিন যে বলিত, "এ জীবন কেবল দুঃখময়,"—সে আসিয়া পুরন্দরের মানস-নেত্র সম্মুখে দাঁড়াইল। সংযতচিত্তে, প্রায় কঠোর কণ্ঠে পুরন বলিল, "ফুল, আগে তোমায় ফুলের মালা উপহার দিয়েও কখন তৃপ্তি হয় নি, আজ ধর এই বিষের মোড়ক নাও! তোমার জন্যেই এনেছি, কিন্তু প্রাণ ধরে এতক্ষণ দিতে পারি নি। এখন দেখ্‌ছি সেটা ভুল মায়া। আশীর্ব্বাদ

করি, মর্‌তে তোমার দেরি মাত্র না হয়। এ আত্মহত্যা পুণ্য—স্বহস্তে তোমার ঐ পবিত্র দেহ হতে মহাপ্রাণী বিচ্ছিন্ন কর্‌তে পারতেম, তবেই ঠিক হতো! এখন অনুতাপ হচ্চে, কেন সশস্ত্র হয়ে আসি নি! চোরের মত পরের পুরীতে প্রবেশ কর্ত্তে আত্মরক্ষায় আমার ঘৃণা বোধ হয়েছিল!” সম্মুখে দীর্ঘকায় পুরুষ আসিয়া দাঁড়াইল এবং সহসা তাহার হস্তস্থিত বর্ত্তিকা জ্বালিয়া ফেলিল। ফুল স্বামীকে চুম্বন করিতে গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। আগন্তুক, অপরিচিত পুরুষকে বন্দী করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। পুরন্দর কিন্তু নিজের বিপদ তুচ্ছ করিয়া প্রশান্ত ভাবে সেই তরুতলে উপবিষ্ট হইলেন এবং ফুলের মাথা সযত্নে কোলে তুলিয়া লইলেন।

আগন্তুক স্বয়ং গুরগণ খাঁ। হামেসা ছুটিয়া আসিয়া তাহার পা জড়াইয়া ধরিল।

একোনসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

গুরগণ ক্রোধকম্পিতস্বরে বলিল—“হামেসা, এত নেমকহারাম তুমি, তা জান্‌তাম না! কি এ সব?”

হামেসা তাহার পা জড়াইয়া ছিল—সেই ভাবেই রহিল। বলিল, “গুরগণ, আমি নেমক্‌হারাম নই। স্বামী স্ত্রীকে চিরজন্মের মত একবার দেখ্‌তে এসেছে, এতে কার অনিষ্ট?”

গুরগণ ব্যঙ্গস্বরে উত্তর করিল—“কার্‌ অনিষ্ট, দরবারে তার ইন্‌সাফ হবে। তোমায় সুদ্ধ এখুনি আমি জনাব আলীর হুজুরে নিয়ে যাব!”

পুরন্দর অতি পরিষ্কার উর্দ্দূতে গুরগণকে বলিলেন, “জনাব, এ স্ত্রীলোক নির্দ্দোষী। আমি অপরাধী এবং বন্দী। আপনি মহৎ—ক্ষুদ্র স্ত্রীলোককে ছাড়িয়া দিন। আল্লা আপনার মঙ্গল করিবেন।”

তৎক্ষণে কুলকুমারীর জ্ঞান সঞ্চার হইল। পুরন্দর কেবল বলিলেন—“তবে আমি চলিলাম—ধর্ম্ম তোমার সহায় হউন।” তখন তিনি গুরগণকে আত্মসমর্পণ করিলেন।

গুরগণ, বন্দী সঙ্গে প্রথমতঃ খাজেসেরার কাছে উপস্থিত হইল। সকল শুনিয়া বৃদ্ধ আসান উল্লা বলিলেন—"আমার সাক্ষাতে এক দিন হামেসা অভাগিনী বালিকাকে ভরসা দিয়েছিল, তার স্বামীর সঙ্গে দেখা করাবে। আমি ধম্‌কে দিয়েছিলাম। কি বেয়াকুব দেখ। আর হিম্মতই বা কি! এখন মরুক্।" গুরগণ বলিল—"জনাব, বন্দী বড়া লায়েক। প্রাণের ওপর যে বিপদ তা তুচ্ছ করে, ইনি স্ত্রীর সেবা কর্‌ছিলেন—বেচারী হামেসার জন্যে আমায় অনেক অনুরোধ করেছেন। আমি তার কথা কিছু উল্লেখ কর্‌ব না। কিন্তু বন্দীকে ছাড়তে আমরা অসমর্থ।"

আসান উল্লা ভাবিলেন—বলিলেন, "সে ত ওয়াজীব কথা—কোরাণ শরিফের কসম নিয়ে আমরা কাজ করে থাকি। তবে তুমি যদি হামেসার ওপর অত মেহেরবাণী করেছ গুরগণ, আমারও একটা কথা রাখ। যাঁর স্বামী ইনি, সে লেড়কী নেহাইৎ বেচারা—তার কথাও জনাব আলীর গোচর করো না।" গুরগণ একটু ভাবিয়া, একটু আপত্তি করিয়া, শেষে সম্মত হইল।

শুনিয়া পুরন্দর বিশুদ্ধ উর্দ্দূতে, সুপণ্ডিত-সম্ভব আদব কায়দার সহিত উভয়কে ধন্যবাদ করিলেন। এবং ভক্তিভরে হাফেজের সময়োপযোগী মর্ম্ম-স্পর্শী একটি বয়েৎ আবৃত্তি করিলেন। তাহার অর্থ এইরূপ!—"প্রভু, যখন যে ভাবে রাখ, আমি তোমারই! ঘোর বিপদে ফেলিয়াও তুমি কেবল অনন্ত মাধুর্য্য এবং দয়ায় স্বপ্রকাশ কর।"

আসান উল্লা এবং গুরগণ উভয়েই চমৎকৃত হইলেন। গুরগণ পুরন্দরকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "জনাব, কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে আপনার অন্দর প্রবেশবার্ত্তা আমায় হুজুরে এত্তালা কর্‌তে হচ্চে। আপনি অলৌকিক ব্যক্তি, কেন এমন আগুনে ঝাঁপ দিলেন! সকলই আল্লা আকবরের ইচ্ছা, নহিলে হঠাৎ আমাকেই বা কেন সন্দিগ্ধ করে, তিনি আজ উদ্যান ভ্রমণে প্রবৃত্তি দেবেন!"

তখন পুরন্দরকে খাজেসেরার হেপাজতে রাখিয়া গুরগণ জনাব আলীর কাছে এত্তালা করিতে গেল। দুই দণ্ডের পর ফিরিয়া আসিয়া আসান উল্লাকে বলিল—"এখুনি অন্দরে দরবার হবে। আপনার প্রতি হুকুম, যত জেনানা আপনার খবরগিরিতে আছে, সকলকে দরবারের পোসাকে সজ্জিত করে হাজির কর্‌বেন। বন্দীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে হাজির করবার হুকুম হয়েচে। হাব্‌সী জল্লাদ এক জনেরও হাজির থাকা চাই।"

পুরন্দর শুনিলেন। চক্ষু মুদিয়া ভগবান স্মরণ করিলেন। কেহ কোন চাঞ্চল্য তাঁহাতে লক্ষ্য করিতে পারিল না।

* * * * * * *

ওদিকে অবরোধ কারাগারের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠতলে ক্ষীণ জ্যোতি আলোক সম্মুখে ফুলকুমারী স্বামীদত্ত বিষের মোড়ক খুলিয়া দেখিতেছিল। দ্বার রুদ্ধ করিয়া সতৃষ্ণনেত্রে সেই সদ্য হলাহল দেখিতে দেখিতে স্বামীর শেষ আদর-স্পর্শ, কঠোর জীবনান্তকর যে অনুরোধ, তাহা করিবার সময়ও তাঁহার মর্ম্মকাতরতা মনে করিয়া অভাগিনী বালিকা অধীর হইতেছিল। চাঁদের আলোয় স্বামীর চিরস্নেহ প্রফুল্ল মুখ খানি ভাল করিয়া দেখিতে পায় নাই—আর একবার জন্মের শোধ কি দেখিতে পায় না, ভাবিয়া তাহার চোখে জল আসিল। অমনি সঙ্গে সঙ্গে মাতার সস্নেহ মূর্ত্তি, বিদায় কালে তাঁর শেষ কথাগুলি মনে পড়িয়া চোখের জলে তাহার ক্ষীণ গণ্ড দুখানি ভাসিয়া গেল। এমন সময়ে দ্বারে কে করাঘাতের উপর করাঘাত করিল। ফুল আত্মচিন্তায় তন্ময়—প্রথমতঃ খোজেসেরার কথা শুনিতে পায় নাই। আসান উল্লা বলিতেছিলেন, "বেটি, এখুনি অন্দরে দরবার হবে, সেখানে জনাব আলী তোমার স্বামীর বিচার করবেন। তোমাকেও হাজির হতে হবে—প্রস্তুত হও।" কাজেই তখন আর বিষপান করা হইল না। আর একবার স্বামী সন্দর্শন লালসায় ফুল উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

সপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

নবাব অন্তঃপুরে সৌন্দর্য্যের দরবার বসিয়াছে। শুভ্র স্নিগ্ধ চন্দ্রালোককে উপহাস করিবার জন্যই যেন সুপ্রশস্ত, সহস্র গবাক্ষখচিত দরবার কক্ষে বিবিধ বর্ণের আলোকমালা জলিতেছিল। সে আলোকে সমবেত সুন্দরীগণের কৃত্রিম অকৃত্রিম সৌন্দর্য্যচ্ছটা ফুটিয়া উঠিতেছিল। আলোকমালার তৈলে সুরভি, দরবার গৃহের বায়ুতে সুরভি, মহিলাদের জ্যোতির্ম্ময় পরিচ্ছদে

সুরভি—সর্ব্বত্র সুরভিময়। সেই ঐশ্বর্য্যময়, সৌন্দর্য্যময়, সুরভিময় দরবার-গৃহের মধ্যস্থলে রত্নখচিত হৈমসিংহাসনে বাঙ্গলার নবাব সিরাজুদ্দৌলা বসিয়াছেন। সদলে খাজেসেরাগণ, তাম্বূলবাহিকাগণ, ছত্রচামরধারিণীগণ কলের পুত্তলির মত তাঁহার আশে পাশে নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। নৃত্য সঙ্গীতের, হাস্য কৌতুকের বিরাম বিশ্রাম নাই। আতরদান, গোলাবপাশ লইয়া সুসজ্জিত পরিচারিকারা বেগম মহলে ঘুরিতেছিল। স্বয়ং নবাব পিচকারী লইয়া অলক্ষ্যে কোন না কোন সুন্দরীর প্রতি লক্ষ্য করিতেছেন। সে খেলায় ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সকলেই প্রমোদের উচ্চ হাস্যে যোগ দিতেছিল।

দরবারগৃহের নিতান্ত এক প্রান্তে সহস্র চক্ষুর নির্দ্দয় দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিবার জন্যই যেন, জড়সড় ভাবে ফুলকুমারী বসিয়াছে। পরিহিত নূতন পরিচ্ছদ তাহার ক্লিষ্ট দেহ মনকে আরও ক্লিষ্ট করিতেছিল। অথচ তাহার বিষণ্ণ আনত আননে সুনীল আলোক রশ্মিমালা পড়িয়া লজ্জা, প্রেম, সরল-তার যে কমনীয় মূর্ত্তি উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা দেবদুর্লভ। সুরা-রঞ্জিত নেত্রে নবাব দরবারের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে কেবল রমণী মুখপদ্ম দেখিতেছিলেন—যার মুখখানি, মুখের মৃদু মধুর হাসিটুকু ভাল লাগিতেছিল, তাহারই প্রতি গোলাবের পিচকারী সন্ধান করিয়া অনুগ্রহ জানাইতে-ছিলেন—অকস্মাৎ ব্রীড়াসঙ্কুচিতা ফুলকুমারীর দিকে তাঁহার চক্ষু পড়িল। কুসুমিতা বনলতার মত তাহার অস্ফুট বিনম্র সৌন্দর্য্য—আপন গৌরবে আপনি নম্র—সে সলজ্জভাব রাজদরবারের সামগ্রী নহে। লজ্জার মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কিশোর নবাব অনিমেষ নেত্রে ফুলের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। অপেক্ষাকৃত উচ্চ কণ্ঠে, আপনার অজ্ঞাতসারেই যেন বলিয়া উঠিলেন—"বাহবা!"

সকলেই জনাব আলীর প্রশংসাপাত্রীর দিকে চাহিয়া দেখিল। অলৌকিক সুন্দরীগণের ভিতর অনেকেরই মধুর অধরে ঈর্ষার তাচ্ছিল্যের কঠিন হাসি ফুটিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের জন্য সে প্রমোদের দরবার দেবীমণ্ডপের মত স্থির গম্ভীর হইল। মনুষ্য নিশ্বাসও বুঝি তখন পড়িতেছিল না।—ফুল ইহার কিছুই জানিল না। গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া কেবল স্বামী পদারবিন্দ স্মরণ করিতেছিল—কেন না, ফুল প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর আহ্বান শুনিতেছিল।

কৌতূহলী হইয়া নবাব খাজেসেরাদের প্রতি চাহিলেন। বুঝিয়া আসান উল্লা সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইয়া করযোড়ে আদেশের প্রতীক্ষা করিতে

লাগিল। নবাব সুধাইলেন, "ও বালিকাকে কত দিন আনা হয়েচে?" আসান উল্লা বলিল, "আট দশ দিন হবে!"

ন। আট দশ দিন! এতদিন হাজির করা হয়নি কেন?

খাজেসেরা যথাযোগ্য বিনীতভাবে উত্তর করিল, "জনাব আলি—হাবিলীতে প্রবেশ করার রাত্রি থেকে এ লেড়কী বেমার—দিন রাত বেহুঁস থাকে। তা ছাড়া হুজুর সরকারের বরাবর রেওয়াজ, বাহির হাবিলীতে নয়া জেনানা নজর এলে, আদব কায়দায় দুরস্ত করে তবে হাজির করা। গোলাম সেই রেওয়াজ মাফিক কাজ করেচে।"

ন। আচ্ছা, তোমার কসুর নেই। কিন্তু বারদিগর এমন না হয়। আজ থেকে এ রেওয়াজ উঠে গেল। তুমি উহাকে সাম্‌নে বেগমদের কাছে বসাও।

খাজেসেরা ফুলকুমারীর কাছে গেল। সমাধিমগ্ন দেবীবৎ সে মূর্ত্তি দেখিয়া এবং তার পরিণাম ভাবিয়া তাহার চোখে জল আসিল। হামেসা দূর হইতে সকল দেখিতেছিল,—সেও বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিল। আসানউল্লা স্পষ্টস্বরে ডাকিল, "বিবি, জনাব আলীর হুকুম, সাম্‌নে বেগমদের কাছে আপনাকে বস্‌তে হবে!" ফুল তখনও চিন্তাসমাধিমগ্ন বুঝিয়াও, খাজেসেরা দরবার প্রচলিত খাস উর্দ্দূর পাঁচমিশালি বাঙ্গলা অনুবাদ করিয়া আপনার কথা পুনরুক্ত করিল। অনেকে আসানউল্লার মুখে বাঙ্গলা শুনিয়া হাসিল। বারম্বার আহ্বানের পর ফুল চমকিয়া উঠিল। ললাট প্রকোষ্ঠে স্বেদবিন্দু ঝরিতেছিল। সাধ ছিল, স্বামীর মুখখানি আর একবার দেখিয়া বিষপান করিবে—হায়, সাধ বুঝি পূরিল না! ফুল করতলন্যস্ত বিষের মোড়ক দৃঢ়তর করিয়া ধরিল।

আসানউল্লা মৃদুস্বরে বলিল, "বেটি, ওঠ। না গেলে বিপদে পড়বে।" অগত্যা ফুল তাহার পশ্চাতে চলিল। সশঙ্ক চরণ চরণে বাধিতেছিল। লালসাক্ষিপ্ত নবাব সে সলজ্জ চরণ বিন্যাসে নূতন শোভা দেখিতেছিলেন। ফুলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি নাম তোমার বিবি?"

ফুল কোন উত্তর দিল না—আসানউল্লা বলিল—"ফুলকুমারী!"

নবাব। বাহবা খোপসুরৎ নাম! আচ্ছা, আজ হতে ইনি ফুলজানি বেগম হলেন।

এমন সময়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ পুরন্দরকে চারি জন খোজা ধরিয়া লইয়া আসিল।

সহসা সেই প্রমোদ সভা বধ্যভূমির ভীষণ গাম্ভীর্য্য ধারণ করিল। অলঙ্কার-শিঞ্জিতের মধুর নিক্কণ লৌহ শৃঙ্খলের ঝন্‌ঝনায় ডুবিয়া গেল। ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ঘাতক অসি হস্তে বন্দীর পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল।

পুরন্দরের তেজোগর্ব্ব দৃপ্ত মূর্ত্তি দেখিয়া সিরাজ মনে মনে একটু চঞ্চল হইলেন। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার সেই সমবেত সুন্দরীগণের মুখের ভাব দেখিয়া লইলেন,—কে ইহার উপপত্নী, যদি ধরিয়া ফেলিতে পারেন! পুরন একবার মাত্র দরবার গৃহের চারিদিকে চাহিলেন,—যাহাকে খুঁজিতেছিলেন, দেখিলেন, তাহার লজ্জানম্র মুখে, লোহিত ওষ্ঠযুগলে সতীত্বের দৃঢ়তা স্ফুরিত হইতেছে। দেখিয়া পুরন্দর নতমুখে ধ্যানপরায়ণ হইলেন। ফুল এই অবসরে হলাহল পান করিতে যাইতেছিল। একটু অপেক্ষা করিল, বিচারে যদিই স্বামী বাঁচিয়া যান! সে সুখ না দেখিয়া কেন মরিব!

নবাব পুরন্দরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমায় দেখে মনে হয়, তুমি বিশিষ্ট ভদ্রসন্তান। কিন্তু তুমি চোরের মত নবাব হাবিলীতে প্রবেশ করেছ। সম্ভবতঃ এর ভেতর তোমার উপপত্নী কেউ আছে। তুমি যে গুরুতর অপরাধ করেছ, তার শাস্তি প্রাণদণ্ড। কিছু তোমার বল্‌বার আছে?"

শৃঙ্খলাবদ্ধ সিংহের ন্যায় পুরন্দর গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। কিন্তু সহসা আত্ম সংযম করিয়া বলিলেন—"নবাব, বলিবার অনেক ছিল, কিন্তু বিচার কর্‌বে কে? চোর আমি নই—চোর তুমি! তুমি আমার জীবনসর্ব্বস্বকে অধম দস্যুর হীন কৌশলবলে হরণ করে এনেছ—এ সংসারে আমার সুখের প্রদীপ চিরদিনের মত নিভিয়ে দিয়েছ! তোমার বিচার কোথায় হবে, ভেবে দেখ! যেখানে হবে, তোমার আগে সেখানে আমি চল্‌লাম।" ফুলের সঙ্গে চক্ষে চক্ষে মিলন হইল। সাধ্বী পবিত্র অধর ক্ষীণ দৃঢ়হাস্যে মণ্ডিত করিয়া স্বামীকে দেখাইয়া সেই করতলন্যস্ত সদ্য হলাহল ভক্তি-সহকারে পান করিলেন।

সিরাজ সেই শৃঙ্খলাবদ্ধ দৃপ্তমূর্ত্তি যুবকের তেজোগর্ব্ব বাক্যে কম্পিত হইয়া উঠিলেন। ক্রোধে চক্ষু লোহিত করিয়া বলিলেন, "জল্লাদ্ কতল্ কর!" আলোক রশ্মিতে অসি ফলক জ্বলিয়া উঠিল। স্বামীর মস্তক দ্বিধা ভিন্ন হইতে না হইতে ফুলকুমারী ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

"কি হইল, কি হইল" বলিয়া নবাব সিংহাসন হইতে উঠিয়া আসিলেন

এবং স্বহস্তে ফুলকে উঠাইতে গেলেন। ফুল তখনও অজ্ঞান হয় নাই। বলিল, "যবন, আমায় ছুঁয়ো না। স্বামীর পায়ে সোয়াস্তিতে মরতে দাও। তুমি আমার স্বামীহন্তা!"

নীরবে শান্ত জ্যোতি নিভিয়া গেল! লোকে বলে, সিরাজের চোখে কখন জল পড়ে নাই, কিন্তু এই মুহূর্ত্তে পড়িয়াছিল।
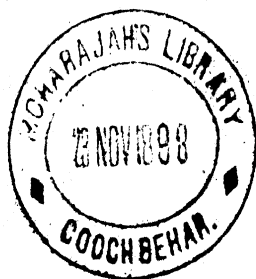
পরিশিষ্ট।

কথিত আছে, নবাব সিরাজুদ্দৌলা এই দম্পতির হিন্দুমতে সংকার করান এবং দাহস্থলে চিতাভস্মের উপর এক স্থরম্য উৎস নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। গোলাব-বাসিত নির্ম্মল সলিলরাশি নিশিদিন এই উৎস মুখে বিকীর্ণ হইত। তাহার নীচে, তুষারশ্বেত প্রস্তরের গায়, ফারসীতে একটি কবিতা খোদিত ছিল। মর্ম্ম এইরূপ ঃ—

"ফুলে এত ভালবাসা আগে যদি জানিতাম,
তা হলে কি তারে কভু বৃন্তচ্যুত করিতাম।"

দুঃখীরাম প্রভুর উদ্ধার চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে ফটক বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পুরন্দরের ভীষণ পরিণামবার্ত্তা শুনিবামাত্র, সে ক্ষোভে রোষে অন্ধ হইয়া চকে প্রবেশ করে। বজ্রমুষ্টি করীমকে হত এবং মতি বিবিকে আহত করিয়া দুঃখীরাম চিরদিনের মত নিরুদ্দেশ হইয়া গেল।

নিস্তারিণীকে নীলাচল হইতে ফিরিতে হইল না। এ শোকাভিনয় শেষের সম্বাদ শুনিবার আগে, তিনি স্বামী-কাষ্ঠপাদুকা দুখানি বুকে স্থাপন করিয়া সুনীল সাগর-শোভা দেখিতে দেখিতে বৈকুণ্ঠে চলিয়া গিয়াছিলেন।

দুঃখের উপর দুঃখ, মোক্ষদা এই বিষম শোক ভুলিতে না ভুলিতে, বিধবা হইয়াছিলেন। কন্যা পুত্র লইয়া তিনি পিত্রালয়ে চিরজীবন বাস করিলেন। পিতৃধনের অধিকাংশ এবং ভ্রাতার শ্বশুরালয়ের সর্ব্বস্ব তিনি অতিথি সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। বৈধব্যে মাহুইমার আদর্শ কখন ভোলেন নাই।

সমাপ্ত।